ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য

উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক ঃ **আবদুল কুদ্দুস**

রেজিঃ নং-৩০২

সেশন- ২০০৯-২০১০

দর্শন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক ঃ **ড. আনিসুজ্জামান**

অধ্যাপক

দর্শন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, আবদুল কুদ্দুস, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এবং আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে **'সমকালীন দর্শন ও অধিবিদ্যা'**শীর্ষক এম. ফিল. গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করেছে। এই শিরোনামের গবেষণা কর্মটি আমার জানা মতে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা অন্য কোনো ডিগ্রীর জন্য ইতঃপূর্বে পেশ করা হয়নি।

এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য সন্তোষজনক। আমি এর চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি দেখেছি এবং এম. ফিল. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করছি।

অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান

দর্শন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বর্তমান গবেষণা কর্মের জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. **আনিসুজ্জামান** এর কাছে সর্বান্তকরণে ঋণ স্বীকার করছি। তিনি সানন্দে এ কাজটি তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে সম্মত হয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁর সুদক্ষ, আন্তরিক ও যত্নশীল তত্ত্বাবধানের জন্য তাঁর কাছে আমার অপরিশোধ্য ঋণের কথা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করছি।

গবেষণাকালীন সময় আমার অনেক শিক্ষক, বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী আমাকে প্রেরণা দিয়েছেন ও সহযোগিতা করেছেন। তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আব্দুল কুদ্দুস

দর্শন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তারিখ:

Dhaka University Institutional Repository

অভিসন্দর্ভের সারাংশ

সমকালীন দর্শন বলতে আমরা হেগেল পরবর্তী সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত যুগটি বুঝিয়েছি। এই অভিসন্দর্ভকে আমরা পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করেছি। প্রথম অধ্যায়ে আমরা অধিবিদ্যার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরেছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এরিস্টটল, একুইনাস, ব্রাডলি ও এইচ ডি লিউইস এর অধিবিদ্যা সংক্রান্ত আলোচনা, তৃতীয় অধ্যায়ে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের পর্যালোচনা, চতুর্থ অধ্যায়ে বর্তমান সময়ে অধিবিদ্যার প্রাসঙ্গিকতা ও উপযোগিতা এবং পঞ্চম অধ্যায়ে একটি উপসংহার ও গবেষকের নিজস্ব মন্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। আমরা এখানে সমকালীন দর্শন বলতে শুধুমাত্র পাশ্চত্য দর্শনকেই বিবেচনায় নিয়েছি। অর্থাৎ মুসলিম, বৌদ্ধ, হিন্দু তথা প্রাচ্য দর্শনের আলোচনা এখানে আসেনি, তবে খ্রিষ্ট্র ধর্মের আলোচনা প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে। আমরা এখন গবেষণা অভিসন্দর্ভের মূল কথা উপস্থাপন করবো।

অধিবিদ্যা দর্শনের অন্যতম প্রধান শাখা। যদিও বর্তমানে অধিবিদ্যা বিরোধী কিছু ধারা দর্শন থেকে অধিবিদ্যাকে বাদ দেওয়ার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছে তথাপি অধিবিদ্যা বিলুপ্ত হয়নি বরং সমহিমায় টিকে আছে। অধিবিদ্যা এবং আধিবিদ্যক ধারণা ছাড়া দর্শন অপূর্ণ থেকে যায়। ব্যবহারিক জীবনে আমরা একটি কথা শুনি 'High philosoph' কথাটিকে প্রায়শ বিজ্ঞানেও ব্যবহার করা হয়। একটি জিনিসের কারণ উদঘাটন সম্ভব না হলে তাকে Highphilosophical thought বলতে হয়। প্রকৃত পক্ষে High philosophy বলতে আধিবিদ্যক ধারণাকেই আমরা উপলব্ধি করি। দর্শনের কাজ হলো জগৎ ও জীবনের জটিল প্রশ্নের সমাধানের প্রচেষ্টা। শুধু ভাষাকে বিশ্লেষণ করলে ভাষার সমাধান হতে পারে কিন্তু জীবন সমস্যার সমাধান হয় না। জীবন সমস্যার সবচেয়ে জটিল প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে অধিবিদ্যা। হঠাৎ একটি তীর এসে একজন মানুষের গায়ে বিদ্ধ হলো, রক্তাক্ত হয়ে পড়ল লোকটি, মুমূর্ষু প্রায়, এখন করণীয় কী? তাকে চিকিৎসা করা না কি কে তীর মারল তার সন্ধান করা? অধিবিদ্যা বলবে কে তীর মারলসেটা উদঘাটন না করলে এর স্থায়ী সমাধান হবে না। বাস্তববাদীগণ বলবেন চিকিৎসা প্রদানই সমাধান। প্রকৃতপক্ষে দুটি জিনিসেরই প্রয়োজন আছে, দুটি জিনিসের মিলনেই সমস্যাটির উৎকৃষ্ট সমাধান হতে পারে।

কারণ চিকিৎসার মাধ্যমে তাকে বাঁচানো গেলেও কিছু দিন পর তার উপর আবার আঘাত আসতে পারে। সুতরাং কে তীর মারল তা আবিষ্কার করে বিচারের আওতায় আনতে হবে। প্রকৃতপক্ষে অধিবিদ্যা ও বাস্তববাদ উভয়কে এক সাথেই চলতে হবে। কাউকে বাদ দিলে মূল জিনিসের সমাধান হবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা এরিস্টটল, একুইনাস, ব্রাডলি ও এইচ ডি লিউইস- এর অবদান বিবেচনা করেছি। অধিবিদ্যার গুরুত্ব সবচেয়ে যথার্থভাবে সর্বপ্রথম যিনি উপলব্ধি করেছিলেন তিনি মহামতি এরিস্টটল। তিনি মনে করেন সবচেয়ে মূল্যবান জ্ঞান হচ্ছে আদি কারণের জ্ঞান। আদি কারণ সম্পর্কে না জানলে অন্যান্য কারণের যথার্থ ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এই আদি কারণ হিসেবে তিনি প্রমাণ করেছেন ঈশ্বরকে । তাঁর এই মতকে তিনি 1st philosophy বা 1st principle বলেন। অধিবিদ্যাকে তিনি সর্বোচ্চ ধর্মতত্ত্ব হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, কারণ ধর্মতত্ত্বের কাজ ঈশ্বরকে প্রমাণ করা আর অধিবিদ্যার কাজও পরম সত্তার সন্ধান। অধিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় রূপে তিনি being qua being বা প্রকৃত সত্তাকে উল্লেখ করেন। Beingএর ব্যাখ্যায় আবার তিনি একে এক ধরনের Substance(দ্রব্য) বলে বর্ণনা করে। ৩ প্রকার দ্রব্যএর মধ্যে কেবল একটিই অধিবিদ্যার সাথে যুক্ত। সেটি হলো অতীন্দ্রিয় ও অবিনশ্বর দ্রব্য।এই প্রকারের মধ্যে ঈশ্বর এবং মানুষের প্রজ্ঞাবান আত্মা অন্তর্ভুক্ত। ঈশ্বরকে প্রমাণের জন্য তিনি আদি কারণ ও গতির যুক্তি উপস্থাপন করেন। তাঁর মতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্য পরিবর্তনশীল কিন্তু অতীন্দ্রিয় দ্রব্য অপরিবর্তনশীল। এরিস্টটল ঈশ্বরের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে ঈশ্বরকেজগৎ থেকে নিষ্ক্রীয় করে ফেলেন। এতে ধর্মতাত্ত্বিকগণ আপত্তি করেন এবং সেন্ট টমাস একুইনাস এরিস্টটলের অনুসরণ করেও ঈশ্বরের গুণের ব্যাপারে তাঁর মন্তব্য অনুসরণ করতে পারেননি।

খ্রিষ্টধর্মের অনুসারী একুইনাস একজন বিখ্যাত ধর্মতত্ত্ববিদ ও এরিস্টটল অনুসারী অধিবিদ। অধিবিদ্যায় তাঁর অবদান গুরুত্বপূর্ণ। তিনি তাঁর Contragentilesগ্রন্থে তাঁর নিজস্ব দার্শনিক মতের আলোকে অধিবিদ্যার ব্যাখ্যা করেন। তবে তাঁর বিশেষত্ব হলো তিনি অধিবিদ্যাকে ধর্মীয় দৃষ্টি ভঙ্গির আলোকে ব্যাখা করেন। তাঁর মতে অধিবিদ্যার ব্যবহারিক দিকটি ধর্মের মাধ্যমেইপূর্ণতা পেতে পারে ।

আমরা একুইনাসের পর আধুনিক দর্শনের সবচেয়ে খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব হেগেলকে যাঁরা অনুসরণ করে অধিবিদ্যার চর্চা করেন তাঁদের একজন সম্পর্কে আলোচনা করেছি। তিনি হলেন বৃটিশ ভাববাদের বিশিষ্ট প্রতিনিধি এফ.এইচ. ব্রাডলি। হেগেল যেখানে দ্বন্দ্ব তত্ত্বের মাধ্যমে পরম সত্তাকে সন্ধান করেছেন ব্রাডলি সেখানে সম্বন্ধ তত্ত্বের মাধ্যমে বাস্তব সত্তাকে খুজে পান। ব্রাডলির মতে, একমাত্র সম্বন্ধবিহীন সত্তাই হতে পারেন পরম সত্তা, আমরা অভিজ্ঞতার জগতে যা দেখি বা উপলব্ধি করি তা সবই তাঁর মতে সম্বন্ধযুক্ত। যেমন মুখ্যগুণ, গৌনগুণ, দেশ কাল, কার্যকারণ, আত্মা প্রভৃতি সবই পরস্পরের সাথে যুক্ত, অনিবার্য সম্পর্কের অধীন। আর তাই এগুলোকে আমরা বাস্তব বলতে পারি না। এগুলো কেবল বাস্তবের প্রতিচ্ছবি, অবভাস। এগুলো আমাদেরকে এমন একটি সিদ্ধান্ত নিতে অনুপ্রাণিত করে যে,একজন বাস্তবসত্তা বা পরম বাস্তব সত্তা (Absolute Reality)। অবশ্যই অস্তিত্বশীল হবেন যাঁর মাধ্যমে সব কিছু এসেছে কিন্তু তিনি কারো মাধ্যম ছাড়াই এসেছেন। ব্রাডলির দর্শনের বিরুদ্ধে ম্যুর, রাসেলসহ বাস্তববাদীগণ অনেক সমালোচনা করেন। কিন্তু পরবর্তী বৃটিশ ভাববাদ তাঁর কাছে অনেকাংশে ঋণী; যেমন বোসাংকে প্রায়ই তাঁকে অনুসরণ করেন, ম্যাগটেগার্ট নিজেও স্বীকার করেন যে ব্রাডলি বর্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক।

এইচ ডি লিউইস সাম্প্রতিক সময়ের একজন বিখ্যাত দার্শনিক ও অধিবিদ। অধিবিদ্যার উপর কোনো সুনির্দিষ্ট গ্রন্থ তিনি রচনা করেননি সত্যি তবে ঈশ্বর, আত্মা, অমরতা, ইচ্ছার সাধীনতা, দ্বৈতবাদ, দেশ কালের সমস্যা প্রভৃতি তাঁর প্রায় সব গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয়। অধিবিদ্যা বিরোধী ভাষাতাত্ত্বিক ও প্রত্যক্ষবাদীদের তিনি সমালোচনা করেন। অভিজ্ঞাতাপূর্ব ধারণা, সহজাত ধারণা প্রভৃতিকে অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকগণ মোটেই স্বীকার করেন না। তিনি যুক্তির মাধ্যমে তাঁদের এমন ধারণা নাচক করেন। ডেকার্টের দ্বৈতবাদের সমর্থক ছিলেন তিনি। তাঁর মতে রাইল ডেকার্টকে যে বিভ্রান্তির স্বীকার বলে মন্তব্য করেন তা আসলে রাইলের ক্ষেত্রে অধিকতর প্রযোজ্য, ডেকার্টের নয় । প্রকৃতপক্ষে দেহ ও মনের পার্থক্য করা না হলে আত্মার অমরতার ধারণাই বাতিল হয়ে যায়। অধিবিদ এটা মানতে পারেন না। ঈশ্বরের অস্তিত্বের ব্যাপারে প্রচলিত যুক্তিগুলোর ত্রুটি থাকলেও এগুলোর গুরুত্ব ও তাৎপর্যকে তিনি স্বীকার করেছেন। ভাষাতাত্ত্বিক দার্শনিকদের

সমালোচনায় তিনি বলেন, তাঁরা ছিলেন স্ববিরোধী ও একপেশে দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী যা দর্শনের জন্য কোনো কল্যাণ নিয়ে আসেনি।

তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের পর্যালোচনা করেছি। আমরা জানি ১৯৩০ এর দশকে ভিয়েনা ও বার্লিন কেন্দ্রিক এক নতুন দার্শনিক আন্দোলনের সূচনা ঘটে যার মূল উদ্দেশ্য ছিল অধিবিদ্যাকে বর্জন করা। এজন্য তাঁরা পরখনীতি প্রয়োগ করেন। পরখনীতির আলোকে আমাদের অভিজ্ঞতায় যেসব বচনকে পরখ করা যায় সেগুলোকেই বচন বলে আখ্যা দেওয়া যায়। যেগুলোকে যাচাই করা যায় না সেগুলো ছদ্ম বচন। যেমন অধিবিদ্যার বচন, ধর্ম ও নীতিবিদ্যার উক্তি প্রভৃতি। সমালোচকগণ তাঁদের এই নীতির ব্যাপক সমালোচনা করেন। এই নীতিটি নিজেই অভিজ্ঞতাপূর্ব। প্রকৃতপক্ষে ভিটগেনস্টাইন ও রাসেলের প্রভাবে তাঁরা এতটাই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, নিজেদের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে যথার্থ যুক্তি অনুসৃত হলো কিনা তা যাচাই করার সময় পেলেন না। তাঁরা বিজ্ঞানের আলোকে এমন একটি আদর্শ ভাষার প্রস্তাব করেন যে ভাষার প্রয়োগে আমাদের সমস্ত বাচনিক সমস্যা দূর হয়ে যাবে। বাস্তবে এ ধরনের ভাষা আদৌ তৈরি করা সম্ভব নয়, ফলে তাঁরা তাতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। অধিবিদ্যাকে বর্জনের ঘোষণা থেকে তাঁদের যে বিপ্লবের সূচনা তা জড়বাদী দর্শনের জন্য একটি প্রেরণা হলেও অধিবিদ্যার এতে কোনো ক্ষতি হয়নি বা এটা দর্শন থেকে বিলুপ্তও হয়নি।

৪র্থ অধ্যায়ে আমরা বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিত তুলে ধরেছি। বর্তমানে অধিবিদ্যার আলোচনা অনেক হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে অধিবিদ্যা বিরোধী নতুন ধারার সৃষ্টি হয়েছে। নীটশে, হাইদেগার, রাসেল, মূর, উইজডম, পিটার সিঙ্গার সহ অসংখ্য দার্শনিক ঈশ্বর, ধর্ম, অধিবিদ্যাকে কটাক্ষ করেছেন; অযৌক্তিক বলে বর্জনের ঘোষণা দেন। কিন্তু অন্যদিকে অধিবিদ্যার পক্ষেও কথা বলেছেন অনেকে; গ্রিন, ব্রাডলি, বোসাংকে বার্গসোঁ, ম্যাক ইন্টায়ার, পিটার ভান ইনওয়াগান প্রমুখ। বস্তুত জীবনকে যারা অর্থবহ, উদ্দেশ্যপূর্ণ মনে করেন সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত তাদের কাছে অধিবিদ্যা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রকৃতপক্ষে জীবকে অর্থপূর্ণ করার জন্য আমাদের নৈতিকভাবে উন্নত হতে হবে, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করতে হবে, ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের সমাজ

গড়তে হবে। এগুলোর জন্য আত্মার অমরতায় বিশ্বাস সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। অধিবিদ্যা সে বিষয়টাকেই মানব জাতির কাছে প্রকাশ করতে চায়।

৫ম অধ্যায়ে আমরা সম্পূর্ণ গবেষণার একটি সারাংশ তুলে ধরেছি এবং সেখানে গবেষকের নিজস্ব কিছু মন্তব্য রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

১ম অধ্যায় ঃ অধিবিদ্যার পরিচয়

২য়অধ্যায় ঃএরিস্টটল, একুইনাস, ব্রাডলি ও এইচ ডি লিউইস এর অবদান বিবেচনা

ক. এরিস্টটল

খ. একুইনাস

গ. ব্রাডলি

ঘ. এইচ ডি লিউইস

৩য় অধ্যায় ঃ অধিবিদ্যা সম্পর্কে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের অবস্থান বিচার

৪র্থ অধ্যায় ঃ বর্তমান সময়ে অধিবিদ্যার প্রাসঙ্গিকতা

৫ম অধ্যায় ঃ উপসংহার

গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

অধিবিদ্যা দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ ও অন্যতম প্রধান একটি শাখা। দর্শন জগৎ ও জীবনের বিভিন্ন জটিল সমস্যার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা। আর সেই কাজ অধিবিদ্যায় সরচেয়ে সুস্পষ্টভাবে আলোচিত হয়। অধিবিদ্যা এমন একটি বিষয় যার পক্ষে ও বিপক্ষে একই সময়ে কিছু লোক অত্যন্ত আগ্রহী এবং কিছু লোক অত্যন্ত বিতৃষ্ণ। এই গ্রহণ বা বর্জনের বিদ্যাকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা খানিকটা কঠিন কাজ বটে। আমাদের গবেষণায় সেই মূল্যায়নের কাজটি নয়, বরং বিভিন্ন জন যেসব মূল্যবান মন্তব্য করেছেন তারই একটি সংক্ষিপ্ত রূপদানের চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র।

জ্ঞান সমুদ্রের অথৈ জলরাশিতে ভ্রমণ করার মাঝে কি যে উচ্ছ্বাস, আনন্দ, রোমাঞ্চ সেটা ভ্রমণ বিলাসীরাই কেবল উপলব্ধি করতে পারেন। যারা প্রমত্ত সমুদ্রের উত্তাল ঢেউকে ভয়ংকর ভেবে মাথা গুজে রাখেন মরুভূমির সাইমুম ঝড়ে আক্রান্ত উটের মত, তাদের কাছে সামুদ্রিক বা অ-সামুদ্রিক ভ্রমণের বয়ানের কোন মূল্য নেই। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এখন বর্তমান বিশ্ব। বিজ্ঞান, কলা, স্থাপত্য যেমন উৎকর্ষতার চরমে অবস্থান করছে, তেমনি দর্শনও মাথা উঁচু করে দাড়িয়ে আছে আপন শক্তি নিয়ে। তবে দর্শনের উচ্চতম অট্টালিকার যে কক্ষটি সবচেয়ে নির্মল, সুন্দর, আলো ও বাতাসে ভরপুর থাকে তা অধিবিদ্যা। শত ঝড়, টাইফুন, টর্নেডো, 'নার্গিস' সত্ত্বেও সেই কক্ষটি অক্ষত, অমলিন; যেন 'নিত্য-যুদ্ধ করেছি বাধার সাথে চির-নির্ভীক'।

অধিবিদ্যার বিরুদ্ধে লড়াই শুরু হয়েছিল প্লেটো-এরিস্টটলের যুগ থেকেই। এই লড়াইয়ে টিকে ছিল অধিবিদ্যা, এখনো আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। বর্তমান বিজ্ঞান প্রভাবিত দর্শনে অধিবিদ্যাকে বর্জনের সীমাহীন যে প্রচেষ্টা চলমান তার বিপরীত স্রোতে থেকে অধিবিদ্যাও তার পক্ষের অনুসারী তৈরী করে চলছে অবিরত। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের পর্যালোচনা ও সমালোচনা নিয়ে গবেষণা করাই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আমরা অধিবিদ্যার পরিচয়, ইতিহাস, সমকালীন প্রেক্ষাপট ইত্যাদি তুলে ধরেছি। এরিস্টটল, একুইনাস, ব্রাডলি, এইচ.ডি. লিউইস এর আলোচনায় আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছি, অধিবিদ্যা কীভাবে চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করছে। বিরুদ্ধবাদীদের সম্মান ও মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁদের ত্রুটিগুলোকে যুক্তিবিদ্যার মাপকাঠিতে মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে। যুক্তিবিদ্যার আকারগত কাঠামোর প্রতি সবার শ্রদ্ধা আছে। এরিস্টটল যুক্তিবিদ্যার মূলনীতি অধিবিদ্যায় প্রয়োগ করে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে প্রমাণ করেছেন। একুইনাস এরিস্টটলকে অনুসরণ করে অধিবিদ্যার ব্যাখ্যা করেন। ব্রাডলি হেগেলকে অনুসরণ করে বাস্তব সত্তার ব্যাখ্যা করেন। আর এইচ.ডি. লিউইস অতীতের ও বর্তমানের বিখ্যাত দার্শনিকদের ত্রুটি-বিচ্যুতি উদঘাটন করে অধিবিদ্যার যুগোপযোগী আলোচনা

করেন। আর প্রত্যক্ষবাদের সমালোচনা অনেকেই করেছেন। তবে লিউইস, ভেনবার্গ, জোয়াড, কার্ল পপার, ম্যাকইন্টায়ার, পাসমোর প্রমুখের সমালোচনাগুলো অধিকতর যুক্তিযুক্ত ও আবেগমুক্ত। আমরা তা উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। সমকালীন অন্যান্য আধিবিদ্যক ও অধিবিদ্যা বিরোধী মতামত সংক্ষেপে আলোচনা করেছি।

তবে মূল কথা হলো, অধিবিদ্যা দর্শনের অপরিহার্য অংশ। যতদিন নৈতিকতার মূল্য থাকবে ততদিন অধিবিদ্যাও থাকবে।

আব্দুল কুদ্দুস

দর্শন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

১ম অধ্যায়: অধিবিদ্যার পরিচয়

ক. অধিবিদ্যার উৎপত্তিঃ

সত্যিকার জ্ঞানার্জনের এক অদম্য চেষ্টা থেকে দর্শনের উৎপত্তি। এই চেষ্টার সূচনা সভ্যতার গোড়া থেকেই। বার্ট্রান্ড রাসেল দর্শনকে বলেছেন বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যবর্তী প্রদেশ। তাঁর মতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ধর্মীয় ও নৈতিক ধারণা এবং এক ধরনের অসুন্ধান থেকে শুরু হয় দর্শনের। আর এই দর্শনের অন্যতম একটি প্রধান শাখার নাম অধিবিদ্যা (Metaphysics)।

প্লেটো এবং এরিস্টটল উভয়ই মনে করতেন আমাদের নিজের সম্পর্কে এবং বিশ্বজগৎ সম্পর্কে বিস্ময় ও জানার আগ্রহ থেকেই অধিবিদ্যার উৎপত্তি। D A DRENNEN বলেন অধিবিদ্যার মধ্যে দুটি বিষয় রয়েছে বিস্ময় ও রহস্য। বিস্ময়ের কারণে অধিবিদ্যা আর রহস্যের কারণে বিস্ময়।রহস্য হচ্ছে বিশ্বের অসমাপ্ত কাজ, তাই এটা চলতেই থাকবে। সে কারণেই বিস্ময়ও থাকবে। এভাবে অধিবিদ্যা রহস্যের অংশ বিশেষ। রহস্যের অনুপস্থিতিতে অধিবিদ্যা থাকতে পারে না।[১]

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক পারমেনাইডিস থেকে শুরু হয় অধিবিদ্যার আদি স্তর। কিন্তু এরিস্টটলই এটাকে একটা বিশেষ শাস্ত্র বা বিজ্ঞান হিসেবে এর আকারগত রূপ দান করেন। অধিবিদ্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ Metaphysics এরিস্টটলের গ্রন্থের নাম হলেও তিনি এই নামকরণ করেননি। তাঁর মৃত্যুর প্রায় এক হাজার বছর পর রডসের এন্ড্রুনিকাস নামক একজন ব্যক্তি এরিস্টটলের বিভিন্ন রচনার সম্পাদনা করতে গিয়ে পদার্থ বিদ্যার পরের ১৪টি পুস্তিকার নাম অজ্ঞাতসারেই অধিবিদ্যা নামকরণ করেন। অধিবিদ্যার ইতিহাসে একথাটিই ব্যাপকভাবে পরিচিত। মেটাফিজিক্স শব্দের বিভাজন করলে দাড়ায় meta (beyond/after/above)+physics অর্থাৎ পদাথবিদ্যার পরের আলোচনা। এরিস্টটল তাঁর গ্রন্থের কয়েকটি নাম উল্লেখ করেন, যেমন 1st

Philosophy, Theology, 1ststscience, Wisdom.এগুলো মূলত গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের ভিত্তিতে দেওয়া নাম।[২]

খ. অধিবিদ্যার সংজ্ঞা

এক কথায় অধিবিদ্যার পরিচয় দেওয়াটা একটু কঠিন ব্যাপার। সাধারণভাবে আমরা বলতে পারি যেখানে বাহ্যিক জগতের বাইরে অতীন্দ্রিয় জগৎ ও এই জগতের পেছনে যে কারণ রয়েছে তার আলোচনা হয় তাকেই অধিবিদ্যা বলে। অধিবিদ্যার পরিচয় প্রসঙ্গে এরিস্টটল বলেন There is a science (metaphysics) which investigates being as being and the attributes which belong to this in virtue of its own nature. (একটি বিশেষ বিজ্ঞান রয়েছে যা সত্ত্বার স্বরূপ এবং প্রয়োজনীয় উপাদান সম্বন্ধে অনুসন্ধান পরিচালনা করে)।[৩] এরিস্টটল এখানে অধিবিদ্যাকে একটি বিজ্ঞান হিসেবে উল্লেখ করেন অর্থাৎ এটা কোনো আর্ট বা কলা নয়। এর সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিআছে। তা ছাড়া এটা একটা অনুসন্ধান এর মানে এই অনুসন্ধানের মাধ্যমে কিছু পাওয়া যাবে। অন্যত্র তিনি বলেন অধিবিদ্যা তার অনুসারীদের এক অন্যান্য অনুধাবন ক্ষমতা ও উপলব্ধির আগ্রহ সৃষ্টি করে। এরিস্টটল বলেন এই বিজ্ঞান অন্যান্য বিজ্ঞান থেকে পৃথক। কারণ অন্যান্য বিজ্ঞান সত্ত্বার কোনো একটি দিক নিয়ে আলোচনা করে। যেমন গণিত শাস্ত্র, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন ইত্যাদি। কিন্তু অধিবিদ্যা মূল সত্তা বা সত্তার প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করে। (Metaphysics is a science the highest science, because it governr all other sciences.)[৪]

মধ্যযুগের বিখ্যাত দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ববিদ টমাস একুইনাস (১২২৪-৭৪) অধিবিদ্যাকে খ্রিস্ট ধর্মের সাথে সমন্বয় করেন। তাঁর মতে বাইবেলের আলোকে যত প্রকার জ্ঞান অর্জন করা যায় তার সর্বোচ্চ আকার হলো অধিবিদ্যা। এরিস্টটলকে অসুনরণ করে তিনি বলেন অধিকতর মৌলিক একটি বিজ্ঞান অন্যান্য বিজ্ঞানের চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। যে বিজ্ঞান অন্যান্য বিজ্ঞানের নীতিমালা অনুসরণ করে না বরং নিজস্ব নীতিমালা অনুসরণ করে তাই সর্বোচ্চ বিজ্ঞান। এটা হবে আত্মবিচার্য (self justifying) এবং অন্য

বিজ্ঞানকে নির্দেশকারী (regulative) উভয়ই।[৫] এই বিজ্ঞানকেই তিনি অধিবিদ্যা আখ্যা দেন।

আধুনিক যুগের দার্শনিক ডেকার্ট, লাইবনিজ ও কান্টের মতে অধিবিদ্যা এমন একটি প্রধান সার্বিক জ্ঞান যা বিশেষ বিজ্ঞান সমূহের পূর্ব ধারণার সাথে জড়িত একট স্থায়ী অপরিবর্তনীয় ধারণা। আবার কেউ কেউ আছেন যারা কান্ট কিংবা ডেকার্টের বিরোধিতা করেন তাঁরা এটাকে বিজ্ঞানের পূর্ব ধারণা বা ভিত্তি বলতে রাজি নন। এরিস্টটলের সাথে মিল রেখে তাঁরা এটাকে একটি সমন্বিত সঠিক ও চূড়ান্ত জ্ঞান বলে বিশ্বাস করেন। এদের মধ্যে ব্রাডলি অন্যতম। তিনি বলেন, We may agree, perhaps to understand by metaphysics an attempt to know reality as against mere appearance or the study of first principles or ultimate truths or again the effort to comprehend the universe not symply picemeal or by fragments but somehow as a whole.[৬]

গ. অধিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় ঃ

এরিস্টটল থেকে শুরু করে মধ্যযুগ পর্যন্ত অধিবিদ্যা মূলত দুটি বিষয় নিয়েই সীমাবদ্ধ ছিল সত্ত্বার বিজ্ঞান ও আদিকারণ। ১৭ ও১৮ শতকের বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগণ এর পরিধি আরো বৃদ্ধি করেন। দেহ ও মনের সম্পর্ক আত্মার অমরতা ও ইচ্ছার স্বাধীনতাকে এই সময় অধিবিদ্যার সাথে যুক্ত করা হয়।[৭]

(১) সত্তার বিজ্ঞান

মৌল সত্তার বিজ্ঞানই হচ্ছে অধিবিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয়। সহজ কথায় এই মৌল সত্ত্বা হচ্ছেন ঈশ্বর। ঈশ্বরের ধারণা অধিবিদ্যায় যুক্তির সাহায্যে উপস্থাপন করা হয়। ধর্মের ঈশ্বর হলেন বিশ্বাসের, আর অধিবিদ্যার ঈশ্বর যুক্তির। ঈশ্বরকে এখানে বলা হয় পরম সত্তা, অচালিত চালক, পরম ধারণা, পরম আকার ইত্যাদি। এই সত্ত্বা অপরিবর্তনশীল ও অনিবার্য সত্ত্বা। প্লেটো অবভাস ও বাস্তব সত্ত্বার পার্থক্যকরণের মাধ্যমে পরম আকারকে আবিষ্কার

করেন। পৃথিবীতে যত বিড়াল আছে তা বিশেষ বিড়াল; এর বাইরে এক আদর্শ বিড়াল আছে, তাই বাস্তব। বিশেষ বিড়াল আদর্শ বিড়ালের অবভাস। এভাবে আমরা যা কিছু দেখি সবকিছুর উর্ধ্বে একটি আদর্শ বাস্তব জগৎ রয়েছে। প্লেটো সেটাকে ধারণার জগৎ বা প্রত্যয়ের জগৎ বলেন।প্লেটোর অধিবিদ্যায় চূড়ান্ত বিশ্লেষণে শুধু একজনই ঈশ্বর আছেন যা পরম শুভ। আর প্রত্যয় বা ধারণা সমূহ হচ্ছে ঈশ্বর বা পরম শুভের বিশেষণ।[৮]

এরিস্টটলের মতে ঈশ্বর সব পরিবর্তনের উর্ধ্বে এক বিশুদ্ধ আকার বা রূপ। ঈশ্বর জগতের নিয়ামক ও সব কিছুর পরিচালক। ঈশ্বর সম্পর্কে এরিস্টটলের ধারণাগুলো অনেকটা ধর্মের ঈশ্বরের চেয়ে ভিন্ন। কারণ এরিস্টটলের ঈশ্বরের কাজ শুধু চিন্তন তা আবার নিজের সম্পর্কে। হেগেলের মতে ঈশ্বর পরমাত্মা বা পরম ধারণা, অসীম অনন্ত আত্মচেতনা। এভাবে সমস্ত অধিবিদ ঈশ্বর সম্পর্কে যুক্তি প্রদান করে ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

(২) আদি কারণ ঃ

এরিস্টটলের অধিবিদ্যা শুরু হয়েছে কারণের বিশ্লেষণদিয়ে। তিনি দেখলেন সব কিছুর একটি কারণ আছে। এভাবে কারণের বিশ্লেষণকরতে গিয়ে দেখা গেল সব কিছুর পেছনে এমন একটি কারণ বিদ্যমান যার আর কোনো কারণ নেই বা থাকতে পারে না। সেই কারণকে তিনি আদি কারণ নামকরণ করেন। ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে কারণের ব্যাখ্যা সব অধিবিদের আলোচনায় কম বেশি দেখা যায়। এজন্যই আদিকারণ অন্বেষণ অধিবিদ্যার অন্যতম একটি আলোচ্য বিষয়।

গ) আত্মার অমরতাঃ

আত্মা সম্পর্কে জড়বাদী ও ভাববাদী দু' ধরনের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। গ্রিক দার্শনিক এনাক্সিমিনিস এর মতে আত্মা হচ্ছে বস্তু, হিরাক্লিটাসের মতে আত্মা উষ্ণ বাষ্প, ডেমোক্রিটাসের মতে সব জাগতিক বস্তই জড় থেকে উৎপন্ন, তাই আত্মাও পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত একটি জড় দ্রব্য। প্লেটো আত্মাকে আধ্যাত্মিক দ্রব্য বলেন। জন্মের আগেই আত্মার সৃষ্টি এবং মৃত্যুর পরও তার ধ্বংস নেই। এরিস্টটলও প্লেটোর প্রায় অনুরূপ মন্তব্য করেন। আবার হিউমের মতে আত্মা হচ্ছে বিভিন্ন প্রত্যক্ষণের সমষ্টি, এটা কোন আধ্যাত্মিক

দ্রব্য নয়, এবং এখানে অমর বা অবিনশ্বর বলতে কিছু নেই। জড়বাদীগণ আত্মার জড়ীয় ব্যাখ্যা দেন। তাদের মতে দেহের ধ্বংসে সাথে সাথে আত্মারও মৃত্যু ঘটে। অন্যদিকে ভাববাদীগণ আত্মার অমরতার পক্ষে যুক্তি দেন। ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে যেসব যুক্তি রয়েছে আত্মার অমরতার পক্ষেও তারা সেসব যুক্তি উপস্থাপন করেন। পরমসত্ত্বা যেহেতু পরমশুভ সেহেতু তিনি ভালো কাজের প্রতিদান না দিয়ে পারেন না। সুতরাং আত্মাকে তিনি ধ্বংস করতে পারেন না। আত্মার অমরতার বিষয়টি মানুষের নৈতিকতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

ঘ) দেহ ও মনের সম্পর্কঃ

দেহ ও মনের সম্পর্কে নিয়ে আলোচনা অধিবিদ্যার নতুন আলোচ্য বিষয়। তবে এ সম্পর্কিত আলোচনা সেই গ্রিক দর্শন থেকেই কম বেশি চলে আসছে। জড়বাদীগণ মনে করেন আত্মা বা মনের পৃথক কোনো ব্যাখ্যা নেই বরং তা দেহের গুণকে প্রকাশ করে। চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা এগুলো ভৌত বস্তুতে সংঘটিত ভৌত ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রিটাসের তত্ত্বই এ ধরনের জড়বাদী তত্ত্বের সূচনা করেন।৯ এই জড়বাদের আধুনিক সংস্করণ দেখা যায় অভিন্নতা তত্ত্ব, আচরণবাদ প্রভৃতিতে।

অন্যদিকে ভাববাদীগণ বলেন, মন বা আত্মার পৃথক অস্তিত্ব রয়েছে। প্লেটো-এরিস্টটলের আলোচনায় দেখা যায় তাঁরা দেহ ও মনকে দুটি ভিন্ন জিনিস মনে করতেন। দেকার্ত, স্পিনোজা, লাইবনিজের বুদ্ধিবাদে এ প্রসঙ্গে আলোচনা এসেছে। ডেকার্তের মতে মন হচ্ছে অমর এবং দেহের মৃত্যুর পরে অশরীরী অবস্থায় মনের অস্তিত্ব বজায় থাকতে পারে।দেহ ও মন পরস্পর নিরপেক্ষ সত্তা হওয়ায় পিনিয়াল গ্রন্থির মাধ্যমে পারস্পারিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ঘটে। এজন্য একে Interactionism বলা হয়। স্পিনোজা ডেকার্তের সমালোচনায় করে দ্বিমুখী তত্ত্ব (Double aspect theory) অবতারণ করেন। এই মতের মূল কথা হলো, একটি তরঙ্গায়িত্ব রেখা (an undulating line) এক বিশেষ মুহূর্তে এক দৃষ্টিকোন থেকে অবতল অন্য দিক থেকে উত্তল বলে গণ্য হতে পারে। তথাপি একথা ঠিক নয় যে অবতল ও উত্তল বলে এখানে দুটি জিসিস রয়েছে। বরং একটি

জিনিসকেই দুটি পরিস্থিতিতে ভিন্ন দেখায়। তদ্রুপ মানুষের চিন্তাশীল বস্তু ও শরীরী বস্তু- উভয়টি মিলেই মানুষ। দুটি জিসিন ভিন্ননয়। স্পিনোজা এক পর্যায়ে বলেন, প্রতিটি বস্তুর জড় ও চেতনা দুটি দিক রয়েছে তা যত ক্ষুদ্রই হোক। আবার লাইবনিজ বলেন, সৃষ্টির সময় ঈশ্বর একবার দেহ ও মনের মধ্যে শৃঙ্খলা বা এক্য প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন। তাই কোনো প্রকার দৈহিক বা মানসিক ঘটনার পরিবর্তন হলে একই সময় দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটে। এই বিষয়টা অধিবিদ্যার অন্তর্ভূক্ত হওযার কারণ। মন বা আত্মায় পৃথক ধারণা ছাড়া অমরতার ধারণা নিরর্থক।

ঙ) ইচ্ছার স্বাধীনতা ঃ

ইচ্ছার স্বাধীনতার বিষয়টি মানুষের নৈতিকতার সাথে জড়িত। প্রাকৃতিক জগতের সব কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে। মানুষ তার ব্যতিক্রম। একাধিক বিপরীত বিষয়ের মধ্যে থেকে একটি বিষয় বাছাই করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তার রয়েছে। তবে কারো কারো মতে মানুষ প্রকৃতির নিয়মের অধীন তার স্বাধীন ইচ্ছা নেই। যদি এটা মেনে নেওয়া হয়তাহলে নৈতিকতার সব বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। ইমানুয়েল কান্ট তাঁর নীতিতত্ত্বের ব্যাখ্যায় যে কথাটি দিয়ে শুরু করেছেন তা হচ্ছে একমাত্র সদিচ্ছাই সবচেয়ে মূল্যবান যাকে বিনা শর্তে মেনে নেওয়া যায়। সৎ ইচ্ছার বিপরীত অসৎ ইচ্ছা যা সবচেয়ে নিকৃষ্ট।

৪. অধিবিদ্যার আলোচনা পদ্ধতি ঃ

এ প্রসঙ্গে টেইলর বলেন, অধিবিদ্যার আলোচনা অবশ্য বিশ্লেষণমূলক । সমালোচনামূলক, অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ এবং অ-আরোহী পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ এবং বিশ্ব প্রকৃতির বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক অবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বিশ্লেষণের মাধ্যমে অধিবিদ্যা তার আলোচনা করে থাকে।[১১] বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগণ অধিবিদ্যার প্রমাণের জন্য কঠোরভাবে অবরোহী পদ্ধতি অনুসরণ করেন। ডেকার্ট, স্পিনোজা, লাইবনিজসহ সব বুদ্ধিবাদী দার্শনিক এই পদ্ধতি অনুসরণ করেন।

৫. অধিবিদ্যার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

অধিবিদ্যার প্রথম ইতিহাস এরিস্টটল-ই রচনা করেন। তাঁর অমর গ্রন্থ 'অধিবিদ্যা'-য় প্লেটো পূর্ব দর্শনের সমালোচনা অধ্যায়ে প্রকৃতিবাদী ও অতিপ্রকৃতিবাদী দার্শনিকদের তিনি সমালোচনা করেন। তাঁর মতে থেলিস, এনাক্সিম্যান্ডার, এনাক্সিমিসি প্রমুখ ছিলেন প্রকৃতিবাদী দার্শনিক। এছাড়া এনাক্সাগোরাস, এম্পিডক্লিস এর আলোচনায় দেখা যায় তাঁরা আদি কারণের সংখ্যা একাধিক বলে উল্লেখ করেন। অন্যদিকে লিউসিপাস ডেমোক্রিটাল এরা প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর মধ্যে চূড়ান্ত কারণ অনুসন্ধান করেন।[১২] ইতালির ইলিয়াটিক সম্প্রদায়ের মাধ্যমে অধিবিদ্যার সূচনা ঘটে। জেনোফেনিস সর্ব প্রথম একত্বকেন্দ্রিক মতবাদের অবতারণ করেন। এরিস্টটলের মতে জেনো কোনো কিছু স্পষ্ট করে বলেননি তবে তাঁর ছাত্র পারমেনাইডিস (খ্রিঃ পূর্ব ৫৪০-৪৭০) এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।[১৩] বার্ট্রান্ড রাসেল বলেন, পারমেনাইডিস এক ধরনের আধিবিদ্যক যুক্তি আবিষ্কার করেন যা তাঁকে ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। এ ধরনের আধিবিদ্যক যুক্তি কোনো না কোন আকারে হেগেলসহ পরবর্তী অধিকাংশ অধিবিদদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।[১৪] পারমেনাইডিসের বক্তব্য ছিল- বাস্তব সত্তা অপরিবর্তনশীল ও বিশ্বজনীন সত্তা।

সক্রেটিসের বক্তব্যে ঈশ্বরের ধারণা ছিল কম। তাঁর আগ্রহ ছিল সত্য ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে। প্লেটোর Apology এবং জেনোফোনের Memorabilia গ্রন্থদ্বয়ের মাধ্যমে আমরা সক্রেটিস সম্পর্কে জানতে পারি। সক্রেটিস এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন বলে মত প্রকাশ করেন অনেকে।[১৫] আত্মার অমরতার ব্যাপারে তিনি বলেন এ ব্যাপারে ঈশ্বরই ভালো জানেন।

সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটো (৪২৭-৩৪৭ খ্রিঃ পূর্ব) অধিবিদ্যা ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রাখেন। রাসেলের মতে, প্লেটোর অধিবিদ্যার বিস্তৃতরূপই ছিল এরিস্টটলের অধিবিদ্যা। যদিও এরিস্টটল প্লেটোর মতবাদের সমালোচনা করেন। প্লেটো তাঁর কল্পিত গুহার রপকের মাধ্যমে অতীন্দ্রিয় আকারের জগতের বর্ণনা দেন। বাস্তব সত্তা ও অবভাসের পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে তাঁর এই মতবাদ গড়ে উঠে। পরবর্তী অধিবিদদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় কেউ প্লেটোপন্থী আর কেউ এরিস্টটল অনুসারী। সুতরাং তাঁর প্রভাব কত গভীর সেটা লক্ষ্য করা যায়।

প্লেটো পরবর্তী তাঁরই ছাত্র এরিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রিঃ পূর্ব) ছিলেন অধিবিদ্যার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। জ্ঞানের প্রায় প্রতিটি বিষয়ে তিনি কলম ধরেন। তাঁর পদার্থবিদ্যা, জীব বিদ্যা, রাজনীতি বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিদ্যাসহ অন্যান্য বিষয় যুগের পরিবর্তনে গুরুত্ব হারিয়ে ফেললেও অধিবিদ্যা ও যুক্তিবিদ্যার গুরুত্ব কোনো অংশেই কমেনি। তাঁর অধিবিদ্যা গ্রন্থের সূচনাতেই ৪টি কারণের (উপাদান কারণ, রূপগত, নিমিত্ত কারণ ও পরিনতি কারণ) ব্যাখ্যার মাধ্যমে আদি কারণের অনুসন্ধান করেন। সেখানে গিয়ে তিনি পরম সত্তার সন্ধান পান। এটা প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর অধিবিদ্যার মূল লক্ষ্য।[১৬] পরবর্তীতে ইবনে সিনা, ইবনে রুশদ, একুইনাস সহ অসংখ্য দার্শনিক তাঁর চিন্তা ধারায় প্রভাবিত হন। এরিস্টটলের মৃত্যুর মাধ্যমে গ্রিক দর্শনের মোটামুটি সমাপ্তি ঘটে। পৃথিবীতে আলোচনা চলতে থাকে গ্রিক পন্ডিতদের কীর্তিকথা নিয়ে। সেন্ট আগাস্টিন (৩৫৪-৪৩০ খ্রিঃ) ছিলেন এরিস্টটল পরবর্তী অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাশ্চত্য দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ববিদ । তিনি প্লেটোর অধিবিদ্যার অনুসারী ছিলেন। তাঁর Confession এবং City of God গ্রন্থে দর্শনের আলোচনা এসেছে। অন্যসব দার্শনিকের উপর তিনি প্লেটোকে স্থান দেন। রাসেলের ভাষায়, তিনি মনে করেন ঈশ্বর কোনো দেহধারী বস্তু নন, কিন্তু সব বস্তুই ঈশ্বর এবং অপরিবর্তনীয় কোনো কিছু থেকে সত্তা প্রাপ্ত হয়।[১৭]

অন্যদিকে টমাস একুইনাস (১২২৫-১২৭৪ খ্রি:) এরিস্টটলের অধিবিদ্যার অনুসরণ করে সেটাকে আরো গ্রহণযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করেন। এরিস্টটলের গ্রন্থের টীকা লিখে তিনি অধিবিদ্যা পাঠ সহজতর করেন। তিনি অধিবিদ্যায় সত্তার ভুমিকা আরো সুস্পষ্ট করেন। পল হরিগন বলেন, এরিস্টটল যেখানে Form বা আকারকে প্রাধান্য দেন একুইনাস সেখানে সব জিনিসের চূড়ান্ত আধিবিদ্যক ভিত্তি বা সত্তা কর্মকে জোর দেন।[১৮] ঈশ্বরের অস্তিত্বের উপর তাঁর ৫টি যুক্তি উল্লেখযোগ্য যদিও এগুলোতে এরিস্টটলের অনুসৃতি রয়েছে।

দর্শনের আধুনিক যুগে অধিবিদ্যার আধুনিকায়ন ঘটে। ডেকার্টের মাধ্যমে আধুনিক দর্শনের যে ধারা সূচিত হয় তা ছিল বুদ্ধিবাদী ধারা। ফ্রান্সিস বেকন এরিস্টটলের সমালোচনার মাধ্যমে এর ভিত্তি রচনা করেন, ডেকার্ট তার পূর্ণতা দেন। বিজ্ঞানমনস্ক

দার্শনিক ডেকার্ট (১৫৯৬- ১৬৫০ খ্রিঃ) সংশয়ের মাধ্যমে নিশ্চিত সত্যে উপনীত হন নিজের অস্তিত্ব এবং পরে ঈশ্বরের অস্তিত্বে। তিনি বলেন আমি সব কিছুকেই সন্দেহ করতে পারি, কিন্তু সন্দেহ ক্রিয়াকে সন্দেহ করতে পারি না, এভাবে আমার মনের অস্তিত্বকে সন্দেহ করতে পারি না এবং আমার অস্তিত্বের পেছনে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ ঈশ্বরই কেবল ক্রিয়াশীল।[১৯] মধ্যযুগের ধর্মতত্ত্ববিদ সেন্ট আনসেল্‌ম এর অনুসরণ করে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি দেন। বুদ্ধিবাদী এই ধারা থেকেই Metaphysics এর প্রতিশব্দ হিসেবে ontology শব্দের শুরু হয়।[২০] স্পিনোজা জগতের কারণ রূপে ঈশ্বরকে অভিহিত করেন। লাইবনিজ (১৬৪৬-১৭১৬) ছিলেন আধুনিক কালের প্রথম জার্মান দার্শনিক যিনি একটা আধিবিদ্যক সিস্টেম দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন। লাইবনিজ পরবর্তী দার্শনিক ক্রিশ্চিয়ান ভলফ (১৬৭৯-১৭০৪) মনে করেন তিনটি মৌলিক সহজাত ধারণা থেকে বুদ্ধি ও যুক্তির মাধ্যমে সব রকম জ্ঞান সম্ভব। এই তিনটি ধারণা হলো ঈশ্বর, আত্মা ও জগৎ সম্পর্কিত ধারণা। সহজাত ধারণা আত্মা থেকে আমরা মন সম্পর্কে সব রকমের জ্ঞান পাই এবং সেই জ্ঞানকে তিনি নাম দেন যৌক্তিক মনোবিজ্ঞান (Rational Psychology)। সহজতা ধারণা ঈশ্বর থেকে যে জ্ঞান সম্ভার আমরা পাই তার নাম যৌক্তিক ধর্মবিজ্ঞান (Rational Theology) এবং সহজাত ধারণা জগৎ থেকে পাই যৌক্তিক বিশ্বতত্ত্ব (Rational Cosmology)।[২১]

আধুনিক অভিজ্ঞাতবাদী দর্শনের অগ্রনী ছিরেন জন লক (১৬৩২-১৭০৪) । তিনি বুদ্ধিবাদের সমালোচনা করে বলেন সহজতা ধারণা বুদ্ধির সাহায্যে ঈশ্বরের প্রমান করা যায় না। তবে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয়ে যুক্তি না খুঁজে বিশ্বাসকেই প্রাধান্য দেন। একই কথা আত্মার অমরতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অভিজ্ঞাবাদী ধারার দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তি বিশপ বার্কলি (১৬৮৫-১৭৫৩) জড়বাদ খন্ডত করে বলেন, জড় দ্রব্য ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষণ নির্ভর ধারণার অবভাস। জড় দ্রব্যের অস্তিত্ব অপ্রমানের পর যা থাকে তাহলো আত্মা, পরমাত্মার ধারণা। এভাবে বিশ্বজগতের পেছনে একমাত্র ঈশ্বর এবং তার নিয়মকানুনই অস্তিত্বশীল থাকতে পারে।[২৩]

কান্ট ও হেগেল অধিবিদ্যার ইতিহাসে দুটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। কান্ট একদিকে অধিবিদ্যাকে হত্যা করেন অন্যদিকে, বাস্তব প্রয়োজনে আবার জীবিত করেন। বিশুদ্ধ বুদ্ধি বা যুক্তির সাহায্যে তিনি অধিবিদ্যাকে খন্ডন করেন।

হেগেল কান্টের মত দু'ধরনের কথা না বললেও তার দর্শন দুর্বোধ্য। তার মতে আমরা যাকে বিশ্ব প্রক্রিয়া বলি তা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নিরন্তর একটি পরিকল্পনার প্রকাশ ও বিকাশ ঘটেছে। এই পরিকল্পনাই হচ্ছে পরম ধারণা (Absolute Idea) প্লেটোর ধারণার জগতের সাথে এক্ষেত্রে হেগেলের পরম ধারণার কিছু মিল রয়েছে। তিনি বলেন, পরম সত্তাকে সংজ্ঞায়িত করা যায় এমন একটি ধারণা বা কল্পনা হিসেবে যা তার নিজ সম্পর্কে সচেতন। অন্য কথায়, পরম সত্তাকে অভিহিত করা চলে এমন একটি বিদ্যাত্মা বা বিশ্ব আত্মা বলে যা চিন্তা করে এবং যাকে ধর্ম রূপক অর্থে ঈশ্বর বলে চিত্রিত করে।[২৩] হেগেল আরো বলেন, ঈশ্বর জগতের সজীব গতিশীল প্রজ্ঞা; তিনি নিজেকে জগতে, প্রকৃতিতে এবং ইতিহাসে প্রকাশ করে থাকেন।[২৪]

হেগেলের (১৭৭০-১৮৩১) মৃত্যুর পর হেগেলের দর্শন দু'ভাগ হয়ে যায়- হেগেলীয় গণ ও হেগেলীয় বাম। হেগেলীয় বাম হেগেলের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির মাধ্যমে জড়বাদী রূপ ধারণ করে। কার্ল মার্কস, এঙ্গেলস, লেলিন হেগেলের মতের জড়বাদী ব্যাখ্যা দেন। তারা ঈশ্বর, ধর্ম, নৈতিকতা অধিবিদ্যাকে বর্জন করেন। তারা সব কিছুকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে দেখেন। অন্য দিকে হেগেলীয় ডানপন্থীগণ হেগেলের ভাববাদকে গ্রহণ করেন মনে প্রাণে। যদিও এই চিন্তা ধারার বিকাশে কিছুটা বিলম্ব হয় তবুও তা জামার্নীর বাইরে বিশেষত বৃটেনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। এই ধারার নেতৃত্বস্থানীয়গণ ছিলেন টমাস হিল গ্রীন (১৮৩৬-১৮৮২), এডওয়ার্ড কেয়ার্ড (১৮৩৫-১৯০৮) এবং মার্কিন দার্শনিক যোসিয়া রয়েস ১৮৮৫-১৯১৬ প্রমুখ। তারা সবাই একই মতের অনুসারী না হলেও এক আধ্যাত্মিক পরমাত্মা বা পরমসত্তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন জগতের মূল কেন্দ্র হিসেবে।

Dhaka University Institutional Repository

অধিবিদ্যার সাথে অন্যান্য বিষয়ের সম্পর্ক

অধিবিদ্যা সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা নেওয়ার জন্য জ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ের সাথে এর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। আমরা এখানে বিজ্ঞান, ইতিহাস, নীতিবিদ্যা ও ধর্মতত্ত্বের সাথে অধিবিদ্যার সম্পর্ক নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

ক. অধিবিদ্যা ও নীতিবিদ্যা ঃ

অধিবিদ্যার সাথে নীতিবিদ্যার একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তবে যাঁরা অধিবিদ্যাকে অপ্রয়োজনীয় ও অনাবশ্যক মনে করেন তাদের কাছে নীতিবিদ্যার সাথে অধিবিদ্যা ও ধর্মতত্ত্বের কোনো সম্পর্ক নেই। উইলিয়াম লিলি নীতিবিদ্যার সংজ্ঞায় বলেন, 'সমাজে বসবাস কারী মানুষের আচরণের সম্পর্কীয় এমন একটি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান, যা সেই আচরণের ন্যায়ত্ব বা অন্যায়ত্ব কিংবা ভালো বা মন্দত্বকে একটি আদর্শের আলোকে বিচার করে।'[২৫] অন্যদিকে অধিবিদ্যার কাজ বাস্তব সত্তার অনুসন্ধান। নীতিবিদ্যায় যে আদর্শের আলোকে ভালো-মন্দের বিচার করা হয় সেই আদর্শ বা মানদন্ড নীতিবিদ্যাকে অধিবিদ্যার কাছে নিয়ে আসে। যদি সর্বোচ্চ কোনো মানদন্ড না থাকে তাহলে যথার্থ বিচার সম্ভব নয়। কিন্তু যাঁরা অধিবিদ্যাকে অস্বীকার করেন তাঁরা বলবেন নীতিবিদ্যা একটি স্বাধীন বিভাগ। নীতিবিদ্যার দীর্ঘ ইতিহাসের আলোকে আমরা একটু আলোকপাত করতে চাই।

সক্রেটিস-প্লেটোর দর্শনে নৈতিকতার বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সক্রেটিস নৈতিক সততার জন্যই জীবনোৎসর্গ করেন। তবে সক্রেটিস ও প্লেটো নৈতিকতাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন রূপে গণ্য করতেন। [২৬] এরিস্টটল অধিবিদ্যা রচনার পর নীতিবিদ্যায় হাত দেন। অধিবিদ্যার সাথে তিনি নীতিবিদ্যার সংযোগ সাধন করেন। বার্ট্রান্ড রাসেল বলেন, তাঁর অধিবিদ্যক মতবাদ সমূহ নৈতিক আশাবাদের অভিব্যক্তি। তবে সম্পূর্ণভাবে তাঁর নৈতিক মতবাদ অধিবিদ্যার উপর নির্ভরশীল না হলেও অধিবিদ্যার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ নয়।[২৭]

এপিকিউরাসকে (৩৪১-২৭০ খ্রি.পূ.) বলা হয় স্টোয়িক সুখবাদের প্রথম উপস্থাপক। তবে স্টোয়িকবাদের প্রধান অনুসারী জেনো (৩৩৬-২৬৪ খ্রি. পূর্ব) মনে করতেন নৈতিকতা ঈশ্বর কর্তৃক নির্ধারিত হয়। এপিকটেটাস (৫০-১৩০ খ্রি.) বলেন, মানুষ তার প্রজ্ঞা বা বুদ্ধির মাধ্যমে নৈতিকভাবে কাজ করতে সক্ষম। এজন্যই তাঁকে কান্টের পূর্বসূরী বলা হয়। সেন্ট অগাস্টিন (৩৫৪-৪৩৩ খ্রি.) খ্রিষ্ট ধর্মের আলোকে নৈতিকতার ব্যাখ্যা দেন। তাঁর মতে পূণ্যবানগণ মৃত্যুর পর City of God এ অবস্থান করবে। সেন্ট একুইনাস অগাস্টিনের মত খ্রিষ্টীয় নৈতিকতাকেই নৈতিকতার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন; তবে এরিস্টটলের নীতিবিদ্যার মূলনীতি গুলোকে তিনি

অনুসরণ করেন। তাঁর মতে সুখই হচ্ছে কামনার যোগ্য চূড়ান্ত উদ্দেশ্য। কিন্তু পার্থিব জীবনে প্রকৃত সুখ উপলব্ধি করা যায় না, এই সুখের উপলব্ধি ঈশ্বরের উপলব্ধিতে পাওয়া যায়। ডানস স্কটাস (১২৬৫-১৩০৮) মনে করতেন ঈশ্বরের ইচ্ছাই নৈতিকতার চূড়ান্ত ভিত্তি।[২৮]

আধুনিক যুগে টমাস হবস (১৫৮৮-১৬৭৯) প্রথম নৈতিকতার আধিবিদ্যক মত ত্যাগ করেন। Laviathan গ্রন্থে তিনি নৈতিকতাকে ব্যাখ্যা করেন পার্থিব দৃষ্টিকোন থেকে। তাঁকে অনুসরণ করেন হিউম (১৭১১-৭৬), তবে হবসের মত সার্বভৌম রাজার ধারণা প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর মতে নৈতিকতার উৎস আমাদের মানসিকতা (Sentiments)। আমাদের আচরণ, অনুভূতিই নৈতিকতাকে নির্দেশ করে। আমার পরিবারের একজনের প্রতি দায়িত্ব অন্যদের চেয়ে আমারই বেশি। এভাবে সম্পূর্ণ ধর্ম-নিরপেক্ষনৈতিকতার ধারণা তিনি দেন। অন্যদিকে কান্ট (১৭২৪-১৮০৪) হিউমর মত প্রত্যাখ্যান করে বলেন, অনুভূতি নৈতিকতার উৎস নয়, বরং ন্যায় অন্যায় উপলব্ধির জন্য প্রতিবন্ধক। তাঁর মতে নৈতিক অবধারণ অভিজ্ঞতা পূর্ব। বেনথাম, মিলের উপযোগবাদ আধুনিক বৃটিশ নীতিবিদ্যায় বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। তবে উপযোগবাদ বা সুখবাদ গোড়া থেকেই অধিবিদ্যার প্রভাব মুক্ত।[২৯]

সমকালীন নীতিবিদ্যায় মূরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভালোর সংজ্ঞার জন্য তিনি Principia Ethica গ্রন্থখানি রচনা করেন। কিন্তু ভালোর কোনো সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়- এটাই তিনি এখানে প্রমাণ করেন। মূর একজন নব্যবাস্তববাদী ও বিশ্লেষণী দার্শনিক। প্রচলিত নীতিবিদ্যা আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যা নামে পরিচিত। কিন্তু মূর নীতিবিদ্যায় আদর্শনিষ্ঠ হওয়ার পরিবর্তে বিশ্লেষণী ভাবধারা প্রয়োগ করেন। এই ভাবধারা বর্তমানে Metaethics বা পরানীতিবিদ্যা নামে পরিচিত। হাসনা বেগমের[৩০] বিশ্লেষণে মূর নৈতিকতাকে প্রাকৃতিক ও প্রাকৃতিক নয়- দু'ভাগ করেন, আবার 'প্রাকৃতিক নয়' কে অপ্রাকৃতিক ও অতীন্দ্রিয় নামে আরো দু'ভাগ করেন। মূরের মতে অপ্রাকৃতিক মতবাদই যথার্থ। আবার আধিবিদ্যক মতবাদকে অতীন্দ্রিয় বলে প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর মতে, মিল, বেনথাম, হবস প্রমুখ ভালোকে প্রাকৃতিক বা অভিজ্ঞতামূলক শব্দের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করে ভুল করেছেন। এজন্য এই ভুলকে তিনি প্রাকৃতিকীয় অনুপপত্তি নাম করণ করেন। তিনি বলেন, ভালোকে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নয় যেমন, হলুদ রং এর সংজ্ঞা প্রদান অসম্ভব কাজ। হলুদকে তখনই আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি যখন তা অন্য একটি বস্তুতে যুক্ত হয়, পৃথক হলুদের কোনো ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। একই ভাবে ভালোর সংজ্ঞায়নও সম্ভব নয়, তবে কোন জিনিস ভালো তা আমরা বলতে পারি। মূর নীতিবিদ্যাকে অধিবিদ্যার প্রভাবমুক্ত মনে করেন। তাঁর ভাষায় 'একটি আধিবিদ্যক নীতিবিদ্যা' এ তথ্য দ্বারা বিশেষ ভাবে চিহ্নিত যে, এ নীতিবিদ্যা দাবি করে : যা সম্পূর্ণ

রূপে ভালো তা হলো এমন জিনিস যা অস্তিত্বশীল, কিন্তু প্রাকৃতিক নয়; যর্থাৎ একটি অতীন্দ্রিয় সত্তা যে সব বৈশিষ্ট্য ধারণ করে সে সব বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে বিদ্যমান।[৩১] তিনি আরো বলেন, 'আমি স্বীকার করি যে, অধিবিদ্যার পক্ষে উচিত এরকম অতীন্দ্রিয় সত্তাকে বিশ্বাস করার পক্ষে কী যুক্তি থাকতে পারে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা। কারণ, আমি মনে করি যে সব জিনিস প্রাকৃতিক নয় সেগুলোর সত্যতাই অধিবিদ্যার বিশেষ বিচরণ ক্ষেত্র।'[৩২]

ম্যুর অপ্রাকৃতিক গুণ দ্বারা অতীন্দ্রিয় গুণকে বুঝাননি, যদিও ভিটগেনস্টাইন মনে করতেন অপ্রাকৃতিক গুণ মানেই আধিবিদ্যক বা অতিপ্রাকৃতিক গুণ, যেখান তৃতীয় প্রকারের আর কোনো গুণ নেই। তবে E.D. Klemke ভিটাগেনস্টাইনের এই ধারণাকে ভুল বলে প্রত্যাখ্যান করেন।[৩৩] হাসনা বেগম বলেন, 'মূরের মতে কালের মধ্যে অস্তিত্বশীল নয় জ্ঞানের এমন বিষয়বস্তুকে সনাক্ত করে অধিবিদগণ সত্যের পথে নিশ্চিত ভাবেই খানিকটা এগিয়ে গেছেন। কিন্তু একটি বস্তু যদি প্রকৃতিতে অস্তিত্বশীল না হয় তবে তা অবশ্যই অতীন্দ্রিয় জগতে অস্তিত্বশীল রয়েছে এই ভুল অনুমানের কারণে ছদ্মবস্তুকে জ্ঞানের যথার্থ বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করে তাঁরা ভুল করেছেন। তাঁদের এমত ভ্রান্তকারণ অস্তিত্ব কেবল প্রকৃতিতেই সম্ভব, কোনো অতীন্দ্রিয় জগতে সম্ভব নয়।[৩৪] মূর অতীন্দ্রিয় সত্তা ও ঈশ্বরের অস্তিত্বে গভীর সংশয় প্রকাশ করেন। তাঁর Ethics গ্রন্থে এসেছে '..... এধরনের দৃষ্ঠিভঙ্গির (কোনো অ-মানবীয় সত্তা আছে যেমন, ঈশ্বর, প্রজ্ঞা ইত্যাদি যা আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করে) বিরুদ্ধে প্রবলতম আপত্তি হলো, খুব কম করে বললেও এরূপ কোনো সত্তা আছে কিনা তা চরমভাবে সন্দেহপূর্ণ- যে সত্তা সব সময় যা সঠিক তাই ইচ্ছা করে কিন্তু সঠিক নয় এমন কোনো ইচ্ছা কখনোই পোষণ করেনা; এবং আমি নিজে মনে করি যে, এরূপ কোনো সত্তা থাকার কোনোই সম্ভাবনা নাই- সম্ভবত কোনো ঈশ্বর নাই অথবা এমন কোনো সত্তা নাই- যাকে দার্শনিকগণ আমি যেসব নামের কথা উল্লেখ করেছি সে সব নামে অভিহিত করেন।[৩৫]

তবে এফ এইচ ব্রাডলির মতে নীতিবিদ্যা ও অধিবিদ্যার গন্তব্যস্থল এক ও অভিন্ন। ড. আমিনুল ইসলাম বলেন "যে অনুত্তরকে (alsolute) ব্রাডলি তাঁর অধিবিদ্যায় জ্ঞান ও সত্যের পূর্ব ধারণা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, তাই তাঁর নীতি দর্শনের নৈতিক আদর্শ হিসেবে গৃহীত। অনন্ত সমগ্রে, নিজেকে একটি আত্মসচেতন সদস্য হিসেবে আবিষ্কার ও উপলব্ধি করাই নৈতিকতার লক্ষ্য। [৩৬]

আইরিস মারডক Metaphysics and Ethics[৩৭] প্রবন্ধে সমকালীন নীতিদর্শনিকদের বিভিন্ন মতবাদ আলোচনার পর বলেন, নীতিবিদ্যা নৈতিক ভাষার অধীনে কোনো শাস্ত্র নয়, এর বিচরণ ক্ষেত্র অনেক ব্যাপক। যাঁরা ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে নৈতিকতাকে ব্যাখ্যা করতে চান তাঁরা আসলে নৈতিকতার উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরে যান। সাধারণ মানুষ ও ধর্মানুরাগীগন তা কখনো কামনা করেন না। মূর 'ভালো'র সংজ্ঞায়নের যে প্রচেষ্টা

চালান তাও ছিল এক ধরণের ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। মারডকের মতে, আমরা যখন নৈতিকতার কেন্দ্র হিসেবে ভালোকে অনুমান করতে শুরু করলাম তখন আসলে শব্দ দ্বারাই আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি। কিন্তু আমরা সত্য, সাহস, স্বাধীনতা, আন্তরিকতা প্রভৃতি নৈতিক শব্দকে অবহেলা করেছি। ভালোত্ব একটি সমৃদ্ধ ও সমস্যাপূর্ণ ধারণা, কিন্তু সত্য আমাদেরকে আধুনিক জগতের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য দান করো তিনি মনে করেন, আধুনিক দর্শন অধিবিদ্যা বিরোধী। কিন্তু এই বিরোধিতার কোন গভীর ভিত্তি নেই, আছে ভিটগেনস্টাইনের শিক্ষা যেখানে একটি একক সূত্রের আলোকে নৈতিকতার ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। মারডক চলেন, নীতিবিদ্যার উন্নতির জন্য আমাদের এ ধরনের একক নিয়মের লোভ পরিহার করা উচিত।

সমকালীন একজন বিখ্যাত নীতিবিদ পিটারসিঙ্গার মনে করেন নৈতিকতার সাথে ঈশ্বর ধর্ম বা অধিবিদ্যার কোনো সম্পর্ক নেই। তাঁর প্রশ্ন ঈশ্বরকেই যদি ভালো-মন্দের মানদণ্ড বানানো হয় তাহলে ঈশ্বর কি ঈশ্বর দ্বারাই অনুমোদিত? [৩৮] তাঁর এই মন্তব্য সেই পুরাতন প্রশ্নকেই স্মরণ করিয়ে দেয়, ঈশ্বর যদি সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা হন তাহলে ঈশ্বরকে কে সৃষ্টি করেছেন? প্রকৃতপক্ষেআমাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে দেশ কালের ব্যাখ্যা যেমন অসম্ভব তেমনি এধরনের প্রশ্নের উত্তরও সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে ড. আনিসুজ্জামানের একটি উক্তি প্রনিধান যোগ্য। নৈতিকভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের প্রয়োজন আছে কিনা এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আসলে এরূপ কোনো আধ্যাত্মিক সত্তা আছে কি নেই এ বিতর্কে আমাদের প্রবেশের প্রয়োজন নেই। কেউ এ ধরনের সত্তায় বিশ্বাস না করলেও ক্ষতি নেই। আমরা আমাদের কল্পনার স্ফুর্তির জন্য এ ধরনের সত্তার অস্তিত্ব ধরে নিতে পারি। আর এরূপ অবস্থায় এ ধরনের সত্তার কল্পনা কোনো যুক্তিবিরোধী বা অবোধগম্য কিছু নয়।'[৩৯]

খ. অধিবিদ্যা ও ইতিহাস ঃ

সহজ কথায় ইতিহাস হচ্ছে অতীত কালের ঘটনাবলী ও তার বিশ্লেষণ। ইবনে খালদুন বলেন, "ইতিহাস এক অতীব উচ্চমানের জ্ঞান। তার কল্যাণ বিপুল, অত্যন্ত শুভফল উৎপাদক। প্রাচীন জাতি ও জনগোষ্ঠী সমূহের নৈতিক অবস্থা, নবীদের জীবনালেখ্য, শাসক প্রশাসকদের প্রশাসন ব্যবস্থা এবং তাদের রাজনীতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে ইতিহাস। যে কেউ ধর্মীয় ও বৈষয়িক ব্যাপারাদিতে অতীত লোকদের পদাক অনুসরণ করবে, সে অবশ্যই কল্যাণময় ভাগ্যের অধিকারী হবে।"[৪০] খ্রিঃ পূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে হিরডোটাস প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন বলে তাঁকে ইতিহাসের জনক বলা হয়। P.L. Gardiner[৪১] তাঁর Metaehysics and History প্রবন্ধে বলেন, ইতিহাসের প্রশ্নগুলো সাধারণত, কে, কী কারণে, কার মাধ্যমে ইত্যাদি ধরণের আর এসব প্রশ্নের উত্তর ঐতিহাসিকগণই দিয়ে থাকেন। তবে ১৮ ও ১৯ শতকে এসে ইতিহাসে দার্শনিক আকর্ষণ সৃষ্টি হয়।

গার্ডিনারের বক্তব্যের আলোকে অধিবিদ্যার সাথে ইতিহাসের একটি সম্পর্ক ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা করব। তাঁর মতে অধ্যাপক এ.জে. টয়নবীর (১৮৫৯-১৯৭৫) বিখ্যাত A Stady of History গ্রন্থে তিনি ইতিহাসের পদ্ধতিকে আরোহী পদ্ধতি বলে মন্তব্য করেন। ১২ ভলিউমের বিরাট এই গ্রন্থের প্রথম দুই ভলিউমে (Booke of Genesis- এ) সভ্যতার উত্থান ও পতনের কারণ ব্যাখ্যা করেন। তিনি দাবি করেন তাঁর তৈরি পদ্ধতি বিভিন্ন সংস্কৃতির নিবিড়পরীক্ষণের মাধ্যমে করা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে অভিজ্ঞতামূলক নীতির প্রয়োগ করা হয়েছে।

গার্ডিনার মনে করেন কান্টের আলোচনাতেই প্রথম ঐতিহাসিক অধিবিদ্যার সূচনা ঘটে। কান্টের প্রশ্ন ছিল, একটি একক এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে ইতিহাসের যৌক্তিক পরিচালনা কে করেন? তাঁর মতে মানবজাতির মধ্যে প্রকৃতি এমন একটি ক্ষমতা দিয়েছে যা তাকে সম্পূর্ণ ভাবে বিকশিত করতে, ঐক্যবদ্ধভাবে সমাপ্তির দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম এবং এই প্রক্রিয়া পূর্ব নির্ধারিত। একই ভাবে তিনি ইতিহাসকেও পূর্ব নির্ধারিত এবং প্রকৃতির পরিকল্পনার বাস্তবায়ন মনে করেন। কান্ট মনে করেন, ইতিহাসের এই গতিধারা অনিবার্য ভাবে চলমান এতে কোনো ব্যতিক্রম ঘটবেনা। তবে কেন অনিবার্য তার একটি ব্যাখ্যাও তিনি দেন। তিনি 'প্রকৃতিকে' বুদ্ধিমান সত্তা হিসেবে উল্লেখ করেন এবং এই 'প্রকৃতিই' তার নিজস্ব পরিকল্পনার আলোকে আমাদের মানব জাতিকে সাজিয়েছে। তিনি এক্ষেত্রে একজন মালির উদাহরণ দেন যিনি উপযুক্ত পরিচর্যার মাধ্যমে একটি বিশেষ ধরনের বৃক্ষ উৎপাদন করতে চান। গাডিনার এতে প্রশ্ন করেন, তাহলে আমাদের মালির অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে, যার কাজ, অভ্যাস আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা জানতে পারি। তাই মালির উদাহরণটি প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। প্রকৃতির পরিকল্পনা মূলত একটি অতীন্দ্রিয় সত্তাকে নির্দেশ করে। কান্ট চেয়েছিলেন ইতিহাসকে একটি উদ্দেশ্যের সমন্বয় রূপ ব্যাখ্যা করতে যেখানে নৈতিক নিয়ম কার্যকর কিংবা তা ন্যায় বিচারের মূর্ত প্রতীক হিসেবে বোধগম্য হবে। তাঁর মতে ইতিহাস এমন কর্তৃত্বশীল যা এর মূল্যায়নকারীকে প্রতিদান দিয়ে থাকে শাস্তি বা পুরস্কার রূপে।গার্ডিনার মনে করেন, ইতিহাসের আধিবিদ্যক তত্ত্বে দুটি বিষয়ের লক্ষ্য করা যায়: প্রথমত, তা সমগ্র ইতিহাসকে একটি একক ধারণার আলোকে ব্যাখ্যা করে অর্থাৎ ইতিহাস একটি পরিকল্পনার অংশ। দ্বিতীয়ত্ব, ইতিহাসকে সমগ্র বাস্তব সত্তার ব্যাখ্যার একটি প্রচেষ্টা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।

হেগেল ছিলেন- প্রথম প্রকার মতের অনুসারী। তাঁর মতে ইতিহাস একটি ব্যাপকতর পদ্ধতির অনিবার্য অংশ যা মন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এটা একটা বিস্তৃত পদ্ধতি। শোপেন হাওয়ারও ছিলেন এই মতের অনুসারী, তাঁর মত ছিল দর্শনের জন্য একমাত্র সম্ভাব্য কর্মসূচি হলো, সঠিক কিছু ধারণার মধ্যেই বিশ্বপ্রকৃতির একটি পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভুল চিত্রায়ন। আর হেগেলের মতবাদের কেন্দ্রে আছে সেই সঠিক ধারণা। দর্শনে গণিতের অনুপ্রবেশের জন্য তিনি

দর্শনের সমালোচনা করেন। তাঁর মতে গণিত একটি ত্রুটিপূর্ণজ্ঞান এবং দর্শনের উপর গণিতের প্রভাব দুর্ভাগ্যজনক। কারণ গনিত যুক্তিবিদ্যার মূল বিধিকে মেনে চলে যেমন, একটি জিনিস এমন হতে পারেনা যা সে নয় এবং সে যে ধরণের অবশ্যই সেই ধরণেরই হবে। এসব নিয়মের মাধ্যমে বস্তুর চূড়ান্ত সত্য পাওয়া যায়না। হেগেলের মতে, বিশ্বজগৎ সম্পর্কিত আলোচনার গণিতের ব্যবস্থার বস্তুর সেসব বৈশিষ্ট্যকেই বিবেচনায় আনে যেগুলোর পরিমাপ করা সম্ভব; যেমন, বস্তুর আকার, ওজন ইত্যাদি। কিন্তু আক্ষরিক অর্থে চিন্তার পরিমাপ বা ধারণার ওজনের কথা আমরা বলতে পারিনা। আর বিশ্বজগৎ মন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নিজস্ব অভ্যন্তরীণ চিন্তা ও নীতির আলোকে চিরন্তনভাবে সম্মুখে অগ্রসরমান, এখানে গাণিতিক নিয়ম কার্যকর নয় বরং মানসিক নিয়ম কার্যকর।

কার্লমার্ক্স হোগেলের বিরোধিতা করে বলেন, ফ্রান্সের রাষ্ট্র ক্ষমতায় তৃতীয় নেপোলিয়ানের উত্থান শেষ বিশ্লেষণে সেখানকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক শ্রেণি কাঠামোর কারণে হয়েছে। অর্থাৎ তিনি অর্থনৈতিক বাস্তুগত কারণকেই ইতিহাসের চালক বলে গণ্য করেছেন। অন্যদিকে হেগেলের ইতিহাসের পেছনে 'Principle' বা নীতির যে ব্যাখ্যা দেন, এর অর্থ মানবেতিহাসের প্রতিটি পর্যায় এক একটি বিশেষ 'Principle' এর আলোকে ঘটে, যেখানে ধর্ম, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, নৈতিকতা, আইন-কানুন, চালচলন এমনকি বিজ্ঞান, শিল্প ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার ভূমিকা রয়েছে। হেগেল ঐতিহাসিক বিকাশের পেছনে মনকে অর মার্ক্স বস্তুকে প্রাধান্য দেন। একারণেই হেগেল ইতিহাসের আধিবিদ্যক বিশ্লেষণের অন্যতম অগ্রপথিক। এই ছিল PL Gardiner এর আলোচনার সারাংশ।

আমরা লক্ষ্য করেছি, ইতিহাসের যে সুশৃঙ্খল আবর্তন ও বিবর্তন তা কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়মের লংঘনে হতে পারে না। এর পেছনে কোনো বুদ্ধিমান সক্রিয় বাস্তবসত্তার কল্পনা না করে প্রকল্প গঠন করা সম্ভব নয়। সুতরাং অধিবিদ্যার সাথে ইতিহাসের ঘনিষ্ট সম্পর্ক আমরা অস্বীকার করতে পারি না। প্রকৃতপক্ষে আলেকজান্ডার গ্রেট থেকে বৃটিশ ফরাসি উপনিবেশ শাসন পর্যন্ত দীর্ঘ ইতিহাসে শুধু অর্থই কাজ করেছে তা আমরা বলতে পারি না। একটি সভ্যতার পতন অর্থের অভাবেই ঘটেনি। এর পেছনে সক্রিয় সত্তা বিদ্যমান।

গ. অধিবিদ্যা ও ধর্মতত্ত্ব ঃ

অধিবিদ্যার সাথে ধর্মতত্ত্বের সবচেয়ে ঘনিষ্টতা। এরিস্টটলের মতে, "ধর্মতত্ত্ব সেই সভা সম্পর্কে আলোচনা করে যেই সত্তা সত্তাধর্মী ও স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে চূড়ান্ত স্বাধীনতার সাথে একত্রে গ্রথিত করে।" [৪২] তিনি পদার্থবিদ্যা গণিতশাস্ত্র ও ধর্মতত্ত্বকে সবচেয়ে তাত্ত্বিক বিজ্ঞান বলে অভিহিত করেন এবং এগুলোর মাঝে ধর্মতত্ত্বকে সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ন ও সর্বোচ্চ শ্রেণীর অধিবিদ্যা বলে বিবেচনা করেন। এর কারণ খুব সহজ, ধর্মতত্ত্ব যেই মূল কেন্দ্র বিন্দু নিয়ে কাজ করে অধিবিদ্যা তাই প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

ড. আবদুল জলীল তাঁর A Contemporary Philosophy of Religion[44] গ্রন্থে ধর্মতত্ত্ব ও ধর্ম দর্শনের মধ্যে যে পার্থক্য দেখান সেখান থেকে আমরা ধর্মতত্ত্বের সহজ পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করব। তিনি ধর্মতত্ত্বকে Science of Religion বলে মন্তব্য করেন যার উদ্দেশ্য ধর্ম ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও বিকাশের কাজে নিয়োজিত ; মনস্তাত্ত্বিক ভাবে, বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আচরণের মনস্তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে ধর্মতত্ত্ব কাজ করে আর তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে, বিভিন্ন ধর্মীয় পদ্ধতি ও অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ এবং ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য, আইন, চরিত্র ইত্যাদির মাধ্যমে ধর্মের মূল ধারণা ঈশ্বরকে আবিষ্কার করা। সহজ কথায় ধর্মতত্ত্ব ধর্মীয় অভিজ্ঞতার পদ্ধতিগত অধ্যয়ন অর্থাৎ ধর্মতত্ত্ব মানেই হলো তা খ্রিষ্টীয়, ইহুদী, হিন্দু, বৌদ্ধ বা মুসলিম ধর্মতত্ত্ব হবে। তাঁর মতে, ধর্মতত্ত্ব প্রাকৃতিক বা প্রত্যাদিষ্ট হতে পারে। প্রাকৃতিক ধর্মতত্ত্বে ঈশ্বরকে অনুসন্ধানের জন্য চিন্তাশীল মানুষ প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার সাহায্য নেন। যেমন, এরিস্টটলের ধর্মতত্ত্ব ও হিউমের প্রাকৃতিক ধর্ম। অন্য দিকে ঐশী ধর্মতত্ত্ব প্রত্যাদেশের উপর নির্ভরশীল যেমন বাইবেল বা কোরআন ভিত্তিক ধর্মতত্ত্ব।

ধর্মতত্ত্বের উপর্যুক্ত ব্যাখ্যার আলোকে অধিবিদ্যা ও ধর্মতত্ত্ব পৃথক। প্রকৃতপক্ষে অধিবিদ্যা দর্শনের অন্যতম মৌলিক একটি শাখা কিন্তু ধর্মতত্ত্ব দর্শনের কোনো শাখা নয়। কোনো বিশেষ ধর্ম নেয়ে অধিবিদ্যা কাজ করে না বরং বাস্তব সত্তাকে জানার এটা একটা স্বাধীন প্রচেষ্টা। অন্য দিকে ধর্মতত্ত্ব বিশেষ ধর্মকেন্দ্রিক। আবার ধর্ম দর্শনের কাজ হলো ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদি যুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করা। ধর্ম দর্শন, ধর্মতত্ত্বের অন্তর্ভূক্ত না হলেও ধর্মতত্ত্ব থেকেই তা উপাদান সংগ্রহ করে, তবে আবেগমুক্ত ও যথাসম্ভব পক্ষপাত হীন ভাবে সেই উপাদান পরীক্ষা করে। অন্যদিকে অধিবিদ্যা ধর্মীয় বিশ্বাস, আচারণ নিয়ে কাজ করে না বরং পরম সত্তা, আত্মার অমরতা, ইচ্ছার স্বাধীনতা, দেহ ও মনের সম্পর্ক প্রভৃতি নিয়ে কাজ করে। এদিক থেকে অধিবিদ্যার একটি ধর্মতাত্ত্বিক ব্যঞ্জনা বিদ্যমান। আর তাই এটা ধর্মতত্ত্বের সহযোগী। কোনো অধিবিদ নাস্তিক হতে পারেন না এবং নাস্তিকতার বিরুদ্ধেই অধিবিদ্যার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। একই ভাবে ধর্মতত্ত্ব মানুষকে নাস্তিকতার বিপক্ষে ঈশ্বরের আরাধনার গুরুত্ব দেয়। অধিবিদ্যাকে যদি সর্বোচ্চ তত্ত্ব বলা যায় তাহলে এর সর্বোচ্চ ব্যবহারিক শাস্ত্র হলো ধর্ম। আর একারণেই যারা অধিবিদ তারা কোনো একটি ধর্মের একনিষ্ঠ অনুসারী: যেমন অগাস্টিন, একুইনাস, আলফারাবী, এইচ ডি লিউইস এরাঁ একই সময় একজন ধর্মতত্ত্ববিদ ও অধিবিদ ছিলেন।

অতএব বলা যায় অধিবিদ্যা ও ধর্মতত্ত্ব পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এদের মধ্যে পার্থক্যের তুলনায় সাদৃশ্যই বেশি।

ঘ. অধিবিদ্যা ও বিজ্ঞান

এরিস্টটল অধিবিদ্যাকে সর্বোচ্চ বিজ্ঞান বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। প্রকৃত পক্ষে অধিবিদ্যার সাথে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রাকৃতিক জগতের বিষয়াবলী নিয়েই কাজ করে যেখানে অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ, যাচাইকরন ইত্যাদি বিষয় আবশ্যকীয়। অন্যদিকে আধিবিদ্যক বিষয়ের জন্য প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন সম্ভব নয়; প্রাকৃতিক মানদন্ডে পরীক্ষা নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ যাচাইকরণও সম্ভব নয়। তাই প্রাথমিকভাবে অধিবিদ্যার সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যাবে না যেমন নীতিবিদ্যা, ইতিহাস ও ধর্মতত্ত্বের সাথে পাওয়া যায়। কিন্তু গভীরভাবে তাকালে দেখা যায় অধিবিদ্যা ছাড়া আসলে বিজ্ঞানের তত্ত্ব সমূহের কোনো ব্যাখ্যাই সম্ভব নয়। আমরা এখানে প্রথমত Gred Buchdahl রচিত Science and Metaphyscis[৪৫] প্রবন্ধের আলোকে এবং পরে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় আলোচনা করব।

বুখডাল প্রথমেই পদার্থ বিজ্ঞানী H Margenau এর উদ্ধৃতি দেন। মর্গেনুর মতে, 'কার্যকারণ তত্ত্ব আসলে পদার্থবিদ্যার একটি আধিবিদ্যক উপাদান।' তবে পরবর্তীতে বলেন, কার্যকরী নীতির মধ্যে রয়েছে গঠণমূলক বৈজ্ঞানিক যেখানে আছে একরে পর এক পুন সংযুক্তি।' বার্ট্রান্ড রাসেলের মতে, 'প্রকৃতি অপরিবর্তনীয় নীতির আলোকে চলে, এখানে যা প্রযোজ্য তার চেয়ে কম বেশি হয় না।' গ্যালিলিওর মতে, প্রকৃতি অপরিবর্তনীয় নীতির আলোকে কাজ করে যা কখনোই লংঘন করে না। তাছাড়া বিশ্বজগৎ গাণিতিক নিয়মে রচিত, গণিতের ভিত্তি প্রকৃতি থেকেই তৈরি হয়েছে।" বিজ্ঞানের মৌলিক নীতি 'কার্যকারণ নীতি' সম্পর্কে তাত্ত্বিক পদার্থবিদগণ এ ধরণের মন্তব্য করেন, যেখানে স্পষ্টতই প্রকাশ পায় কার্যকারণ নীতির যথার্থ ব্যাখ্যা সম্ভব নয়।

আবার ডাল্টনের পরমাণুবাদ আবিষ্কারের পর প্রশ্ন উঠে পরমাণুর অস্তিত্বের ব্যাপারে আমাদের কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে কিনা। প্রকৃত পক্ষে বিশ্ব জগৎ সৃষ্টির মূল উপাদান পরমাণু। কিন্তু অন্যান্য অভিজ্ঞতামূলক জিনিসের মত পরমাণুকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। বুখডাল বলেন, ১৮৬০ ও ৭০ এর দশকে ম্যাক্সওয়েল, বোল্ট্জ্ম্যান প্রমুখের হাতে Kinetic Theory of gases এর উদ্ভব হলে রসায়নবিদগণ পরমানুতত্ত্বের জোরালো সমর্থন করেন। কিন্তু যেহেতু আমরা স্বাভাবিক ভাবে পরমাণুকে ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করিনা, তাই বিজ্ঞানের দার্শনিকদের প্রতিক্রিয়া ছিল পরমাণুর কেবল পরোক্ষ প্রমাণেই সম্ভব।

১৯০৩ থেকে ১৯১২ এর সময় গুলোতে পরমাণুতত্ত্বের আরো অগ্রগতি ঘটে। তখন Ostwald তাঁর All-gemeine Chemie (1909) গ্রন্থে বলেন, আমরা পদার্থের পারমাণবিক বিশ্লেষণের পরীক্ষামূলক প্রমাণ পেয়েছি, তাই এটাকে আর পরোক্ষ প্রমাণ বলা যায় না। কিন্তু ১৯১৫ এর শেষের দিকে অর্নিস্ট ম্যাক বলেন, পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকার করা এক ধরনের অন্ধবিশ্বাস (dogma) এর মত। তাঁর আরো বক্তব্য হলো, প্রকৃতিতে 'আলোর প্রতিসরণ' বিধি বলতে কিছু নেই বরং প্রতিসরনের বিভিন্ন ঘটনা আছে। ম্যাক এর কথার মিল আছে ১৮৪০ এর দশকের ক্যাম্ব্রিজের খনিজ বিজ্ঞানী উইলিয়াম হোয়েলের মন্তব্যে, তিনিও পরমাণুকে একটি দার্শনিক বিষয় বলে মন্তব্য করে। আমেরিকার পদার্থ বিজ্ঞানী ব্রিজম্যানও মনে করেন, পরমাণুর অস্তিত্ব সম্পর্ণ অনুমানমূলক, তবে এর বাহ্যিক বাস্তবতাকে আমাদের হাত পায়ের মতই আমরা উপলব্ধি করছি। বুখডাল তখন মন্তব্য করলেন এটাই অধিবিদ্যক কথা আর এখনেই বিজ্ঞানের অধিবিদ্যার প্রকাশ।

আপেক্ষিক তত্ত্বের ব্যাখ্যায় পদার্থবিদগণ কখনো কখনো বলতেন, পরমগতির (absolute motion) কোনো অর্থ নেই। পরম গতি হলো পদার্থিক নিয়মের গতি, যার সাথে অন্য কোনো গতির সম্পর্ক নেই, কেবল শূন্য দেশের সম্পর্ক ছাড়া। প্রাকৃতিক বিধান নির্বিচারে সবসময় একই বিধান মেনে চলে এবং সমভাবে তা বিদ্যমান। এর অর্থ দাঁড়ায় গতির সত্য বা মিথ্যা আমরা যাচাই করতে পারিনা, তাই গতির ধারণা অর্থহীন এবং সেজন্যই পরম গতির ধারণাও অর্থহীন। বুখডাল বলেন, এতে আমরা বলতে পারি যেহেতু বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলোর অস্তিত্বের সত্য মিথ্যা যাচাই করা যায়না তাই আপেক্ষিক তত্তের মত বিধানগুলোও অর্থহীন। আধিবিদ্যক বচনকে যাচাই করা যায় না তাই যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীগণ অধিবিদ্যাকে অর্থহীন বলে দাবি করেন। একই কারণে তাহলে বৈজ্ঞানিক বিধি গুলোকেও আমাদের অর্থহীন বলতে হবে।

কোয়ান্টাম তত্ত্বের জনক Max planck তাঁর The Universe in the Light of Modern physics গ্রন্থে বলেন, প্রাকৃতিক বিধির অস্তিত্বকে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য নই কিংবা ভবিষ্যতে তা চলমান থাকবে তারও কোনো প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। Max Bornও এ প্রসঙ্গে একই কথা বলেন যে, এটি একটি বিশ্বাসের বিষয় (question of faith) এবং একটি আধিবিদ্যাক নীতি। বুখডাল এটাকে বললেন, আধিবিদ্যক সংশয়। কিন্তু এই সংশয় কেন? ম্যাকও বলেছিলেন, প্রাকৃতিক বিধি বলতে কিছু নেই। তাহলে প্রকৃতিতে যে নিয়ম নীতি বিদ্যমান তাকে অস্বীকার করতে হবে। এটা একধরণের স্ববিরোধী বক্তব্য। এর সমাধান অধিবিদ্যাতেই পাওয়া যাবে।

বুখডাল ডেভিড হিউমের একটি মন্তব্য তুলে ধরে যেখানে রয়েছে, 'নিউটনকে প্রকৃতির রহস্যের কিছু জিনিস উদঘাটন করতে দেখা গেলেও তা আসলে সম্ভব হয়নি, সেটা রয়ে গেছে এবং সবসময় থাকবে।' এখানে হিউম মূলত বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার ব্যাপার সংশয় প্রকাশ করলেন। মৌলিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলো আমাদেরকে এমন একটি গভীর উপলব্ধি দেয় যে, এমন কিছু সংযোজক আছে যেগুলোর কারণে প্রকৃতির রাজ্য দাড়িয়ে আছে। যেমন, গতিবিদ্যার 'বল' এর ধারণা। এগুলো এক ধরণের তাত্ত্বিক সংযোজক। প্রকৃতপক্ষে এগুলো পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ নির্ভর নয়। যদি বলা হয় কোন বস্তু অনিবার্যভাবে পরস্পর সংযুক্ত থাকে তাহলে মূলত একটি মৌলিক বিষয়কে আমরা অনুভব করি। নিউটনের মধ্যাকর্ষণতত্ত্ব এর একটি উদাহরণ। তিনি গ্রহ, নক্ষত্র, সৌর জগৎ,মহাশূন্য ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে দেখেন একটি সর্বজনীন আকর্ষণীয় 'বল' কার্যকর। কিন্তু বার্কলি এর বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেন। তাঁর মতে এটা কোনো পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা নয়। যান্ত্রিক কোনো কিছুই একটি কারণ হতে পারে না অর্থাৎ একটি 'বল' পরীক্ষণ কিংবা গাণিতিক যুক্তি প্রক্রিয়ায় অবিষ্কৃত হতে পারে না। বস্তুতে যে গতি বিদ্যমান তা নিস্ক্রীয় ও আরোপিত।আমরা একজন নিরাকার কর্তার উপস্থিতি ও কার্যাকে বিবেচনায় না নিয়ে, এমনকি একটি পদক্ষেপও নিতে পারি না, যিনি সব জিনিসকে তার পছন্দণীয় এমনি ধরনের নীতির আলোকে সংযোগ সাধন, গতি সঞ্চার বা স্তব্ধ করে দেন। বুখডাল মনে করেন বার্কলির... এই মন্তব্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অসীম সংশয়ের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে। এখানে আরো লক্ষণীয় বিষয় হলো, আধিবিদ্যক তত্ত্বগুলো যেসব সমস্যার সাথে যুক্ত যথার্থ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও সে সব সমস্যার সাথে জড়িত। নিউটনের ভর, বল পরম দেশ- কাল এর সংজ্ঞায় অভিজ্ঞতামূলক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়নি, আর একারণেই আর্নস্ট ম্যাক এগুলোতে সংশয় প্রকাশ করেন। আর বার্কলিও একই কারণে এগুলোকে চূড়ান্ত বলেননি। বুখডাল বলেন, আধিবিদ্যক স্বতসিদ্ধ ও অভিজ্ঞতামূলক নীতির মাঝে যৌক্তিক বন্ধন খুব ঘনিষ্ট নয়, তথাপি পদার্থবিদ্যার তত্ত্বের ক্ষেত্রে আধিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গিই পোষণ করা হয়। লাইবনিজ বলেছিলেন, বাস্তব সত্তার (reality) গুরুত্বপূর্ণ একটা বৈশিষ্ট্য হলো, গাণিতিক বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মত প্রাকৃতিক জগতেও বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম নীতির প্রতিফলন বিদ্যমান। গতিবিদ্যা, আলোক বিজ্ঞান, তড়িৎ গতি সংক্রান্ত বিজ্ঞানের বিকাশেও লাইবনিজের এই বক্তব্য মিলে যায়। ভিটগনস্টাইনও একথাটি তাঁর Tractatus এ স্বীকার করেন। "মানুষ যথার্থভাবে জানার আগেই অবশ্য একটি নূন্যতম কার্যবিধির ধারণার অনুসরণ করে।" অতএব বলা যায় মানুষ অভিজ্ঞতাপূর্ব জ্ঞানের অধিকারী কমপক্ষে এক ধরনের বিধির সম্ভাব্যতার জ্ঞান। বুখডাল বলেন, আমরা জানি, এই বিধি গুলো মৌলিক, কিন্তু এর জ্ঞান কেবল অধিবিদ্যার মাধ্যমেই পেতে পারি।

ড. গালিব আহসান খান বলেন, 'বিজ্ঞান যে ব্যাপকভাবে জড় ভিত্তিক তা সাধারণভাবে স্বীকৃত সত্য। বিজ্ঞান এমনকি তথাকথিত মনকে জড়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে মস্তিষ্ক প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করে। বিজ্ঞানের এ জড়বাদী দিকটি নিয়ে আমার কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু বিজ্ঞানের ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক আর্থার এডিংটন এবং জেমস জিনস তাঁদের ভাববাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেন। কৃষ্ণ গহবর, কৃষ্ণকাঠামো (black body) বা আলোর বিন্দু উৎস (Point source of light) বলে প্রকৃতই কি কিছু আছে? এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গির মুখোমুখী হব।'[৪৬] ম্যাক্স প্লাংক নোবেল বিজয়ী পদার্থ বিজ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞানের আধিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর ভাষায়, æAll matter originates and exists only by virtue of a force which brings the particle of an atom to vibration and holds this most minute solar system of the atom together, we must assume behind this force the existence of a conscious and intellegent mind. This mind is the matrix of all matter."[47] তিনি বিজ্ঞানীকে একজন কাল্পনিক ও বিশ্বাসী মানুষ হিসেবে বিবেচনা করেন। বিশ্বাস (faith) দ্বারা তিনি অর্থ করেছেন, একটি কার্যকর প্রকল্পকে মেনে নেওয়া, যেমন, কার্যকরণ নীতি। এটা সত্য বা মিথ্যা নয় বরং একটা বিশ্বাস। তাঁর মতে, ধর্ম ও বিজ্ঞান ঈশ্বরে বিশ্বাসের আহবান জানায়। ঈশ্বর বিশ্বাসীদের নিকট ঈশ্বর সব কিছুর শুরু আর পদার্থবিদদের নিকট ঈশ্বর সব কিছুর শেষ বিবেচনা, ধর্মে তিনি ভিত্তি, বিজ্ঞানে তিনি বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিটি ক্ষেত্রে রাজপ্রসাদ।[৪৮]

আর্থার এডিংটন (১৮৮২-১৯৪৪) The Nature of the Physical World গ্রন্থে বিশ্বজগতের মূল উপাদানকে মন (mind-stuff) বলে আখ্যায়িত করেন। তাঁর মতে, কেউ অস্বীকার করতে পারবেনা মন আমাদের অভিজ্ঞতায় প্রথম এবং সবচে প্রত্যক্ষ জিনিস।[৪৯] জেমস জিনস তাঁর The Mysterious Universe গ্রন্থে বিশ্বজগতের রহস্যের পেছনে একজন কর্তার কথা অকপটে স্বীকার করেন। এজন্য ভিটগেনস্টাইন তাঁকে বিভ্রান্তিকর ও তুচ্ছজ্ঞান করেন।

সুতরাং অধিবিদ্যার সাথে বিজ্ঞানের যে একটি নিবিড় ও ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। গালিব আহসান খানের মন্তব্যের মাধ্যমে এ বিষয়ের ইতি টানছি। তিনি বলেন, 'জগতের সৃষ্টি রহস্য ধর্মেও আলোচিত হয়, দর্শনেও আলোচিত হয় এবং বিজ্ঞানেও আলোচিত হয়। এমন অবস্থায় আলোচ্য বিষয় এক হওয়া সত্ত্বেও জ্ঞানের এসব ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য এবং আলোচনার প্রকৃতি নির্ধারিত হয় দ্বিতীয় একটি দিক দিয়ে যা হলো আলোচনার পদ্ধতি। যেমন, সৃষ্টির রহস্য নিয়ে ধর্মের আলোচনার পদ্ধতি হলো বিশ্বাসকে ভিত্তি করে যুক্তিকে

অনুসরণ করা, এক্ষেত্রে দর্শনের পদ্ধতি হলো যুক্তিকে ভিত্তিকরে আদিকারণ অনুসন্ধান করা; এবং বিজ্ঞানের পদ্ধতি হলো পর্যবেক্ষন ও পরীক্ষনের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষনের মাধ্যমে যুক্তি গঠন করা।[৫০] দেখা যাচ্ছে আলোচনার পদ্ধতির কারণেই বিজ্ঞান ও অধিবিদ্যার তথা দর্শনের পার্থক্য সূচিত হয়।

অধিবিদ্যার পক্ষে যুক্তি

অধিবিদ্যাকে ঈশ্বর সংক্রান্ত বিদ্যা বলা যায়। এজন্যই ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষের যুক্তিগুলো প্রকারান্তরে আধিবিদ্যক যুক্তি । বি এ ও উইলিয়ামস তাঁর Metaphysical Arguments[51]রচনায় প্রথমত দুই ধরনের আধিবিদ্যক যুক্তি উপস্থাপন করেন। একটি আরোহ আরেকটি অবরোহ ভিত্তিক । আরোহ পদ্ধতি নির্ভর যুক্তিটি হলো design argument যা বিখ্যাত ধর্মতত্ত্ববিদ পেলের 'ঘড়ির যুক্তি' নামে পরিচিত। যুক্তিটি হচ্ছে এ ধরণের যে, হঠাৎ আমাদের কেউ একটি ঘড়ি বা একটি যন্ত্র পেল, তখন সে চিন্তা করল কেউ না কেউ এটা তৈরি করেছে। অনুরূপভাবে আমাদের চারপাশের প্রাকৃতিক জগতের জটিল ক্রিয়া কর্ম,শৃঙ্খলা, বৈচিত্র্য , সৌন্দর্য আমরা দেখতে পাই। আমাদের তখন এমন একটি অনুমান করা উচিত যে, এগুলোর পেছনে একজন নির্মাতা ও সুনিপুন পরিচালক আছেন, যিনি অত্যন্ত নিবিড়ভাবে এগুলো তৈরি করে যথাযথ ভাবে এগুলোকে তত্ত্বাবধান করছেন। বিরুদ্ধবাদীগণ অবশ্যই তখন বলবেন, এই বিশ্বচরাচরে অনেক সমস্যা, মানুষের দুঃখ কষ্ট, অস্বাভাবিক বস্তু, অসাময়িক জন্ম ইত্যাদি অনন্ত অসীম ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ নেই প্রমাণ করে । কিন্তু বার্কলি এর উৎকৃষ্ট জবাব দেন, কি করে ঘড়ির চলায় কেনো ত্রুটি দেখা দিলে. ভেতরের কল-কবজায় তার অনুরূপ গোল দেখা যায় এবং কোনো নিপুন হাতে তাকে সরিয়ে নিলে আবার সব ঠিক হয়ে যায় ?[৫২]তাছাড়া প্রকৃতির ঘটনা ব্যাখ্যায় ও জীবনের প্রয়োজনে ও শোভা বর্ধনে লোকে তাদের কাজে লাগায়।[৫৩] এ ভাবে প্রকৃতির ভারসাম্য কিছুটা নষ্ট হওয়ার কারণে প্রকৃতিতে দুর্যোগ দেখা দিতে পারে। তা ছাড়া বিশ্বজগত চলমান ও গতিশীল নীতির আলোকে চলছে। তাই ক্ষুধা-দারিদ্র, দুঃখ, সমস্যার মাধ্যমে, নদী শুকিয়ে, নতুন নদীর উদ্ভব ঘটিয়ে, ভূমিকম্পে , পাহাড় ধ্বংস করে একটি সামগ্রিক পূর্ণতার দিকে এবং ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে অণুপরমাণু থেকে মহাজগৎ পর্যন্ত নিরন্তন ক্রিয়াপরতা চলছে। বার্কলি উপসংহার টানেন এভাবে, 'অতএব খোদার অস্তিত্ব সম্পর্কে যে বিশ্বাস ও সাক্ষ্য বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাছে আশা করা যেতে পারে, অধিকাংশলোক যারা সব সময় বিষয় ও সুখের ওপর ঝুঁকে আছে, আর নিজেদের মনের চোখ দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে

দেখতে বা মনের চোখ খুলতে যারা অভ্যস্ত নয়, তাদের মধ্যে যদি তা না থাকে, তাহলে তাতে বিস্ময়ের কিছু আছে কি?'[৫৪]

অত্যন্ত শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও যুক্তিটি সাদৃশ্যের ভিত্তিতে তৈরি, আর সাদৃশ্যানুমান আরোহের অন্তর্গত। আরোমূলক যুক্তির ফলাফল শক্তিশালী নয়। অর্থাৎ এ ধরনের যুক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী নয়, সুতরাং ঈশ্বরে বিশ্বাসী এই যুক্তির চেয়ে ভিন্ন কোনো যুক্তি খুঁজবেন। উইলিয়ামস তাই অরোহ যুক্তির কথা বলেন যা নিশ্চিত ও শক্তিশালী সিদ্ধান্ত দান করে। ১৭ শতকের বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগণ এই ধরণের আধিবিদ্যা যুক্তির সূচনা করেন। একটি সতঃসিদ্ধ থেকে যৌক্তিক প্রক্রিয়ায় অনিবার্য ভাবে আরোহ সিদ্ধান্ত নিঃসৃত হয়। যেমন, ডেকার্টের যুক্তি, আমি সন্দেহ করছি সুতরাং আমি অস্তিত্বশীল। আর আমার অস্তিত্বের জন্য একমাত্র ঈশ্বরই দায়ী। এখানেও প্রশ্ন থাকে স্বতঃসিদ্ধ গুলো কীভাবে তৈরি হবে। যদি এখানে কিছুটা আরোহের আশ্রয় নেওয়া হয় তাহলে সিদ্ধান্তটা সম্পূর্ণ যথার্থ হবেনা। সুতরাং তাঁর মতে ঈশ্বরের অস্তিত্বের জন্য অবরোহ প্রক্রিয়াও খুব ফলপ্রসু নয়।

এ জন্যই উইলিয়ামস প্রত্যক্ষণের ভিত্তিতে আরেকটি যুক্তি উপস্থাপন করেন। যুক্তিটি হচ্ছে, কেউ গোধুলী লগ্নে একটি পুরাতন বুট পড়ে থাকতে দেখে ভাবলেন, এটা একটা বিড়াল হবে। এখানে প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে তিনি একটি ভুল সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রকৃত পক্ষে তার ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণ বার বার চেষ্টা সত্ত্বেও নিশ্চিত বিষয়ের সন্ধান দিতে পারেনি। একটু আলোর স্বল্পতা তাকে সম্পূর্ণ মিথ্যা একটা সিদ্ধান্ত নিতে অনুপ্রাণিত করল, তিনি প্রতারিত হলেন। এভাবে বাহ্যিক জগতের যে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি আমরা করছি তা কি সম্পূর্ণ সঠিক? আমরা যা ভাবি প্রত্যক্ষণ আমাদেরকে তা নির্দেশ করেনা। এজন্যই প্লেটো বলেছিলেন দৃশ্যমান জগৎ নয় বরং ধারণার জগতই প্রকৃত পক্ষেবাস্তব ও অস্তিত্বশীল। অধিবিদ এর মাধ্যমে দাবি করেন আমাদের কাছে কোনো জ্ঞানই নিশ্চিত নয়। তবে একটি নিশ্চিত জিনিসের অস্তিত্বের কারণেই সব অস্তিত্বশীল হয়েছে, যাকে আমরা দেখিনা এবং যদি দেখতে চাই তবে ভুল দেখব। আর তাকেই আমরা ঈশ্বর বলতে পারি। আর যুক্তিটি অনিবার্যভাবে অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ।

উইলিয়ামস আধিবিদ্যক যুক্তিকে বৃক্ষের সাথে তুলনা করেন। অধিবিদ সেগুলোকে কোথায় রোপন করবেন তা নির্বাচন করতে পারেন এবং কীভাবে যত্ন নিবেন সেটাও তার ব্যাপার। কিন্তু তিনি এমন কোন স্থান নির্বাচন করবেননা যেখানে সেগুলো আসলে বড় হবে কিনা তিনি জানেন না, ধারণাপর ভূমিতে কিছু অংশ অন্য অংশের চেয়ে উর্বর হতে পারে। যদি প্রত্যক্ষবাদী কুড়াল দিয়ে সেই বৃক্ষ কর্তন শুরু হয়, তাহলে সেগুলো আবার উৎপন্ন হবে ভিটগেনস্টাইনের কোদাল দিয়ে মূলোচ্ছেদ করতে চাইলে সেই প্রচেষ্টা চলমান রাখতে হবে- একটি উচ্ছেদ করলে আরেকটি গজাবে যদি তা মজবুত বৃক্ষ হয়। এই সময় হয়ত খনন কাজই হবে উপযুক্ত দার্শনিক কাজ।

দার্শনিক খননকারী হয়ত তখন জানতে ইচ্ছা করবেন, আধিবিদ্যক বৃক্ষ কীভাবে উৎপন্ন হয়? উইলিয়ামস বলেন, এই প্রশ্নের জবাবই হবে আধিবিদ্যক যুক্তি।

অধিবিদ্যার সমালোচনা

খ্রিঃ পূঃ ৬০০ অব্দ থেকে মাইলেশিয়া দার্শনিক থেলিসের মাধ্যমে দর্শনের সূচনা। থেলিস নিজে ছিলেন জড়বাদী। তাঁকে অনুসরণ করে পরবর্তী ডেমোক্রিটাস, এনাক্সিমিনিসসহ অনেকে এই মত অবলম্বন করেন। অন্যদিকে পারমেনাইডিস, পিথাগোরাস সহ আরেকটি ধারা ভাববাদী মত অবলম্বন করেন। সুতরাং গোড়াতেই দর্শনের দুটি বিভাজন আমরা দেখতে পাই। জড়বাদী ধারার অন্যতম ব্যক্তি সংশয়বাদী পিরো (Pyrrho) ছিলেন আধুনিক সংশয়বাদের আদি পুরুষ। তবে প্রাচীনকালে এই দুই ধারার মধ্যে বিরোধ এতটা কঠোর হয়নি যতটা আধুনিক যুগে দেখা যায়।

দর্শনের ইতিহাসে ভাববাদ ও অধিবিদ্যা বিরোধী ধারার সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি ডেভিড হিউম (১৭১১-৭৪)। তাঁর Treaties ও Dialogues গ্রন্থে অধিবিদ্যার বিপক্ষে মত দেন। বিষেশত Dialogues Concerning Natural Religion গ্রন্থে তিনি ঈশ্বর সম্পর্কিত প্রচলিত শক্তিশালী যুক্তি Design argument,Teleological argument-এর চুলচেরা বিশ্লেষণ করে এগুলো খন্ডন করেন। তিনি আত্মার অমরতার বিপক্ষে মত দেন। অধিবিদ্যার ২ হাজার বছরের ঐতিহ্যে তিনি কুঠারাঘাত করেন।

হিউম পরবর্তী ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪) ছিলেন অধিবিদ্যার বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদানকারী ২য় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি প্রমাণ করেন বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার মাধ্যমে অধিবিদ্যা সম্ভব নয়। তবে নৈতিকতার স্বার্থে ঈশ্বরের অস্তিত্ব, ইচ্ছার স্বাধীনতা ও আত্মার অমরতায় বিশ্বাস করার বাধ্যবাধকতা তিনি স্বীকার করেন। কান্ট পরবর্তী অধিবিদ্যা বিরোধী ধারাগুলোতে কান্টের প্রভাব বিদ্যমান।

বিংশ শতকের গোড়ার দিকে বিজ্ঞানের প্রভাবে প্রভাবিত একদল তরুণ দার্শনিক অধিবিদ্যার বর্জনের ঘোষণা দেন। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ (Logical Positivism) নামের এই মতের মূল কথা, যেহেতু অধিবিদ্যার ভাষাকে অভিজ্ঞতার নিরিখে যাচাই করা যায় না তাই এই ভাষার কোনো অর্থ নেই। অধিবিদ্যার বচন দেখতে বাস্তব মনে হলেও এগুলো আদৌ কোন বচন নয়। সুতরাং দর্শন থেকে অধিবিদ্যাকে বাদ দিতে হবে। এই মতের অনুসারীদের মধ্যে আছেন আর্নস্ট ম্যাক (১৮৩৮-১৯১৬), মরিজ শ্লিক (১৮৮২-১৯৩৬), রুডলফ কার্নাপ (১৮৯১-১৯৭০), এ জে এয়ার(১৯১০-১৯৮৯) প্রমুখ। এই দলের প্রেরণা ছিল ভিটগেনস্টাইনের বিখ্যাত পুস্তক Tractatus logico philosophicas ভিটগেনস্টাইন এই দলের প্রত্যক্ষ সদস্য না হলেও তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল এখানে। ভাষাতাত্ত্বিক দর্শনের মাধ্যমে তিনি অধিবিদ্যার সমালোচনা করেন। রাইল, অস্টিন, প্রমুখ এই চিন্তাধারা গড়ে তোলেন।

অধিবিদ্যার সমালোচনা যাই থাকুক অধিবিদ্যা তার অনন্য আকর্ষণ নিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত। অভিজ্ঞতাবাদের প্রচলিত সংস্করণ ছিল যৌক্তিক দৃষ্টবাদ ও ভাষাতাত্ত্বিক দর্শন। এই মতের অনুসারীগণ জোর পূর্বক দর্শন থেকে অধিবিদ্যাকে বর্জন করতে চেয়েছিলেন। প্রত্যক্ষবাদ সূচনা থেকেই প্রবল বিরোধিতা ও সমালোচনার মুখে পড়ে। এই সমালোচনায় এক সময় তাঁরা আত্মসমালোচনা করতে বাধ্য হন। ভিটগেনস্টাইনও এক সময় তাঁর মতের কঠোরতা হ্রাস করে অনেকটা নমনীয় ভূমিকা রাখেন।

তথ্য নির্দেশ

১. D.Drennen, ed, *A Modern Introduction to Metaphysical Reading and Contemporary Sources,*London,George Allen & Unwin Ltd, ,1950, P:3

২. http:/ WWW.Phorigon,An Introduction to Metaphysics.

৩. *এরিস্টটলের অধিবিদ্যা*,(অনুবাদ- আব্দুল জলিল মিয়া),ঢাকাবাংলা একাডেমী, ১৯৮৮, পৃ:৮১।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ: ৮৫।

৫. D.Drennen, ed, *A Modern Introduction to Metaphysical Reading and Contemporary Sources*, George Allen & Unwin Ltd, London,1950, P:10

৬. D.F. Pearn, ed. *The Nature of Metaphysics*, St.Martin's Press, New York, 1965, P:2

৭. WWW.routledge Internet Encyclopedia of Philosophy, Metaphysics.

৮. বার্ট্রান্ড রাসেল, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস [প্রাচীন ও ক্যাথলিক দর্শন: নির্বাচিত অংশ]*,ঢাকা, (অনুবাদ- প্রদীপ রায়), নিউ এজ পাবলিকেশন, পৃ: ১২৩।

৯. প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৫।

১০. আমিনুল ইসলাম, *আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮০, পৃ:

১১. AEA Tailor, *Elements of Metaphysics*.

১২. *এরিস্টটলের অধিবিদ্যা*, পৃ: ২৩।

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ: ২৮।

১৪. বার্ট্রান্ড রাসেল, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস [প্রাচীন ও ক্যাথলিক দর্শন: নির্বাচিত অংশ]*,ঢাকা, (অনুবাদ- প্রদীপ রায়), নিউ এজ পাবলিকেশন, পৃ: ৪০

১৫. উইল ডুরান্ট, *দর্শনের ইতিহাস*, পৃ: ২৫।

১৬. *এরিস্টটলের অধিবিদ্যা*, পৃ- ১৯ (ভূমিকা)।

১৭. বার্ট্রান্ড রাসেল, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস [প্রাচীন ও ক্যাথলিক দর্শন: নির্বাচিত অংশ]*, ঢাকা, (অনুবাদ- প্রদীপ রায়), নিউ এজ পাবলিকেশন, পৃ: ২০৫।

১৮. পল হবিগন:http:/ WWW.Phorigon,An Introduction to Metaphysics.

১৯. আমিনুল ইসলাম, *আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন*, পৃ- ২৯৮।

২০. WWW.routledge Internet Encyclopedia of Philosophy.

২১. কমরুদ্দিন হোসাইন, *কান্টের দর্শন*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৬, পৃ- ১৫।

২২. জর্জ বার্কলি, *মানুষের জ্ঞান সূত্র*, (আব্দুল মতীন অনূদিত), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪, পৃ- দুই (অনুবাদকের ভূমিকা)।

২৩. আমিনুল ইসলাম, *আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন*, পৃ- ৪৩০।

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ- ৪৪০।

২৫. মুহম্মদ আবদুল বারী, *নীতিবিদ্যা*, ঢাকা,দিদার পাবলিশিং হাউস,১৯৮২, পৃ-৯

২৬. Harry, J. Gonler, ed; *Ethics, Contemporary Readings*, London, Routledge, 2004.

২৭. বার্ট্রান্ড রাসেল, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস [প্রাচীন ও ক্যাথলিক দর্শন: নির্বাচিত অংশ]*, (অনুবাদ- প্রদীপ রায়), নিউ এজ পাবলিকেশন, ঢাকা, পৃ- ১৭৮।

২৮. *Ethics, Contemporary Readings*, P: 30-32.

২৯. Ibid, P- 34

৩০. হাসনা বেগম, *ম্যাওরের নীতিতত্ত্ব*, (অনুবাদ: কালী প্রসন্ন দাস), ঢাকা, পৃ- ১৪-২০

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ- ৪২

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ- ৪২-৪৩

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ- ৪৪

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৪

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৫

৩৬. আমিনুল ইসলাম, *সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শন*, ঢাকা, পৃ- ১৭১

৩৭. D.F. Pears, ed, *The Nature of Metaphysics*, London, P- 83-98.

৩৮. পিটার সিঙ্গার, *ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা*, ঢাকা, পৃ- ৩

৩৯. ড. আনিসুজ্জামান, *"মানব সেবার দার্শনিক ভিত্তি"*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, পৃ- ১৩ (২০ নং পাদটীকা)

৪০. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলামের ইতিহাস দর্শন*, ঢাকা, পৃ- ২৪

৪১. D.F. Pears, ed, *The Nature of Metaphysics*, London, P-

৪২. *এরিস্টটলের অধিবিদ্যা*, পৃ- ৩১৫

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ- ১২৩

৪৪. Abdul Jalil Mia, *A Contemporary Philosophy of Religion*, Dhaka, P- 1-6

৪৫. D.F. Pears, ed, *The Nature of Metaphysics*, London, P- 61-82

৪৬. গালিব আহসান খান, *বিজ্ঞানের দর্শন*, ঢাকা, পৃ- ২৩-২৪

৪৭. http:// WWW. Wikipedia/ Maxplanck.

৪৮. Ibid

৪৯. Eddington, A.E: *The Nature of The Phynical World*, P-226/ WWW. Wikipedia/ Eddinton.

৫০. গালিব আহসান খান, *বিজ্ঞানের দর্শন*, ঢাকা, পৃ- ২৩-২৪

৫১. Pears, D.F. *The Nature of Metaphysics*, London, P- 40-60.

৫২. জর্জ বার্কলি, *মানুষের জ্ঞান সূত্র*, পৃ: ৫১

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

এরিস্টটল, একুইনাস, ব্রাডলি ও এইচ ডি লিউইস এর অবদান বিবেচনা

এই অধ্যায়ে আমরা চারজন বিখ্যাত অধিবিদের অবদান বিবেচনা করব। প্রাচীন যুগের এরিস্টটল, মধ্যযুগের একুইনাস, আধুনিক যুগের ব্রাডলি এবং সম্প্রতিক কালের এইচ. ডি. লিউইস। এরিস্টটলের, মাধ্যমে যে অধিবিদ্যার কাঠামো তৈরি হয়েছিল তারই উপর প্রাসাদ নির্মাণ করেছেন পরবর্তী যুগের অধিবিদগণ।

১. এরিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রি.পূ.)

জ্ঞান বিজ্ঞানের ইতিহাসে এরিস্টটল নামটি গভীর ভাবে সংযুক্ত । তাঁর আবির্ভাবের অনেক আগে থেকেই জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনা চলে এসেছিল ঠিক কিন্তু সম্পূর্ণ অভিনব ও পন্ডিতসুলভ একজন অধ্যাপকের মত সব বিষয় উপস্থাপনের প্রথম কৃতিত্ব তাঁরই। সমালোচক গুণগ্রাহী সবাই এতে একমত। আমরা এখানে তাঁর দার্শনিক মত বিশেষত আধিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই আলোচনা করব।

এরিস্টটল খ্রি.পূ. ৩৮৪ অব্দে উত্তর পূর্ব গ্রিসের ম্যাসিডোনিয়ার ছোট শহরে স্টেগিরায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা নিকোমাকাস ম্যাসিডোনিয়ার রাজা ফ্রিলিফের (আলেকজান্ডারের পিতা) পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন। ১৭ বছর বয়সে প্লেটোর একাডেমিতে ভর্তি হওয়ার জন্য তিনি এথেন্সে চলে যান এবং প্লেটোর মৃত্যু পর্যন্ত (৩৪৭ খ্রি. পূ.) প্রায় ২০ বছর সেখানে জ্ঞানার্জন করেন। এরপর বর্তমান তুরস্কের উত্তর পশ্চিমে এশিয়া মাইনরের এসোসে গমন করেন। সেখানে দার্শনিক কার্যক্রমের পাশাপাশি তিনি Marine biology-এর উপর গবেষণা করেন। এসোসের শাসক হারমিয়াসের আতিথ্যে সেখানে এরিস্টটল প্রায় ৩ বছর অতিবাহিত করেন। হারমিয়াসের মৃত্যু হলে তিনি নিকটবর্তী লেসবস (Lesbos) গমন করে আরো ২ বছর কাটান। এখানেই হারমিয়াসের ভ্রাতৃষ্পুত্রী পিথিয়াসকে বিবাহ করেন। ইতোমধ্যে ৩৪৩ অব্দে ফিলিপের অনুরোধে তিনি আলেকজান্ডারের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। আলেকজান্ডার ১৩ থেকে ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর কাছে বিদ্যার্জন করেন। ৩৩৫ খ্রি. পূ. অব্দে তিনি এথেন্সে আবার ফিরে আসেন এবং বিখ্যাত গবেষণাগার লাইসিয়াম প্রতিষ্ঠা করেন। দেবতা অ্যাপোলো লাইসিয়াম এর নাম অনুসরণ করে স্থাপিত তাঁর এই প্রতিষ্ঠানে জীববিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিদ্যা, গণিত, জ্যোতিবিদ্যা,

মনস্তত্ব, নীতিবিদ্যা, যুক্তিবিদ্যাসহ জ্ঞানের প্রায় প্রতিটি শাখায় গবেষণাকর্ম চলে। আলেকজান্ডারের মৃত্যু (৩২ খ্রি.পূ.) পর্যন্ত এরিস্টটল স্বাচ্ছন্দে এথেন্সে কাটিয়ে দেন। তাঁর মৃত্যুর পর এথেনিয়দের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিলে তিনি জীবনের আশংকায় এথেন্স ত্যাগ করে চলেসিস দ্বীপে দেশান্তরিত হন এবং পরবর্তী বছর (৩২২ খ্রি. পূ.) তিনি স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেন।

তিনি প্রায় চার শত গ্রন্থ রচনা করেন। অধিকাংশ গ্রন্থ কালের গর্ভে হারিয়ে যায়। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হলো Categories; Posteriord; Analytics; Priord; Analytics, Topics, Sophistical Refutations; Physics; Metaphysics; De Anima; History of Animals; Meteorology; On the Soul; Nicomachean Ethics; Politics; Rhetoric; Poetics প্রভৃতি।[১]

এরিস্টটলের জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে যে শৃঙ্খলা আমরা পাই তা তাঁর যুক্তিবিদ্যার কারণে। তিনি যুক্তিবিদ্যাকে সব বিজ্ঞানের পদ্ধতি বলে আখ্যায়িত করেন। যুক্তিবিদ্যার নীতি অনুসরণ করেই এসব গ্রন্থ রচনা করেন। এমনকি অধিবিদ্যার আলোচনায়ও যুক্তিবিদ্যার সূত্র প্রয়োগ করেন। এরিস্টটলের অধিবিদ্যার আলোচনা কী নিয়ে শুরু করা যায় তা বলা কঠিন একথা বার্ট্রান্ড রাসেলও স্বীকার করেন। আরবীয় দার্শনিক ইবনে সিনা বলেন, আমি ১৪ বার এরিস্টটলের অধিবিদ্যা অধ্যয়ন করেছি। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারিনি।[২] এরিস্টটলের অধিবিদ্যায় সহজ সরল ভঙ্গিতে অনেক বিষয় উপস্থতি হলেও এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনেক।

এরিস্টটলের অধিবিদ্যার উপর লিখিত পুস্তক Metaphysics গ্রন্থটির নামকরণ তিনি নিজে না করলেও বিষয়বস্তুর কারণে পরবর্তীতে এই নামেই গ্রন্থটি পরিচিত হয়। গ্রন্থটি ১৪টি খন্ডে বিভক্ত। গ্রন্থটি অধিবিদ্যার উপর হলেও প্রথম তিনি জ্ঞান বিদ্যা নিয়ে আলোচনা করেন। এবং এই জ্ঞান বিদ্যাই তাঁর পরবর্তী অধ্যায় ও খন্ডসমূহের ভিত্তি। তাঁর মতে প্রতিটি মানুষ স্বাভাবিক কারণেই জ্ঞান লাভ করতে আগ্রহী। আমরা সংক্ষেপে তাঁর গ্রন্থের সারাংশ তথা অধিবিদ্যার উপর তাঁর চিন্তা তুলে ধরব। আমরা আগেই বলেছি অধিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় আদিকরণ তথা ঈশ্বর নিয়ে আলোচনা, আত্মার অমরতা প্রভৃতি। এসব ক্ষেত্রে এরিস্টটলের মন্তব্য বক্ষ্যমান আলোচনায় পাওয়া যাবে।

মানুষ কেন জ্ঞান লাভ করেতে আগ্রহী, কারণ জ্ঞানকে তারা ভালোবাসে। জ্ঞানের প্রতি মানুষের এই ভালোবাসার কারণ জ্ঞান ইন্দ্রিয়গুলোর উপকারিতা ও জ্ঞানের উৎস হিসেবে এগুলোর ভূমিকা। আবার জ্ঞান ইন্দ্রিয়গুলোর মধ্যে দর্শন-ইন্দ্রিয়কে তিনি সবচে গুরুত্ব দেন। তিনি মনে করেন এটাই জ্ঞানের প্রধান প্রবেশ পথ

এবং এর মাধ্যমেই মানুষ বস্তু, ঘটনা ইত্যাদির বিভিন্ন গুণাবলী স্বচ্ছভাবে বুঝতে পারে।[৪] তবে এই মতামত আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে প্রমাণিত নয়। আধুনিক চিন্তাবিদগন মনে করেন, সকল ইন্দ্রিয়ই সমভাবে জ্ঞানের উৎস।[৫] এরিস্টটলের মতে, মানুষের জীবন যাত্রা বিজ্ঞান বা কলা এবং যুক্তি জ্ঞানের সম্মিলনে বিকশিত হয়। বিজ্ঞান ও কলা হচ্ছে অভিজ্ঞতার ফসল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার চেয়েও বেশি ভূমিকা রাখতে পারে জ্ঞান ও উপলব্ধি। একজন সাধারণ অভিজ্ঞ লোক শুধু জানেন একটি জিনিস বা বস্তু এই ধরণের, কিন্তু কেন এই ধরণের তা তিনি জানেন না। অন্যদিকে একজন প্রকৃত জ্ঞানী বা বিজ্ঞানী এই ঘটনার উৎস ও কারণ সম্পর্কে জানেন। এজন্যই তাঁর মর্যাদা বেশি। একজন হস্তশিল্পী একটি প্রাণহীন যন্ত্র চালিত জিনিসের মত প্রায় অচেতনভাবে উৎপাদন কাজ চালান, যেমন আগুন জ্বালায় কিন্তু আগুন জানেনা কেন সে দহন করে। এভাবে তিনি প্রমাণ করেন একজন লোক ব্যবহারিক জীবনে যে কাজ করে তার দ্বারা নয় বরং কেন সেই কাজ করছে তার কার্যকরণ সম্পর্কে অভিজ্ঞ হওয়ার মাধ্যমেই বস্তু ও ঘটনাকে ভালো ভাবে বুঝতে সক্ষম হতে পারে।[৬] এতে আরো প্রমাণিত হয় ইন্দ্রিয়সমূহ আমাদেরকে সঠিক জ্ঞান দিতে পারে না। অর্থাৎ এগুলো বস্তুর উৎস বা কারণ সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে কিছু বলতে পারেন না। সুতরাং যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় পরিধি অতিক্রম করে কলাবিদ্যা বা বিজ্ঞানের আবিষ্কার করেন তিনিই প্রকৃত বিজ্ঞানী।[৭] এবং এভাবে সেই বিদ্যা বা শাস্ত্রই জ্ঞান শাস্ত্র বা প্রকৃত বিজ্ঞান যার মধ্যে মূলকারণ ও আদি মূল নীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

অধিবিদ্যার মাহাত্ম্যঃ

প্রথম খন্ডের ২য় অধ্যায়ে এরিস্টটল অধিবিদ্যার প্রকৃতি ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। যজ্ঞানের ব্যাখ্যা দেওয়ার পর তিনি প্রকৃত জ্ঞানীর পরিচয় দেন। তাঁর মতে, যে ব্যক্তি বিভিন্ন জিনিস প্রজ্ঞার সাহায্যে বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক পদ্ধতিতে অনুধাবন করেন তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী। কলা বা বিদ্যাসমূহের মধ্যে যে বিদ্যা নিজের জন্য ও জ্ঞানের জন্য আকাক্ষিত সেই বিদ্যা বা কলাকে প্রকৃত জ্ঞান (Wisdom)[৮] বলা যায়। প্রকৃত পক্ষে তিনি অধিবিদ্যার জ্ঞানকেই wisdom আখ্যা দেন এবং বলেন, অন্যান্য বিদ্যা বা জ্ঞান যা সম্ভাব্য ফলাফলের প্রতি বেশি আকৃষ্ট সে সব বিদ্যার চেয়ে আমরা প্রকৃত জ্ঞান (অধিবিদ্যা) কে শ্রেয় ও অধিকতর গুণ সম্পন্ন বলে গণ্য করি। এই জ্ঞান অন্য কিছুর অধীনস্ত নয়। অন্য কোনো বিদ্যা বা শাস্ত্রের কাছ থেকে কখনো তা আদেশ গ্রহণ করে না। বরং এর জ্ঞান সর্বোচ্চ এবং এই বিজ্ঞান যাবতীয় বিজ্ঞান ও শাস্ত্রসমূহকে নির্দেশ ও শিক্ষা প্রদান করে।[৯] এরিস্টটলের সময় অধিবিদ্যা কথাটির আবিষ্কার হয়নি। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, অধিবিদ্যা তখন দর্শন রূপেই পরিচিত ছিল। এবং দর্শনকে তিনি প্রায়শ বিজ্ঞান বলে অভিহিত করতেন। তবে এই বিজ্ঞান অন্যান্য

ব্যবহারিক বিজ্ঞানের মত নয়, এটা চিন্তাশীল ও অনুধ্যানমূলক। তাঁর মতে আদি বা মৌলিক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত জ্ঞানই সবচেয়ে নিখুঁত ও নির্ভরযোগ্য, ব্যবহারিক বিজ্ঞান সংশয়মূলক ও পরনির্ভরশীল।

অধিবিদ্যার প্রকৃতি প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, একজন মুক্ত মানুষ যেমন অপরের উপর নির্ভশীল না হয়ে, কারো নির্দেশের অপেক্ষা না করে তার নিজ পায়ে অগ্রসর হয়। বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ আলোচ্য বিজ্ঞান অনুরূপভাবে মুক্ত এবং জ্ঞানের জন্যই জ্ঞান এই নীতিতে বিশ্বাসী। আলোচ্য বিজ্ঞান বা দর্শন ন্যায়ত: অতি মানবিক, কেননা মানবপ্রকৃতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দাসত্বমূলক।[১০] এর অর্থ অধিবিদ্যার জ্ঞান শ্রেষ্ঠ ও অতীন্দ্রিয় জ্ঞান। মানুষের প্রকৃতিতে জৈবিক প্রকৃতির প্রাধান্য থাকায় তার জ্ঞান সীমাবদ্ধতা ও ঝোঁকপ্রবণতা বিদ্যমান; এজন্য সে মুক্তচিন্তা করতে পারে না। সাইনো নোইডসের[১১] উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, কেবল ঈশ্বরেরই মুক্ত চিন্তা ও ক্ষমতা রয়েছে। এভাবে এরিস্টটল ক্রমান্বয়ে ঈশ্বরের গভীরে আসেন। তিনি বলেন, যে শাস্ত্র সবচে অতি মানবিক তা সবচে গৌরবজনক। যে শাস্ত্রের বিষয়বস্তু ঈশ্বর সেই শাস্ত্রকে দৈবশাস্ত্র বলে। এই দৈবশাস্ত্রই সর্বোত্তম শাস্ত্র। প্রত্যেক জ্ঞানী বা দার্শনিক বুঝতে পারেন ঈশ্বরই মূলনীতি বা কারণ। আামদের আলোচ্য জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে অথবা বহুলাংশে ঈশ্বরসংক্রান্ত। তাই অন্যান্য শাস্ত্র ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে অধিকতর প্রয়োজনীয় হলেও এই শাস্ত্র দর্শন হিসাবে সর্বোচ্চ।[১২]

অধিবিদ্যা সংক্রান্ত মূল বক্তব্য:

এরিস্টটলের মতে প্রকৃত বা খাঁটি জ্ঞান হচ্ছে কারণসমূহের জ্ঞান বিশেষত চূড়ান্ত কারণসমূহের জ্ঞান। কারণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করলে ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে সহজে ধারণা নেওয়া যায়। অধিবিদ্যার আলোচনায় এজন্য তিনি প্রথমেই কারণের আলোচনা করেন। তাঁর মতে কারণসমূহেকে চার ভাগে ভাগ করা যায়।[১৩]

(১) আকারগত কারণ (Formal cause): কোন কিছুর মূল পরিকল্পনা ও নকশা যাকে সৃষ্টি করা হবে এটা সেই জিনিসের সারসত্তা। যেমন একটি মূর্তি তৈরির কথা আসলে সেটি কার মূর্তি তা নির্মাতার মনে মনে থাকে।

(২) উপাদান কারণ (Material cause): কেনো কিছু তৈরির কাজে মূল উপাদান যা দিয়ে জিনিসটি তৈরি করা হবে। যেমন মূর্তির উপাদান করণ ব্রোঞ্জ। এরিস্টটল উপাদান কারণ নিয়ে আলোচনায় পূর্ববর্তী দার্শনিকদের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, তাঁারা অনেকেই আদি কারণ রূপে উপাদান বা বস্তুগত কারণকেই উল্লেখ করেন। যেমন: থেলিস পানি, এমডিতোকলি বায়ু, পানি ,আগুন ও মাটিকেই আদিকরণ মনে করতেন।

(৩) নিমিত্ত কারণ (Efficint cause): এর মানে হচ্ছে যন্ত্রপাতি বা উপকরণের মাধ্যমে ব্রোঞ্জের টুকরোগুলো সংযোগ ও সমন্বয়করন। এরিস্টটল, এখানে জগৎ সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ রূপে প্রেমকে উল্লেখ করে কবি হেসিয়যের যে মন্তব্য তুলে ধরেন, তা হল-

First indeed of all was chaos but next in order

Ears with her spacious bosom :Then

Love who is preminent amongst all the immortals.[১৪]

(৪) পরিণতি কারণ (Final cause): এর অর্থ হচ্ছে কল্পিত মূর্তিটির বাস্তব রূপদান। বার্ট্রান্ড রাসেল বলেন, এরিস্টটলের অচালিত চালককে পরিণতি কারণ হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে। অচালিত চালক একটি উদ্দেশ্য প্রদান করে যা মূলত ঈশ্বরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার একটি বিবর্তনিক প্রক্রিয়।[১৫] এরিস্টটল তাঁর এই কারণতত্ত্ব সবিস্তার আলোচনা করেন physics গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডে। সেখানে তিনি বলেন এই চার প্রকার কারণের মাধ্যমেই সব কিছুর ব্যাখ্যা করা সম্ভব। অবশ্য এই চার কারণকে তিনি পরে দুটি কারণের অন্তর্ভুক্ত করেন। আকার, নিমিত্ত ও পরিণতি কারণ মিলে আকারগত কারণ (Formal Cause) আর উপাদান কারণ (material cause) মিলে বস্তুর গঠন। এ ক্ষেত্রে তাঁর একটি পরিভাষা Hylomorphism বা আকার ও উপাদান সংক্রান্ত মতবাদ। গ্রিক শব্দ hule (matter) এবং morphe (Form) উভয় মিলে Hylomorphism.[১৬] এরিস্টটলের অধিবিদ্যায় কারণতত্ত্বের উদ্দেশ্য মূলত ঈশ্বরকে আদিকারণ হিসেবে ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা থেকে।

এরিস্টটলের মতে অধিবিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয় মৌল সত্তার বিজ্ঞান (Science of being qua being)।[১৭] আদি বা মৌল সত্তার প্রকৃতি, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান ও অনুধ্যান করা দার্শনিকের কর্তব্য। সোফিস্টদের মত ব্যবহারিক জ্ঞানের বিষয়বস্তু নিয়ে নয় বরং সত্তা সম্পর্কে স্পষ্ট বা নিশ্চিত জ্ঞান লাভের প্রচেষ্টা দার্শনিকের দায়িত্ব। তিনি অধিবিদ্যাকে প্রজ্ঞা (Wisdom) এবং ধর্মতত্ত্ব (Theology) নামেও অভিহিত করেন।

অধিবিদ্যার আলোচনায় তিনি যুক্তিবিদ্যার দুটি স্বত:সিদ্ধ (axiom) আলোচনা করেন যার উপর ভিত্তি করে তাঁর এই সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। তিনি মনে করেন যুক্তিবিদ্যার সঠিক জ্ঞান ছাড়া অধিবিদ্যা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তাঁর দুটি স্বত:সিদ্ধ হলো:

১. Law of Contradiction (বিরুদ্ধপদ নীতি) এবং ২. Law of excluded middle (মধ্যপদ শূন্য নীতি)। কোন মানুষ একই সময় ন-মানুষ হতে পারে না। কেউ কূপে পড়া আর না পড়া সমান নয়। এখানে একটি সঠিক হবে। একই সময় দুটি বিরুদ্ধ পদ সঠিক হতে পারে না। আবার মানুষ ও ঘোড়া এ দুটি বিরুদ্ধ পদের মধ্যবর্তী কোনো পদ নেই। সত্তা ও অসত্তার মধ্যপদ নেই। বিরুদ্ধ পদ নীতির সপক্ষে তিনি ৭টি প্রমাণ উপস্থাপন করেন। প্রোটাগোরাসের মত ছিল, মানুষই সত্যের মাপকাঁঠি। এটা সঠিক নয়। কেউ একটি বিষয়কে খারাপ, কেউ ভালো বলতে পারে। একটি জিনিস একই সময় ভালো ও খারাপ হতে পারে না।[১৮]

অধিবিদ্যা সংক্রন্ত মূল আলোচনা পাওয়া যায় Z বুক থেকে। এখানে তিনি Substance বা দ্রব্য নিয়ে আলোচনা করেন। দ্রব্যই তাঁর অধিবিদ্যার কেন্দ্রবিন্দু। আমরা বলেছিলাম Being (সত্তা) হচ্ছে তার মূল আলোচ্য বিষয়। তিনি বলেন We are seeking the principles and the causes of the things that are, and obviously of them qua being.[১৯] এরপর তিনি Being -এর কয়েকটি অর্থেই কথা বলেন। যেমন আকস্মিক সত্তা সত্য হিসেবে সত্তা, ক্যাটিগোরিস বা বিধেয় হিসেবে সত্তা, সম্ভাবনাপূর্ণ ও বাস্তব সত্তা। বিভিন্ন যুক্ত দেখিয়ে তিনি আকস্মিক সত্তা ও সত্য হিসেবে সত্তার ধারণা অধিবিদ্যা বহির্ভূত বলে বর্জন করেন।[২০]Zবুকের প্রথম অধ্যায়ের সূচনাতেই তিনি বলেন, While being has all these senses, obviously that whichis primarily is the what ,which indicates the substance of the thing.[২১] মূলত এখান থেকেই তাঁর Being এর আলোচনা Substance এ রূপান্তরিত হয়। Being এর আরেকটি অর্থ প্রসঙ্গে এখানে তিনি বলেন, It means a quality or quantity or one of the other things that are predicated as these are.[২২] তাঁর মতে, হাঁটা, সুস্থ থাকা, বসে থাকা এগুলোর কোনো স্বাধীন অস্তিত্ব নেই, এগুলোর সাথে এজন কর্তার আবশ্যিক সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং যা প্রাথমিক ও শর্তহীন এবং চূড়ান্ত ভাবে অস্তিত্বশীল তাই Subrtance (দ্রব্য)। এভাবে অধিবিদ্যার সবচেয়ে মৌলিক প্রশ্ন এই দ্রব্য সম্পর্কে এরিস্টটল আবার বলেন, what being is, is just the question what is the substance.[২৩]

দ্রব্য সম্পর্কে পূর্ববর্তী মতগুলোর সমালোচনা করে এরিস্টটল নিজ মত প্রতিষ্ঠা করেন। পিথাগোরিয় চিন্তাবিদগণ মনে করতেন কঠিন দেহের চেয়ে দেহের সীমারেখাই দ্রব্য। যেমন- তল, রেখা, বিন্দু ইত্যাদি। এভাবে তারা গাণিতিক দ্রব্য দ্বারা সব কিছুর ব্যাখ্যা করেন প্লেটোর অনুসারীগণ মনে করেন। কতগুলো চিরন্তন দ্রব্য আছে এবং এরা অসংখ্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিস হতে অনেক বেশি বাস্তব। এরিস্টটল দাবি করেন চার প্রকার জিনিসকে

দ্রব্য বলা যায় (ক) সত্তাধার (Substance), (খ) সারসত্তা (Emence), (গ) সার্বিক (Universal), (ঘ) জাতি (Genus)। তবে এই চার প্রকারের প্রথমটি Substance এর আসল অর্থ বহন করে। তাঁর মতে যার সম্পর্কে সব বিছুকে বিধেয়করণ করা যায় কিন্তু তাকে কোন কিছুরই বিধেয় রূপে ব্যবহার করা যায়না, যখন সকল গুণাবলী অপসারিত হয় তখনও যার অস্তিত্ব থাকে তাই দ্রব্য। বার্ট্রান্ড রাসেল এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন সার্বিক ও বিশেষের সমস্যা হিসেবে। তাঁর মতে, সার্বিক পদ দ্বারা আমি এমন এক প্রকৃতির পদ বুঝি যা বহু উদ্দেশ্যের বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু 'বিশেষ' সে রকম বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং সার্বিক স্বতন্ত্রভাবে অস্তিত্বশীল হতে পারে না, সার্বিক বিশেষ বস্তুর মধ্যেই বিদ্যমান থাকে। স্বকীয় নামবাচক পদ দ্বারা যা বোঝানো হয় তাই দ্রব্য-বিশেষ, আর বিশেষণ রূপে যা আসে তাই সার্বিক।[২৪]

দ্রব্যের ব্যাখ্যায় এরিস্টটল Essence বা সারসত্তার প্রসঙ্গ নিয়ে আসেন। তাঁর মতে কোনো জিনিসের সারসত্তা (Essence) অনিবার্যভাবে তার অস্তিত্বের (Existenee) সাথে জড়িত। যেমন অস্তিত্বশীল হওয়া ও সঙ্গীতজ্ঞ হওয়া। কেউ তার অস্তিত্বের জন্য সংগীতজ্ঞ হয় না। একজন লোকের সারসত্তা তার মূল প্রকৃতরি সাথে আবশ্যিকভাবে জড়িত। মূল প্রকৃতি পদকে সংজ্ঞায়িত করবে কিন্তু পদকে ধারণ করবে না। অন্যভাবে বলা যায়, যে সমস্ত জিনিসের সংজ্ঞা দেওয়া যায় কেবল সে গুলোই দ্রব্য হতে পারে। সংজ্ঞা ও সারসত্তা প্রধানত ও মূলত substance এর সাথে সম্পৃক্ত।[২৫]

যুগ্ম পদের উভয়টির সারসত্তা নেই। যেমন- বক্র নাসিকা; বক্রতা নাসিকার একটি গুণ, নাসিকার আবশ্যকীয় গুণ নয়, সুতরাং নাসিতার সংজ্ঞা দেওয়া যায় বক্র নাসিকার নয়, আর তাই নাসিকারই সারসত্তা আছে। এভাবে তিনি প্রমাণ করেন, সংজ্ঞা হচ্ছে সারসত্তার সূত্র, আর সারসত্তা সঠিক, প্রাথমিক এবং শর্তহীনভাবেই দ্রব্যে অবস্থান করে।[২৬]

তিনি আরো বলেন, একটি জিনিসকে জানা আর তার সারসত্তাকে জানা একই জিনিস। যেমন, একটি ঘোড়ার সারসত্তা জানা মানেই ঘোড়া সম্পর্কে জানা। সুন্দর এর সারসত্তা তার মূল প্রকৃতির সাথে একইরূপ হবে। এরিস্টটলের দ্রব্যের আলোচনা এজন্যই গুরুত্বপূর্ণ যে, তিনি মনে করেন দ্রব্যই সব জিনিসের অস্তিত্বের কারণ।[২৭]

দ্রব্যের ব্যাখ্যা দেওয়ার পর তিনি এর শ্রেণি বিভাগ আলোচনা করেন। তাঁর মতে তিন প্রকার দ্রব্য রয়েছে।

১. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও নশ্বর

২. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কিন্তু অবিনশ্বর এবং

৩. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যও নয়, নশ্বরও নয়।

প্রথম প্রকারের দ্রব্যের উদাহরণ হলো বৃক্ষরাজি ও প্রাণিকুল, দ্বিতীয় প্রকারের দ্রব্য চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি। আর তৃতীয় প্রকারের দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে মানুষের প্রজ্ঞাবান আত্মা এবং ঈশ্বর। লেম্বডা খন্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি এই বিষয়ে কথা বলেন, তবে তৃতীয় প্রকারের দ্রব্যই হচ্ছে অধিবিদ্যার মূল লক্ষ্য। এই খন্ডের পঞ্চম অধ্যায় পর্যন্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্যের আলোচনা করেন। ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে দশম অধ্যায় পর্যন্ত আদি সঞ্চালকের অস্তিত্ব, প্রকৃতি প্রভৃতি প্রমাণ করেন।

এরিস্টটলের মতে যত প্রকার জিনিস আছে সব কিছুর মধ্যে কেলবমাত্র দ্রব্যগুলোই (Substance) আদি ও মূল। যদি সকল দ্রব্যই নশ্বর হয় তাহলে কোনো কিছুই চিরস্থায়ী হবে না। কিন্তু এটা অসম্ভব; কারণ গতি অবশ্যই চিরস্থায়ী। আবার কালেরও উদ্ভব কিংবা বিলোপ হতে পারেনা। একমাত্র অবিরাম পরিবর্তন হচ্ছে দৈশিক পরিবর্তন এবং একমাত্র অবিরাম দৈশিক পরিবর্তনই হচ্ছে গতি। অতএব অবশ্য অনাদি বৃত্তাকার গতি বিদ্যমান থাকবে। আর এই অনাদি গতির কারণ কেবলমাত্র একজন অনাদি সত্তাই হতে পারে যার মধ্যে গতি অন্তর্নিহিতভাবে বিদ্যমান এবং যা গতি সঞ্চালন করার মূলনীতির অধিকারী। এই অনাদি সত্তাকেই তিনি ঈশ্বর বলেছেন।

ইন্দ্রিয়গ্রন্থ্য দ্রব্যগুলোকে তিনি পরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক দ্রব্য বলেছেন। এগুলোর পেছনে উপাদান ও আকার কারণ বিদ্যমান। কিন্তু অতীন্দ্রিয় ও অবিনশ্বর দ্রব্যকে তিনি অপরিবর্তনীয় দ্রব্য বলে উল্লেখ করেন। এই অপরিবর্তনীয় দ্রব্য আধিবিদ্যার অন্যতম আলোচ্য বিষয়। তাঁর মতে এটা অবশ্যই পদার্থ বা উপাদান বিহীন হবে; এখানে কেবল আকার কারণ থাকবে।[২৮]

ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের পর ঈশ্বরের প্রকৃতির নিয়ে তিনি আলোচনা করেন। তিনি বলেন ঈশ্বর প্রেমময়। এই প্রেমের কারণেই গতির সৃষ্টি হয়। আর এই গতি থেকে অন্যান্য গতিও সৃষ্টি হয়। (মনে হয তিনি কবি হেসিয়ড প্রভাবিত)। তাঁর মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই, এমনকি ক্ষুদ্রতম পরিবর্তনও তাঁর মাঝে নেই। এই জন্যই তিনি অচালিত চালক । ঈশ্বর হলেন এক জীবন্ত সত্তা। শাশ্বত এবং সর্বোত্তম সত্তা। তার মধ্যে জীবন ও স্থিতি নিরবিচ্ছিন্ন ও চিরন্তন।[২৯]

ঈশ্বর হচ্ছেন পরম চিরন্তন। কারণ পরম চিরন্তন বিশ্বাসের সর্বোত্তম জিনিস। তাই তিনি অবশ্যই নিজেকে চিন্তা করেন, তাঁর চিন্তন চিন্তনের চিন্তন। যদি ঈশ্বর অন্যের বিষয়ে চিন্তা করেন তাহলে তাঁর মধ্যে পরিবর্তন দেখা

দিবে অথচ তিনি অপরিবর্তনীয় সত্তা। তাঁর চিন্তা হবে অবশ্যই সর্বোত্তম আধ্যাত্মিক বিষয়ের চিন্তা। আধ্যাত্মিক চিন্তন মৌলিভাবে অবিভাজ্য। মানুষের চিন্তন কালের সীমার অধীন, কিন্তু আধ্যাত্মিক চিন্তান আদি বা শ্বাশত।[৩০] পরম শুভের ধারণাকে এরিস্টটল ঈশ্বরের সাথে সম্পৃক্ত করেন। তাঁর মতে সব জিনিসেই সার্বিক শুভের জন্য বিন্যস্ত করা হয়। জগৎ কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনার সমাবেশ নয়। সব জিনিস একটি অপরটির সাথে সুবিন্যস্তভাবে গ্রথিত। এটা একটা গৃহ বিন্যাসের অনুরূপ, যেখানে মুক্ত মানুষ আদৌ উদ্দেশ্যহীনভাবে বা খেয়াল খুশীমত বাস করেনা। সবাই সার্বিক মঙ্গলের জন্য নিজ নিজ কর্তব্যের প্রতি নিবেদিত হয়ে কাজ করে। প্রত্যেক জিনিসের নীতিই হলো আনুগত্য স্বীকার করে খুশীমত চলা। এম্পিডক্লিসের সমালোচানা করে তিনি বলেন, শুভ এর সাথে অশুভ চিরন্তন নয়। এ নাক্সাগোরাস শুভকে উদ্দেশ্যমূলক বলেছেন, সেটাকেও তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর মতে জগত অবশ্যই অশুভ ভাবে পরিচালিত হতে পারে না।

এরিস্টটলের অধিবিদ্যায়, আদি কারণ হিসেবে একজন ঈশ্বরের কথা বললেও অচালিত চালকের সংখ্যা নিয়ে সমস্যা দেখা যায়। বার্ট্রান্ড রাসেল এর সমাধান দেন, এভাবে অচালিত চালক হিসেবে ঈশ্বরের সংজ্ঞায়ন যথার্থ নয়, কারণ তিনি ৪৭ বা ৪৫ টি অচালিত চালকের কথা বলেন। এখনে অচালিত চালকের সাথে ঈশ্বরের সম্পর্কের ব্যাখ্যা আসেনি। অবশ্য স্বাভাবিক ব্যাখ্যায় বিষয়টি এরূপ হবে যে, ৪৭ বা ৪৫ জন দেব-দেবী রয়েছে।[৩১]

এরিস্টটলের অধিবিদ্যায় প্রজ্ঞাবান আত্মার অমরতার কথা উল্লেখ থাকলেও এর বর্ণনা আসেনি। এই বিষয়ে তিনি On the Soul এবং Nicomachean Ethics গ্রন্থে আলোচনা করেন। রাসেলের মতে[৩২]এরিস্টটলের আত্মার ধারণাটি অস্পষ্ট। যেমন, পিথাগোরিয়ানদের জন্মান্তরবাদকে সমালোচনা করে তিনি বলেন, আত্মাকে দেহ থেকে পৃথক করা যায় না। সুতরাং দেহের মৃত্যুর সাথে সাথেই আত্মারও বিনাশ ঘটে। কিন্তু একটু পরে তিনি আবার বলেন, বস্তুগত দেহের আকার (Form) অর্থে আত্মা একটি দ্রব্য এবং বস্তুগত দেহের মধ্যে সুস্থ আকারে বিদ্যমান থাকে। বস্তুর আকার ও উপাদানের মতই আত্মার ও দেহের সম্পর্ক। আত্মা দেহের আকার এবং দেহ আত্মার উপাদান। তিনি আবার বলেন, আত্মা হচ্ছে দেহের চূড়ান্ত কারণ। আত্মার সম্পর্কে আলোচনার পর মন সম্পর্কেও আলোচনা করেন। তিনি বলেন, মন সম্ভবত একটি স্বাধীন সত্তা এবং মন আত্মার মধ্যে প্রোথিত। মনকে অত্যন্ত ভিন্ন জাতীয় এক প্রকার আত্মা বলেন তিনি। তাঁর Nicomachean Ethics এ তিনি আত্মার দু'ধরনের উপাদানের কথা বলেন, rational এবং irrational। প্রজ্ঞাহীন আত্মার আবার দু' অংশ- উদ্ভিদ আত্মা ও কামনার আত্মা। সমস্ত জীবন্ত বস্তুর এমনকি উদ্ভিদের মধ্যেও উদ্ভিদ আত্মা লক্ষ্য করা যায়।

আর কামনার আত্মা সমস্ত প্রাণির মধ্যে বিদ্যমান। অন্যদিকে প্রজ্ঞাবান আত্মায় ঐশ্বরিক উপাদান রয়েছে। যেহেতু ঈশ্বর অমর সুতরাং প্রজ্ঞাবান আত্মাও অমর। এরিস্টটল বলেন, আমরা যতটা পারি অমর হওয়ার চেষ্টো করব। এবং আমাদের মধ্যে যে ঐশ্বরিক উপাদান আছে সেটাকে কার্যকর রাখতে সদা তৎপর হব। রাসেল মনে করেন, প্লেটো এবং খ্রিষ্ট ধর্মে যে অমরতার কথা বলা হয়েছে এরিস্টটল সেই ধরণের অমরতার বিশ্বাসী ছিলেন না।

পর্যালোচনা ঃ

এরিস্টটল একজন বিখ্যাত ব্যক্তি হলেও তাঁর বক্তব্যের সমালোচনা কম নয়। একদিকে রয়েছে তার সীমাহীন খ্যাতি অন্যদিকে কম হলেও রয়েছে অনেক সমালোচনা। ফ্রেড্রিক কোপলস্টন তাঁর A History of philosphy (voll-iii)[33]গ্রন্থে বলেন, এরিস্টটল মূলত অভিজ্ঞতার জগতের একটি যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেন। তাঁর অধিবিদ্যায় ঈশ্বরকে গতির চূড়ান্ত কারণ হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এরিস্টটলের Matter কে কেউ বুঝতে চাইলে তিনি প্লেটোর তত্ত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করেই বুঝতে পারেন।[৩৪] তিনি আরও বলেন , প্লেটোর মতে অভিজ্ঞতার জগৎ গঠনকারী , ব্যাহ্যিক জগতের কর্তা হচ্ছেন Demiurage (গ্রিক এই শব্দের অর্থ হলো সব কিছুর মূল) আর অন্যদিকে এরিস্টটল একেই ঈশ্বর বলে অভিহিত করেন। তারা উভয়েই সৃষ্টিকর্তা হিসাবে ঈশ্বরকে স্বীকার করেননি।তাঁর মতে তের শতকের পূর্বপর্যন্ত ডানস স্কটাস (মৃত্যু-১৩০৮) এর দর্শন প্রভাব বিস্তার করে। এরিস্টটলের দর্শনের গুরুত্ব কম ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে বিশেষত আরবদের মাধ্যমে এরিস্টটলের রচনা অনূদিত হওয়ায় খ্রিষ্টীয় জগৎ এরিস্টটলকে নতুন করে আবিষ্কার করে। এসময় তাঁকেই স্বয়ং 'দর্শন' এবং "The philosopher" নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু রেনেসাঁ দর্শনে এরিস্টটলকে দর্শনের জন্য বিপর্যয়কর বলে মনে করা হত। [৩৫]

উইল ডুরান্টের মূল্যায়ন হচ্ছে এরিস্টটলের ঈশ্বর নিষ্ক্রীয়, তিনি কিছুই করেন না। তাঁর কোনো আগ্রহ নেই। কোনো ইচ্ছা নেই, নেই কোনো উদ্দেশ্য: তাঁর কজ এতই পবিত্র যে, সে জন্য তিনি কোনো কাজই করেন না। বস্তুর সার বা মূল বিষয়ের চিন্তা করাই হচ্ছে তার একমাত্র করণীয়। যেহেতু তিনি নিজেই সব কিছুর পর সব রূপের রূপ অতএব তাঁর একমাত্র করণীয় হচ্ছে নিজের সম্মন্ধে বসে জস চিন্তা করা। বেচারা এরিস্টটলের ঈশ্বর তিনি এক নিষ্কর্মা বাদশাহ।"[৩৬] তিনি এরিস্টটলের ঈশ্বরকে তুলানা করেন ইংরেজী রাজার সাথে যার কোনো কাজ নেই। কিন্তু রাজা।[৩৮]

আত্মা প্রসঙ্গে এসিস্টটল যে মন্তব্য করেন সেটাকে ও বিদ্রুপ না করে ছাড়েননি ডুরান্ট। তিনি বলেন, আত্মাকে অমরতা দেওয়ার জন্যই এরিস্টটল আত্মাকে ধ্বংস করে বলেন: অমর আত্মা হচ্ছে নির্মল চিন্তা যাতে লাগেনি বাস্তবের মলিন স্পর্শ। পরাবিজ্ঞানের কেক একই সময় খেয়ে আর নিজের হাতে রেখে দিয়ে এরিস্টটল-মেসেডিনিয়া বিরোধী হেমলক বিষের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য কল্পনার এক সুক্ষ্ম জাল বিস্তার করেননি তো?[৩৮]

TH Irwin এর মতে, এরিস্টটলের গড বিশ্বজগতের চুড়ান্ত কারণ কিন্তু সৃষ্টিকর্তা নন। যেমনটি প্লেটোও মনে করতেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতে জগৎ চিরন্তর । ঐশ্বরিক কোনো আদেশ নেই বা ভবিষ্যৎ ঘটানোর জন্যও তার কোনো জ্ঞান নেই। তবে বিশ্বজগৎ ঈশ্বরের উভয়ই নির্ভরশীল। Physics-VIII তিনি যুক্তি দেন গতির ব্যাখ্যা একটি আদি কারণের অনিবার্যতার প্রমাণ করে আর Metephysics-xii-এ তিনি বলেন, এই আদি কারণই ঈশ্বর অবস্তু ও দ্রব্য ।[৩৯]

তথ্য নির্দেশ:

1. http:// www.plato.stanford.edu/aristotle
2. http:// www.muslimphilosophy.com
3. *এরিস্টটলের অধিবিদ্যা*, (অনুবাদ- আবুল জলিল মিয়া), ঢাকা,বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮, পৃ. ৩
4. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪
5. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪ (২ নং টীকা)
6. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬,৭
7. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭,৮
8. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯
9. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯
10. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
11. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
12. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২,১৩
13. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
14. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০
15. বার্ট্রান্ড রাসেল, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস [প্রাচীন ও ক্যাথলিক দর্শন: নির্বাচিত অংশ]*, (অনুবাদ- প্রদীপ রায়), ঢাকা,নিউ এজ পাবলিকেশন, পৃ. ১৬৩
16. http:// www.plato.stanford.edu/aristotle
17. *এরিস্টটলের অধিবিদ্যা*,পৃ.৮১
18. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯,৯১
19. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯
20. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪-১২৬
21. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩
22. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭
২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২
২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪
২৭. প্রাগুক্ত,পৃ.১৮৬
২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬
২৯. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩০
৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩১
৩১. বার্ট্রান্ড রাসেল, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস [প্রাচীন ও ক্যাথলিক দর্শন: নির্বাচিত অংশ]*, ঢাকা, পৃ. ১৬৩
৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪-১৬৬
৩৩. Fredrick copleston, S.J. :A History of philosphy (voll-iii)Maryland,The Newman press,1953 p. 411
৩৪. Ibid, p.412
৩৫. Ibid, p.414-5
৩৬. উইল ডুরান্ট,দর্শনের ইতি কাহিনী(অনু.আবুল ফজল) ঢাকা,১৯৮০,পৃ.১০১
৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ.১০১
৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ.১০৩
৩৯. www.muslimphilosophy.com/aristotle

২. সেন্ট টমাস একুইনাস

মধ্যযুগের স্কলাস্টিক দার্শনিক সেন্ট টমাস একুইনাস (১২২৫-৭৪) দর্শনের ইতিহাসে এক বিখ্যাত নাম। একজন ধর্মতত্ত্ববিদ, বিশপ, অধিবিদ হিসেবে তাঁর নাম অবিস্মরণীয়। মাত্র অর্ধশতকের জীবন, কিন্তু যে বিশাল পর্বতচুম্বী কর্ম, পৃথিবীর ইতিহাসে তা খুবই বিরল। ১২২৫ সালে ইতালির রোম ও নাপেলস্ এর মর্ধবর্তী মন্টেক্যাসিনোর রোকাসেকায় এক পাহাড়ী প্রাসাদে জন্ম হয়েছিল তাঁর। ৫ বছর বয়স থেকে মন্টেক্যাসিনোয় পড়া লেখা শুরু হয়। পরিবারের সাথে স্থানান্তরিত হয়ে নাপেলসে চলে গেলে দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয় বছর পড়াশোনা করেন। এখানেই তিনি এরিস্টটলের মতবাদের সাথে পরিচিত হন। পরিবারের বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি ডোমিনিকান মত গ্রহণ করেন এবং আলবার্টাস ম্যাগনাসের নিকট শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোলন গমন করেন। আলবার্টাস ম্যাগনাস ছিলেন তৎকালীন দার্শনিকদের মধ্যে প্রধান এরিস্টটলপন্থী। সেখান থেকে তিনি প্যারিস যান এবং পড়ালেখা শেষ করে ডোমিনিকানদের ধর্মতত্ত্ব বিভাগের প্রধান হিসেবে তিন বছর দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তী দশ বছর তিনি ইতালির বিভিন্ন স্থানে অতিবাহিত করেন। ল্যাটিন অ্যাভেরসবাদী ও এরিস্টটলপন্থীদের দ্বন্দ্বের অবসানের জন্য তিনি আবার প্যারিস আমন্ত্রিত হন। কিছুকাল প্যারিস অবস্থান করে নাপেলসে ফিরে যাবার সময় পথিমধ্যে অসুস্থ হয়ে তিনি ৭ মার্চ ১২৭৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন।[১]

তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হলো Summa Theologica, Summa Contragentiles, Being and Essence, The Principle of Nature এরিস্টটলের Metaphsics, On the Soul, De Anima গ্রন্থের টীকা লিখে তিনি এসব গ্রন্থ পাঠ সহজতর করেন। আর এসব টীকাতেই তাঁর মৌলিকত্ব ফুটে উঠেছে। বীথিয়াসের On the Trinity এবং De Hebdomadibus এর উপর লিখিত Commentary-ও তাঁর মৌলিক অবদান। তিনি এরিস্টটলকে অনুসরণ করেন এবং এরিস্টটলের দর্শনকে খ্রিষ্টধর্মের সাথে অভিযোজন করেন। এটাই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। একজন বিশপ হিসেবে তিনি যেমন সেন্ট অগাস্টিন ও আনসেলমের যোগ্য উত্তরসূরী তেমনি একজন দার্শনিক হিসেবে তিনি এরিস্টটলের যোগ্য অনুসারী। থিলি তাঁর সম্পর্কে বলেন, His devotion to the Church and its interests, his philosophical talents, which he employs in the service of Catholicism, and his faith in the perfect harmony between the dogma and philosophical truth as set forth

in Aristotle, make him the most typical doctor of the church after St. Augustine and St, anselm.[২]

একুইনাসের সমস্ত দার্শনিক আলোচনা এরিস্টটল কেন্দ্রিক। একজন ধর্মতত্ত্ববিদ হিসেবে তিনি এরিস্টটলের ঈশ্বর সম্পর্কিত আলোচনাকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন। এরিস্টটলের অধিবিদ্যার অনুসরন এবং খ্রিস্ট ধর্মের সাথে যতটুকু খাপ খাওয়ানো যায় তিনি তাই করেন। তিনি সত্তা সম্পর্কিত Being and Essence গ্রন্থে ঈশ্বরের সারসত্তা সম্পর্কে আলোচনা করেন। তবে রাসেলের মতে তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ Summa Contragentiles যেখানে তিনি তাঁর সমস্ত দর্শনের মূলকথাগুলো সন্নিবেশিত করে প্রকাশ করেন।[৩] তবে Summa & Theologiae গ্রন্থে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে ৫টি যুক্তি প্রদান করে স্মরণীয় হয়ে আছেন। ইতিহাসে তা Five way of St. Aquira নামে পরিচিত। একুইনাসের অধিবিদ্যাকে আলোচনার ক্ষেত্রে এখানে আমরা রাসেলের অনুসরণ করব। আমরা প্রথমে Summa Theologica এর ঈশ্বরের অস্তিত্বের যুক্তি এবং এর পর Summa Contragentiles এর সারমর্ম সংক্ষেপে আলোচনা করব। যার মাধ্যমে আশা করছি তাঁর অধিবিদ্যা সম্পর্কে একটি চিত্র ফুটে উঠবে।

বার্ট্রান্ড রাসেল বলেন একজন পাঠক যে মানদন্ডে এরিস্টটলের দর্শন গ্রহণ বা প্রত্যাখান করবেন সেই একই মানদন্ডে তিনি একুইনাসের দর্শন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করবেন।[৪] এজন্যই তিনি যে পাঁচটি যুক্তি দেন তা এরিস্টটলের অনুসরণ করেই। Summa Theologiea গ্রন্থটি ৪টি খন্ডে বিভক্ত এবং প্রায় ৪ হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত। প্রশ্ন, আপত্তি, উত্তর- এই প্রক্রিয়ায় তিনি সম্পূর্ণ গ্রন্থটি রচনা করেন। ১ম খন্ডে আছে ১১৯টি প্রশ্ন, ২য় খন্ডে আছে ৩০৩টি, ৩য় খন্ডে ৯০টি, ৩য় খন্ডের Suppliment আকারে আছে ৬৮টি এবং ৪র্থ খন্ডে আছে ৯৯টি প্রশ্ন এবং Appendix আকারে আছে আরো ২টি প্রশ্ন। এসব প্রশ্নের উপর আপত্তি (objection) এবং উত্তর (Reply) দিয়ে তিনি গ্রন্থটি সাজিয়েছেন। তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বের উপর যে ৫টি যুক্তি দেন তা এসেছে ১ম খন্ডের ২য় প্রশ্নে The Question of God's Existence.

এই প্রশ্নের অধীনে আরো ৩টি প্রশ্ন হলো ঃ

১. Whether the existence of God is self evident?

২. Whether it can be demonstrated that God exist?

৩. Whether God exist?[5]

৩য় প্রশ্নটির অধীনে তিনি ২টি আপত্তি তুলে ধরেন, যেখানে ঈশ্বরে বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা হয়েছে। প্রথমত জগতে দুই প্রকার অসীম জিনিস থাকলে জগৎ ধ্বংস হয়ে যেত। অর্থাৎ ঈশ্বর হচ্ছেন অসীম ভালোত্ব, অন্যদিকে জগতে অশুভ সমানভাবে বিদ্যমান। যদি ঈশ্বর থাকতেন তাহলে অশুভ থাকত না। সুতরাং ঈশ্বর অস্তিত্বশীল নয়। দ্বিতীয়ত জগতের সবকিছুর মূল কথা হলো প্রকৃতি এবং সমস্ত ঐচ্ছিক কাজের জন্য রয়েছে মানুষের বুদ্ধি সুতরাং এখানে ঈশ্বরের ধারণার প্রয়োজন নেই। একুইনাস তখন বলেন I ansrwered that, the existence of God can be proved in five ways.[6]

প্রথম যুক্তিটি হচ্ছে গতির যুক্তি। এটা নিশ্চিত ও প্রমাণিত যে, বিশ্ব জগতে কিছু জিনিস গতিশীল। কোনো কিছু যখন গতিশীল হয় তখন নিশ্চয় অন্য কারো দ্বারা তা গতিপ্রাপ্ত হয়। কারণ- কোনো কিছুই গতিশীল হতে পারে না যদি তার ভিতর গতিসৃষ্টিকারী কোনো সুপ্ত ক্ষমতা না থাকে। একটি জিনিস গতিপ্রাপ্ত হবে তখনই যখন তার ভিতর বাস্তবে কাজ করার সামর্থ থাকে। এটা সম্ভব নয় একটি জিনিস একই সময় বাস্তব এবং সুপ্ত ক্ষমতা সম্পন্ন হবে। যেমন কোনো কিছু গরম ও নয় গরম একই সময় ঘটতে পারে না। অর্থাৎ এটা অসম্ভব যে একটি জিনিস একই সময় গতি সৃষ্টিকারী (mover) এবং গতিশীল (moved) হবে। সুতরাং যখন কোনো কিছু গতিশীল হবে তা অন্য কারো মাধ্যমেই গতিশীল হবে। এভাবেই সেই গতি সৃষ্টিকারীর পেছনেও আরেকজন গতিসৃষ্টিকারী থাকবে। কিন্তু এভাবে অসীমতার দিকে আমরা যেতে পারিনা। তাই তিনি বলেন, Therefore it is necessary to arrive at a first mover, moved by no other and this every one understand to be God. একুইনাস একজন খ্রিস্টান ছিলেন, বিধায় বিশ্বাস করতেন জগৎ অনন্তকাল থাকবেনা। কিন্তু তারপর কী হবেঃ সেখানেও অসীমতার সমস্যা। এতেও প্রমাণিত হয় অনন্ত গতির জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনিবার্য। এই যুক্তিটি এরিস্টটলেরই সংস্করণ।

দ্বিতীয় যুক্তিটি ছিল কার্যকারণ ভিত্তিক। প্রাকৃতিক জগৎ পরিচালিত হচ্ছে কার্যকারণ নিয়মের আলোকে। সবকিছুর পেছনে একটি কারণ থাকে। সুতরাং আমাদের জানা বিশ্বজগতের সব কিছুর পেছনে একটি চূড়ান্ত ও

অনিবার্য কারণ থাকতে হবে। আমরা সেই চূড়ান্ত কারণকে (effective cause) ঈশ্বর বলি।ঈশ্বরের অস্তিতের পক্ষে তাঁর তৃতীয় যুক্তি হচ্ছে সকল আবশ্যিকতার আদি উৎস হিসেবে একটি আদি আবশ্যকতা।

তৃতীয় যুক্তিটি ২য় যুক্তির অনরূপ। প্রাকৃতিক জগতে যা কিছু অস্তিত্বশীল সব কিছুর সূচনা হয়েছে আকস্মিকভাবে। এখন আমরা যদি বলি, এই আকস্মিকতার পেছনে একই আকস্মিকতা বিদ্যমান তাহলে সমস্যায় পড়তে হয়। একুইনাস দাবি করেন, তাহলে এক সময় ছিল যখন কোনো কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। যদি তা সত্য হয় তাহলে বর্তমানেও কোনো কিছুর অস্তিত্ব হতোনা। কারণ অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বের সূচনা কী করে হবে? অথচ আমরা দেখছি অসংখ্য জিনিস অস্তিত্বশীল। এটা আমাদেরকে এই সিদ্ধান্ত নিতে অনুপ্রাণিত করে যেকোনো অনিবার্য অস্তিত্বের পেছনে আরেকটা অনিবার্য অস্তিত্ব আবশ্যক। সুতরাং আমাদের স্বীকার করতে হবে, একজন অনিবার্য আবশ্যক সত্তা হিসেবে ঈশ্বর অস্তিত্বশীল, যিনি সব কিছুর কারণ কিন্তু তাঁর কোনো কারণ নেই।

একুইনাসের ৪র্থ যুক্তিটি বিশ্বতাত্ত্বিক যুক্তির অনুরূপ। তাঁর মতে এজগতে আমরা বিভিন্ন পূর্ণতা লক্ষ্য করি। এবং এই পূর্ণতার উৎস এমন কিছুর মধ্যে বিদ্যমান যা সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ। আমরা জগতে যতগুণ দেখি যেমন, সত্য, ভালোত্ব ইত্যাদি সবই আংশিক বা অপূর্ণাঙ্গ। এসব গুণের এমন একটি কারণ অবশ্যই থাকবে যা সমস্ত গুণকে পূর্ণাঙ্গভাবে ধারণ করে আছে। প্লেটোর সাথে একুইনাসের এখানে মিল রয়েছে। যদিও প্লেটোকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্বের জন্য তিনি প্লেটোর ধারণাতত্ত্বের অনুসরণ করেছেন। তিনি বলেন, সর্বোচ্চ ভালোত্বের জন্য সর্বোচ্চ সত্তার অস্তিত্ব আবশ্যক। এই ধরণের একটি সম্পর্কের চিন্তাটা আমাদের নিকট সহজেই বোধগম্য হতে পারে। সুতরাং সত্য, ভালোত্ব এবং সমস্ত সত্তার একটি চূড়ান্ত উৎস অবশ্যই কোনো না কোনো ভাবে বিশ্বতাত্ত্বিক যুক্তির অন্তর্ভূক্ত যার মূল কথা একটি আদি কারণ এবং বিশ্ব জগতের সব কিছুর অস্তিত্বের চূড়ান্ত কারণ হিসেবে ঈশ্বরকে ব্যাখ্যা।

একুইনাসের সর্বশেষ যুক্তিটি হচ্ছে teleological argumet. এই যুক্তিটিকে Design argument ও বলা হয়। এই যুক্তির মূল কথা হলো জগতে আমরা যা দেখছি সবকিছুই একটি উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত। জগতের শৃঙ্খলা নিয়মানুবর্তিতা, গতি ইত্যাদি এক পূর্ণতার দিকে ধাবমান। একুইনাস বলেন, Therefore some intelligent being exist by whom all nature things are directed to their end; and this being we call God.[7]

Summa Contragentiles গ্রন্থের মূলকথা

বার্ট্রান্ড রাসেলের মতে এই গ্রন্থটিতেই তাঁর দার্শনিক আলোচনা এসেছে যথার্থভাবে। Theologica তিনি মূলত খ্রিস্টানদের জন্য লিখেছেন যেখানে যুক্তির চাইতে বিশ্বাসকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন এবং বাইবেলের সত্য গুলোকেই তিনি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। অন্যদিকে Contragentiles মানেই হলো খ্রিস্টান বিরোধী। এখানে তিনি বিশেষত Pagan, মুসলিম এবং যারা অবিশ্বাসী তাদেরকে খ্রিস্টাধর্মের মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব দার্শনিক যুক্তির মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। এই গ্রন্থটিও একটি বিশাল গ্রন্থ। প্রায় ৮শত পৃষ্ঠার এই গ্রন্থের ৪টি খন্ড। প্রথম খন্ড আছে ১০২টি অধ্যায় যার শিরোনাম ঈশ্বর। ২য় খন্ডের শিরোনাম Creation / সৃষ্টি এবং ১০১টি অধ্যায়, ৩য় খন্ডের নাম Providence (ঐশ্বরিক আদেশ) ও ১৬৩টি অধ্যায় আর ৪র্থ খন্ডের নাম Salvation বা মুক্তি এখানে আছে ৯৭টি অধ্যায়।

এরিস্টটল তাঁর Metaphysico যেভাবে শুরু করেছেন একুইনাস সেভাবেই তার এই গ্রন্থের সূচনা করে। অর্থাৎ প্রথমত জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা। তাঁর প্রথম কথাটি হচ্ছে They are to be called wise who order things rightly and govern them well.[৮] এই কথাটি The philosopher অর্থ্যাৎ Aristotle এর অনুকরণে বলেছেন তাও তিনি অকপটে স্বীকার করেন। গ্রন্থটিতে এরিস্টটললের Metaphysics, Physics, Posterior Analytics, On the Soul সহ অনেক গ্রন্থের উদ্ধৃতি এসেছে। এবং প্রায় প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে এই সংক্রান্ত বাইবেলের কথাটিও তিনি উদ্ধতি করেন। জ্ঞানীর পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি আরো বলেন একটি জিনিস তখনই সবারচে ভালো হবে যখন তার সুন্দর সমাপ্তি ঘটবে। সুতরাং যিনি সমাপ্তি বা চূড়ান্ত উদ্দেশ্যের জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত তিনিই অধিকতর জ্ঞানী। বিজ্ঞানের এক একটি জ্ঞান পরস্পর নির্ভরশীল। যেমন, জাহাজ চালনা জ্ঞান নির্ভর করে জাহাজ নির্মাণের উপর। রণসজ্জার সাথে জড়িত রণশিল্প। আবার সকল শিল্পকে পরিচালনাকারী শিল্প হচ্ছে স্থাপত্য শিল্প (architectoric)। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার পরিণতির জ্ঞান যার আছে আমরা তাকে জ্ঞানী বলি। যেমন একজন জ্ঞানী স্থপতি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জ্ঞানী ব্যক্তি তাকেই বলতেই হবে যিনি বিশ্বজগতের পরিণতি (end) সম্পর্কে জানেন এবং এর সূচনা সম্পর্কেও জানেন। এভাবে তিনি প্রমাণ করেন আদিকারণ সম্পর্কে যার জ্ঞান আছে তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি বলেন, প্রজ্ঞার

অন্বেষণ হচ্ছে সবচেয়ে পূর্ণ, মহত্তম, উপকারী এবং আনন্দদায়ক (more perdect, more noble, more useful and more full of joy)[9] এর পর কেন পূর্ণ, মহত্তম, উপকারী ও আনন্দদায়ক তার কারণ ব্যাখ্যা করেন। ক্যাথলিক বিশ্বাস অনুযায়ী তিনি সত্যকে আবিষ্কার করতে চান। নবম অধ্যায়ে তিনি সব জিনিসের আদি নীতির (first principle) জ্ঞানকে ৩টি ভাগে ভাগ করেন। (১) ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও প্রকৃতি সম্পর্কিত জ্ঞান, (২) ঈশ্বরের সৃষ্টির জ্ঞান ও (৩) ঈশ্বরের সৃষ্টির শৃঙ্খলা, ঈশ্বরের অলৌকিত্ব, মানব জাতির উদ্দেশ্য প্রভৃতির জ্ঞান। চতুর্থ অধ্যায়ে তিনি বলেন, সব দর্শনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরের জ্ঞান। ঈশ্বর সম্পর্কিত যথার্থ ধারণা দেওয়া এবং একই সাথে অধিবিদ্যার কাজ ও ঐশ্বরিক জিনিস নিয়ে আলোচনা এটাই দর্শনের সর্বশেষ শিক্ষা।[১০]

তিনি বলেন, ঈশ্বর সম্পর্কে আমরা যা বলি তা দু'ধরণের। কিছু আছে এমন যা মানব বুদ্ধির সীমার উর্দ্বে, এগুলো বিশ্বাসের মাধ্যমেই জানতে হয়। যেমন ঈশ্বর হচ্ছেন তিন এর এক। কিন্তু কিছু বিষয় আছে যা স্বাভাবিক প্রজ্ঞার মাধ্যমে প্রমাণ করা যায়। যেমন ঈশ্বর অস্তিত্বশীল, তিনি এক। এগুলো প্রাকৃতিক বুদ্ধির মাধ্যমে দার্শনিকগণ প্রমাণ করেন। ৩য় অধ্যায়ের শেষ পর্যায় তিনি বাইবেলের উদ্ধৃতি দেন Behold, God is great , excepting our knowledge we know cin part.[11] তিনি প্রজ্ঞার সত্যকে খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের সত্যের সাথে সমন্বয় করেন। তিনি বলেন স্বাভাবিকভাবে মানুষের প্রজ্ঞা যে নীতিমালা সম্পর্কে জানে সেগুলোকে বিশ্বাসের সত্য অসম্ভব বলতে পারে না।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে তিনি বলেন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বত:প্রমাণিত বিষয়। তবুও যুক্তির মাধ্যমে তা প্রমাণ করা যায়। এক্ষেত্রে তিনি ৩টি যুক্তি প্রদান করেন, এরিস্টটলের অনুসরণে, অচালিত চালকের যুক্তি, কার্যকারণ ভিত্তিক যুক্তি ও বিশ্বতাত্ত্বিক যুক্তি। এ বিষয় আমরা Summa Theologica এর আলোচনা ব্যাখ্যা করেছি।ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের পর তিনি ১৫তম অধ্যায় থেকে ১০১ অধ্যায় পর্যন্ত ঈশ্বরের গুণ নিয়েই মোটামুটি আলোচনা করেন। তিনি বলেন ঈশ্বরের গুণ সম্পর্কে আমরা যথাযথভাবে জানতে পারিনা। তবে তিনি কী নয় সেটা বিশ্লেষণ করে আমরা একটা ধারণা নিতে পারি। এই পদ্ধতিকে তিনি বলেন, Method of remotion[12] ঈশ্বরের গুণ সম্পর্কে তিনি বলেন, ঈশ্বর চিরন্তন, যেহেতু আমরা দেখছি প্রতিটি জিনিসের অস্তিত্ব এসেছে গতি ও পরিবর্তনের মাধ্যমে। তাই ঈশ্বরকে গতির উর্ধ্বে আদি ও অন্তহীন সত্ত্বা রূপে বিশ্বাস করতে হবে।[১৩] যদি এটা সত্য হত যে, তিনি অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এসেছেন তাহলে তাকে কেউ অসত্তা থেকে সত্তায় পরিণত করেছে। কিন্তু আমরা

দেখিয়েছি তিনি আদি কারণ, তার শুরু ও শেষ নেই। সুতরাং তিনি চিরন্তন। আবার প্রতিটি আবশ্যকতার পেছনে আরেকটি আবশ্যকতার প্রয়োজন এ হিসেবেও তিনি চিরন্তন।

ঈশ্বরের মধ্যে কোন নিষ্ক্রীয় শক্তি নেই। তিনি সব কিছুর উপর শক্তি প্রয়োগের সামর্থ রাখেন। কিন্তু কেউ তাঁর উপর শক্তি প্রয়োগ করতে পারে না। এরিস্টটল অনুসারে তিনি বলেন, God এর মধ্যে কোনো উপাদান কারণ (material cause) নেই। যেহেতু ঈশ্বর সব কিছুর পরিনতি কারণ তাই তার মধ্যে কোনো matter নেই।[১৪] ঈশ্বরের কোনো অংশ নেই। তিনি একক। তাঁর ভিতর সুপ্ত শক্তি ও কাজ করার শক্তি দুটি একসঙ্গে বিদ্যমান। প্রতিটি বিভক্ত কাজ আরেকটি কাজের মাধ্যমে পূর্ণ হয়। ঈশ্বরের মধ্যে তা থাকলে তিনি অপূর্ণাঙ্গ হতেন। এটা অসম্ভব। ঈশ্বরের মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিংবা নিষ্ঠুরতা নেই। ঈশ্বর কোনো দেহের অধিকারী নন। কারণ দেহের বিভিন্ন অংশ থাকে যা একে অপরের পরিপূরক। তাঁর মধ্যে কোনো বিভাজন নেই। সুতরাং তাঁর দেহ নেই। প্রতিটি দেহ সসীম কিন্তু ঈশ্বর অসীম।[১৫]

ঈশ্বর নিজেই তার সারসত্তা (essence)। তার সত্তা ও সারসত্তা একই জিনিস। প্রতিটি জিনিস তার সত্তার (Leing) মাধ্যমে অস্তিত্বশীল হয়। কোনো জিনিসের সত্তাপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য অনিবার্য সত্তার প্রয়োজন কিন্তু ঈশ্বর নিজেই নিজের মাধ্যম সত্তাপ্রাপ্ত। তাই তিনিই তাঁর সারসত্তা ও সত্তা। ঈশ্বরের কোনো জাতি নেই। প্রতিটি জিনিসের একটি জাতি বা প্রজাতি থাকে। কিন্তু ঈশ্বরের কোনো Genus বা প্রজাতি নেই। বরং তিনি নিজেই তাঁর জাতি। ঈশ্বরের সদৃশ কোনো কিছুই নেই। তিনি পূর্ণাঙ্গ। তাঁর সত্তা সর্বজনীনভাবে পূর্ণাঙ্গ সত্তা। প্রতিটি সৌন্দর্যের মূলে আরেকটি সৌন্দর্য আছে। আর এজন্যই কোনো পূর্ণ জিনিস সঠিক অর্থে পূর্ণ নয়। একমাত্র ঈশ্বরই সমস্ত সৌন্দর্য, চমৎকারিত্বের পূণতর্ম কেন্দ্র।[১৬]তিনি পরম শুভ। তাঁর ভিতর কোনো মন্দ নেই। শুভ-র প্রকৃতি হলো পূর্ণতা আর evil বা মন্দের প্রকৃতি অপূর্ণতা। ঈশ্বর যেহেতু পূর্ণ সত্তা, তাই তাঁর মধ্যে অশুভ বা অপূর্ণ কিছু থাকতে পারে না।[১৭]ঈশ্বর একজন। সব জিনিসের আদি উৎস তিনি। তিনি এক না হলে সব কিছুর উৎস হতে পারতেন না।[১৮]

প্রাথমিক ও অনিবার্যভাবে ঈশ্বর কেবল নিজেকে জানেন। তিনি সবকিছু জানেন তাঁর নিজের মত। প্রতিটি জিনিসের যথার্থ জ্ঞান তাঁর রয়েছে।[১৯] ঈশ্বর সব জিনিসকে একই সময় উপলব্ধি করেন। অর্থাৎ ঈশ্বর যেহেতু একজন তাই সব জিনিস সম্পর্কে তাকে একই সময় জানতে হবে। এটা তাঁর সারসত্তা(avsence)। আবার

যেহেতু সব জিনিসের উপর ঐশ্বরিক দৃষ্টি আছে তাই এগুলো অবশ্যই একক ইচ্ছার অধীন। এভাবে ঈশ্বর সব জিনিসটাকেই একসাথে দেখেন। [২০] ঈশ্বরের জ্ঞান কোনো অভ্যাস নয়, কোনো ধরনের অসংলগ্নতা তাঁর জ্ঞানে নেই।

ঈশ্বর হচ্ছেন পরম সত্য। তিনি বিশুদ্ধতম সত্য। মানুষের জ্ঞান অন্য বস্তুর মাধ্যমে হয়। তাই অসম্পূর্ণ এবং সেজন্য তার সত্যও পূর্ণাঙ্গ নয়। অন্যদিকে ঈশ্বর যেহেতু সব কিছুকে একই সময় দেখেন ও জানেন তাই তার সত্য হচ্ছে চূড়ান্ত ও পরম সত্য। (He possense absolute truth becase he is absolute truth)[20]

৬৩ অধ্যায়ে ঈশ্বর বিশেষ বস্তুকে জানেন না এমন মন্তব্য যাঁরা করেন তাদের ৭টি মত উল্লেখ করে সেগুলো খন্ডন করেন।

ক. বিশেষ বস্তু উদ্দেশ্যমূলক হওয়ার কারনে অজড় কোনো কিছুই একে জানতে পারে না।

খ. বিশেষ বস্তু সব সময় অস্তিত্বশীল থাকে না। তাই ঈশ্বর সব সময় তা জানেন না।

গ. বিশেষ বস্তু সম্ভাব্য, আবশ্যিক নয়। তাই অস্তিত্বশীল না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিত জ্ঞান সম্ভব নয়।

ঘ. কিছু বিশেষ বস্তু আমাদের ইচ্ছার ফলেই উদ্ভব হয়। শুধু ইচ্ছাকারী ব্যক্তিই এরূপ বিশেষ বস্তুকে জানতে পারে।

ঙ. বিশেষ বস্তু অসংখ্য ও অনন্ত আর অনন্ত বস্তুকে জানা যায় না।

চ. ঈশ্বরের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বিশেষ বস্তু অতি সামান্য।

ছ. কিছু বিশেষ বস্তুর মধ্যে অশুভ বিদ্যমান। ঈশ্বর অশুভকে জানতে পারেন না। একুইনাস এসব সমস্যার সমাধান ৬৫-৭১ অধ্যায় পর্যন্ত আলোচনা করেন। এসব আলোচনার মূল কথা রাসেলের ভাষায় Aquinas replies that God knows singulars as their cause; that He knows things that do not yet exist, just as an artificer does when He is making some thing; that he knows future contingents , because He sees each thing in time as if present. He wills and that He knows as infinity and that he knows an infinity of things, although we can not do so. He knows trivial things, because nothing is wholly trivial, and every thing has nobility; otherwise God would know only Himself. Moreover the order

of the Universe is very noble and this can not be known without knowing even the trivial parts. Finally God knows evil things because knowing anything good involves knowing the opposite evil.[21]

এরপর একুইনাস বলেন, ঈশ্বরের মধ্যে ইচ্ছা শক্তি বিদ্যমান। তিনি নিজেই জ্ঞান সুতরাং তিনি অবশ্যই ইচ্ছা শক্তির অধিকারী। শুধু তাই নয় বরং ইচ্ছা শক্তিই তাঁর সারসত্তা। ৭২-৮৮ অধ্যায় পর্যন্ত তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা নিয়ে আলোচনা করেন। ঐশী ইচ্ছার প্রধান উদ্দেশ্য ঐশী সারসত্তা। তিনি অন্যসব জিনিসের উপর একক ইচ্ছা দ্বারা কর্তৃত্ব করেন। তাঁর ইচ্ছার বহুমূখীতার কারণে তাঁর সরলতা ও একত্বের মধ্যে কোনো বিরোধ সৃষ্টি হয় না। এমনকি যে সব জিনিসের এখনো অস্তিত্ব ঘটেনি সেসব বিষয়ে উপরও তার ইচ্ছা শক্তি বিদ্যমান। নিজস্ব সত্তা ও ভালোত্বের কারণেই তিনি ইচ্ছা করেন। তবে তাঁর ইচ্ছা কোনো আবশ্যিক নয়। তিনি স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির অধিকারী। তাঁর ইচ্ছার জন্য যুক্তি প্রয়োগ করা যায় কারণ ব্যবহার করা যায় না। অসম্ভব জিনিসের ব্যাপারে তিনি ইচ্ছা করেন না। যেমন, তিনি সত্যকে মিথ্যা বলেন না। ৮৯ অধ্যায়ে তিনি বলেন, ঈশ্বরের মধ্যে কোনো কিছুর প্রতি তৃষ্ণা বা ক্ষুধার আকাক্ষা নেই। কারণ যদি এমন কিছু থাকত তাহলে তাঁকে দৈহিক আকার ধারণ করতে হত এবং তা হত অন্য জিনিসের প্রতি। সুতরাং এটা অসম্ভব।

৯০-৯৫ অধ্যায়ে তিনি ঈশ্বরের পূর্ণতা, নৈতিকতার আদর্শ এসব বিষয় ব্যাখ্যা করেন। কিছু আকাঙ্খা আছে যেগুলো ঈশ্বরের জন্য উপযুক্ত না হলেও ঐশ্বরিক পূর্ণতার জন্য অপ্রাসঙ্গিক নয়। যেমন, আনন্দ ও ভালোবাসা। ঈশ্বর যেহেতু সর্বোচ্চ পূর্ণ সত্তা তাই এই গুণ অবশ্যই থাকবে। তিনি নিজেকে এবং অন্যসব জিনিসকে ভালোবাসেন। যত প্রকার সদগুণ আছে তার সবকটি তাঁর মধ্যে আছে এবং পূর্ণতম আকারে আছে। তাঁর গুণ তাঁর অভ্যাস নয়; সারসত্তা। অভ্যাস অপূণাঙ্গ তাই এটা ঈশ্বরের সাথে যুক্ত হতে পারে না। সমস্ত নৈতিক গুণের আধার তিনি। তাঁর মধ্যে আছে চিন্তা বা ধ্যানমূলক সদগুন। ঈশ্বর মন্দ ইচ্ছা করতে পারেন না। কোনো কিছুকেই তিনি ঘৃণা করেন না।

অনিবার্যভাবে ঈশ্বর জীবন্ত সত্তা। কারণ তিনি উপলব্ধি করেন ও ইচ্ছা করেন। আর এ দুটি কাজ জীবন্ত সত্তাই কেবল করতে পারে। তাঁর জীবন তাঁর মাধ্যমেই এসছে, অন্য সব জীবন্ত প্রাণি তার মাধ্যমে এসেছে। ঈশ্বরের জীবন চিরস্থায়ী। ঈশ্বর পরম পবিত্র, তাঁর মধ্যে অপবিত্র কিছু নেই। সর্বোচ্চ বুদ্ধি দিয়ে তিনি সব কিছু

উপলব্ধি করেন এবং এতে তাঁর কোনো সমস্যা হয় না। এজন্যই তিনি পবিত্র। ১০১ তম খন্ডের শিরোনাম হলো That the perfect and unique blesednes of God excels every other blesedness.

গ্রন্থটির ২য় খন্ড Creation বা সৃষ্টি নিয়ে। তাঁর মতে সৃষ্টি জগতের চিন্তা ঐশ্বরিক বিশ্বাসের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়। ঈশ্বরের কাজ সম্পর্কে অনুধ্যান আমাদেরকে তাঁর প্রজ্ঞার সাথে, তাঁর অসীম শক্তি ও ক্ষমতার সাথে, মানুষের আত্মাকে ঈশ্বরের শুভত্বের ভালোবাসার সাথে পরিচিত করে। ঈশ্বরের পূর্ণতার নির্দেশ করে। খ্রিস্টীয় বিশ্বাস তৈরীতে সৃষ্টিজগতের চিন্তা প্রমাণিত সত্য। এভাবে ঈশ্বর সম্পর্কে ভুল ধারণাও দূর করে।দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ববিদদের মধ্যে সৃষ্টিজগৎ নিয়ে ভিন্নমত রয়েছে। দার্শনিকদের কেউ বলেন, জগৎ আগুন থেকে, কেউ বেলে মাটি থেকে, কিন্তু ধর্মতত্ত্ববিদদের মতে ঈশ্বর শূন্য থেকে জগৎ সৃষ্টি করেন।[২২] সৃষ্টি জগতের মাধ্যমেই ঈশ্বরকে চেনা যায়। সমস্ত উত্তাপের কারণ যেমন আগুন তেমনি সৃষ্টি জগতের কারণ ঈশ্বর। কিন্তু ঈশ্বরের কোনো কারণ নেই। তিনি নিজেই তাঁর exsence বা সার সত্তা কিংবা being. কোনো মানুষের মধ্যে সৃষ্টিকরার ক্ষমতা নেই। সৃষ্টির কাজটি শুধুমাত্র ঈশ্বরের।[২৩] ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। তিনি প্রাকৃতিক নিয়মের ভিতরেই সৃষ্টি করেন। আত্মা বিহীন মানুষ তিনি সৃষ্টি করতে পারেন না। তিনি যা করেন তার জন্য কোনো মডেল বা নমুনা নেই, তাঁর প্রজ্ঞাই সব। আমরা শূন্য থেকে কিছুই আবিষ্কার করতে পারি না। আমরা বলতে বাধ্য প্রতিটি জিনিসই ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল থাকবে এটা আবশ্যক নয়। সৃষ্টিজগৎ সবসময় অস্তিত্বশীল, কিন্তু তিনি কারো উপর নির্ভর করে না। (৩২-৩৮) অধ্যায় যারা সৃষ্টি জগতকে চিরন্তন বলেন। তাদের বিরুদ্ধে তিনি যুক্তি দেন। তাঁর মতে সৃষ্টি জগতকে চিরন্তন বললে ঈশ্বরের অনুরূপ হয়ে পড়ে। অথচ ঈশ্বর এগুলো সৃষ্টি করেন। কোনো অসত্য অস্তিত্বশীল হতে পারে না।

৪৭-৫৩ অধ্যায়ে তিনি আত্মা প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। মানুষের আত্মাকে তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করেন। এরিস্টটলের Ethics গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন আত্মা দেহ যুক্ত (৫৬)। দেহের প্রতিটি অংশেই সমগ্র আত্মা বিদ্যমান (৭২)। মানুষের আত্মা অমর কিন্তু মানবেতর প্রাণির আত্মা অমর নয়। মানুষের আত্মা তার কাজের জন্য দায়ী। আত্মাকে স্বাধীন নির্বাচন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। (৪৮)। প্লেটোর সমালোচনা করে তিনি বলেন, প্লেটো আত্মাকে দেহ থেকে প্রথক মনে করতেন। যেমন একটি জাহাজে একজন নাবিক থাকেন। কিন্তু এটা সঠিক নয়। একজন মানুষের কেবল একটি আত্মাই থাকতে পারে। কিন্তু একটি জাহাজের অনেক নাবিক থাকতে পারে। কিন্তু একজন মধ্যে ভীতি, ক্রোধ, সংবেদন ইত্যাদি ঘটলেও তা একটি দেহের মধ্যেই ঘটে।

আত্মাকে পৃথক করলে প্রতিটি ঘটনার জন্য পৃথক পৃথক সত্তা প্রয়োজন। তাই প্রমাণিত হয়- একটি আত্মা একটি দেহের সাথে যুক্ত থাকে। এরিস্টটল অনুসারে তিনি বলেন আত্মা হচ্ছে দেহের আকার (form) । আলেকজান্ডার গ্যালেন প্রমুখের আত্মা সম্পর্কিত ধারণা বাতিল করে তিনি বলেন, কোনো ধরণের মাধ্যম ছাড়াই আত্মা ও দেহ সংযুক্ত থাকে। ৭৩ অধ্যায় তিনি ইবনে রুশদের ধারনার জবাব দেন, তাঁর মত ছিল এক বুদ্ধি সব মানুষের মদ্যে বিদ্যমান, একথা সঠিক নয়। কারণ শুক্রানুর সাথে আত্মা সঞ্চারিত হয় না। (৮৬), প্রতিটি মানুষের মধ্যেই আত্মা নতুনভাবে সৃষ্টি করা হয। ৭৪ অধ্যায়ে তিনি ইবনে সিনার মত খন্ডন করেন। ইবনে সিনার মত ছিল এরিস্টটল বিরোধী মানুষের আত্মা উচ্চতর কর্তার (agent) কাছে গমন করে। এটা সঠিক নয়। কারণ আত্মা ঈশ্বরের Substance এর কোনো অংশষ নয়।

গ্রন্থের তৃতীয় খন্ডের শিরোনাম Providence বা ঐশ্বরিক আদেশ। এই অংশে নৈতিকতার আলোচনার উপর তিনি জোর দেন। তিনি বলেন প্রতিটি জীবই একটি চিরন্তন উদ্দেশ্যে নিয়োজিত। আর সেই উদ্দেশ্য হলো শুভ। প্রতিটি সৃষ্টিজীব এই শুভের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। অশুভ কোনো সৃষ্টির গন্তব্য নয়। অশুভের কোনো সারসত্তা নেই। কোনো মানুষের ডানা নেই এটা অশুভ নয়। আকর্ষণীয় চুল নেই এটাও অশুভ নয়। কিন্তু যখন বলা হবে তবে হাত নেই তন সেটা হবে অশুভ। এর অর্থ মানুষের মধ্যে যা থাকার কথা বা থাকা উচিত সেটা না থাকাই হলো অশুভ। পিথাগোরাসের মত ছিল ভালো ও মন্দ দুটি জিনিসই আদি নীতি মালা। এরিস্টটলও তাই মনে করতেন। একুইনাস বলেন, যদিও এরিস্টটল এটা স্বীকার করেন, তবে এর কারণ তিনি প্রচলিত মতের উদ্ধৃতি দেন। প্রকৃত পক্ষে ভালোই হচ্ছে মন্দের কারণ। মন্দের যেহেতু কোনো সারসত্তা নেই তাই এগুলো ভালোর উপরই নির্ভরশীলকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করতে পারে না। evil এর সর্বোচ্চ স্তর নেই, যেখান থেকে অন্যান্য evil বা মন্দ উৎসারিত হবে।

২৭ অধ্যায় তিনি বলেন, মানুষের প্রকৃত সুখ দৈহিক আনন্দের মধ্যেই থাকে না যা খাবার পানীয় ও যৌনক্রিয়ার মধ্যে প্রধানত পাওয়া যায়। পরম সুখ (felecity) সম্মানের মধ্যেও নেই। গৌরবে, সম্পদে, পার্থিব ক্ষমতায়, দৈহিক স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য-শক্তির মধ্যে, দূরদর্শিতা, শৈল্পিক কাজ- এসবের কোনোটির মধ্যেই পরম সুখ নেই। পরম সুখ ঈশ্বরের অনুধ্যানে। অধিকাংশ মানুষ ঈশ্বর সম্পর্কে যা জানে তাতেও পরম সুখ নেই। প্রমাণ দ্বারা প্রাপ্ত ঈশ্বরের জ্ঞানেও নেই, বিশ্বাসের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানেও পরম সুখ সম্ভব নয়। প্রকৃত পক্ষে পার্থিব জীবনে ঈশ্বর

সম্পর্কে আমরা পূর্ণরূপে জানতে পারি না, তাই এখানে পরম সুখ সম্ভব নয়। এই জীবনে আমরা ঈশ্বরকে তার সারসত্তাসহ দেখতে পারি না। কেউ প্রাকৃতিক শক্তির মাধমে ঈশ্বরকে দেখতে পারে না।

৫০ অধ্যায়ে তিনি বলেন, ঈশ্বর সবকিছুর উপর কর্তৃত্ব করেন তার Providence বা ঐশ্বরিক আদেশের মাধ্যমে। এটাই ছিল এই খন্ডের মূল শিরোনাম। তাঁর ঐশ্বরিক ক্ষমতার বাইরে কেউ কিছু করতে পারে না। (৬৪) তিনি সর্বত্র আছেন। ঐশ্বরিক বিধান সম্পূর্ণরূপে অশুভকে বর্জন করে না, সম্ভাব্যতা, ইচ্ছার স্বাধীনতা, ভাগ্য ও সুযোগকেও বাতিল করে দেয় না। ঐশ্বরিক বিধান পরনির্ভরশীল সকল বিশেষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ঐশ্বরিক বিধানের পরিপূর্ণতা ঘটে গৌন কারণ সমুহের মাধ্যমে। অন্যসব সৃষ্টিজগতের উপর ঈশ্বর-বিধান চলে বুদ্ধিমান সৃষ্টি (intellectual creatures) দ্বারা। অর্থাৎ যা অপেক্ষকৃত নিম্ন স্তরের সেগুলোর উপর উচ্চতর প্রাণির কর্তৃত্বের মাধ্যমে ঐশ্বরিক বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়। (৭৯)। আর সেক্ষেত্রে ফেরেশতাগণ (দেবদূত) সে কাজ করে থাকেন। এদের মাধ্যমেই ঈশ্বর জগত পরিচালনা করেন। মানুষের কর্ম ও ইচ্ছার স্বাধীনতা ঐশ্বরিক বিধানের অধীন। ৯৩ অধ্যায়ে- তিনি ভাগ্য সম্পর্কে বলেন। ভাগ্যকে অস্বীকার করা মানেই ঐশ্বরিক বিধানকে অস্বীকার করা। ঐশ্বরিক বিধানের মধ্যে কোনো অনিশ্চয়তা নেই। ঐশ্বরিক বিধানের অপরিবর্তনীয়তা আবার প্রার্থনার মূল্যকে কমিয়ে দেয় না বা বাতিল করে। কিছু প্রার্থনা ঈশ্বর কর্তৃক অনুমোদিতও নয়। তবে ঈশ্বর প্রকৃতির বিরোধী কিছুই করেন না।

১০১ অধ্যায়ে তিনি Miracle বা অলৌকিকত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাঁর মতে Things that are at times divinely accomplished, apart from the generall established order in things are customarily called miracles.[25] আমরা কিছু জিনিস দেখে আশ্চর্য হই; এর কারণ খুজে পাই না। এগুলোই অলৌকিক। এই কাজগুলো ঈশ্বরই কেবল ঘটান, এখানে অন্য কেউ অংশগ্রহণ করতে পারে না। কোনো সৃষ্টিই প্রাকৃতিক বিধানের ব্যতিক্রম করতে পারে না। কিন্তু তিনি ছাড়া। অন্যদিকে যাদুকরগণ (magician) বিভিন্ন আশ্চর্যজনক কাজ দেখান। এগুলো অলৌকিক নয়। যাদুকরদের মাধ্যমে সুখ পাওয়ার চেষ্টাকে তিনি অশুভ বলেন। শয়তান (demon) প্রসঙ্গে বলেন। এরাই পাপ সংঘটিত হতে সাহায্য করে।ঐশ্বরিক বিধানের উদ্দেশ্য ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা। ঐশ্বরিক আদেশই আমাদেরকে প্রতিবেশির সাথে ভালোবাসতে বলে। এর মাধ্যমেই মানুষ সঠিক বিশ্বাসে বিশ্বাসী হতে পারে।

১২২ অধ্যায়ে তিনি ব্যভিচার ও বিবাহ প্রসঙ্গে বলেন। ব্যভিচার পাপ ও বিবাহ প্রাকৃতিক। যারা মনে করে একজন পুরুষ অন্য একজন অবিবাহিত নারীর সাথে তার সম্মতিক্রমে মিলন বৈধ তা কোনো ভাবেই সঠিক নয়। কারণ ঈশ্বর প্রতিটি মানুষকে তার উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য শুভ পন্থা নির্ধারণ করেছেন। আর এ ধরনের কাজ কোনো ব্যক্তির জন্য শুভ নয়। একমাত্র বিবাহের মাধ্যমেই নারী পুরুষের মিলন হতে পারে। এটাই প্রাকৃতিক। যদি বিবাহ ছাড়া মিলন হয় তাহলে সন্তানের পিতৃত্ব নিয়ে ও সমস্যা হতে পারে। যা অন্যান্য পশু, যেমন কুকুর, বিড়াল, ছাগল ইত্যাদির ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নয়। বিবাহ একটি স্থায়ী সম্পর্ক এবং বিবাহ একজন পুরুষ ও একজন নারীর মধ্যেই হবে। সন্তানের শিক্ষার ক্ষেত্রে পিতার ভূমিকা বেশি। একজন স্ত্রীকে তিনি স্বামীর অধীন মনে করেন , তবে সে লক্ষ্য হবে বন্ধুত্বপূর্ণ। নিকটাত্মীয়ের সাথে বিবাহ অনুচিত। সমস্ত যৌন মিলন পাপ কার্য নয়।স্বেচ্ছা দারিদ্র্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দারিদ্র্য পাপের উপলক্ষ্য। মধ্যম পন্থার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত। তবুও কেউ স্বেচ্ছায় যদি সেটা অবলম্বন করেন তবে তাতে কল্যাণ আছে। (c-133-3)যদি এর মাধ্যমে পাপ থেকে বাঁচা যায়, যেমনটি সম্পদের কারণেও থাকতে পাওে; তবে সম্পূর্ণরূপে এই সংযম অবলম্বন ভালো নয়। (১৩৬) এবং জীবনব্যাপী এটা অবলম্বন ভ্রান্ত কাজ।মানুষের কাজের শাস্তি বা পুরস্কার ঈশ্বরই দিবেন। তিনি বিভিন্ন শাস্তির কথা বলেন এবং সব শাস্তি ও পুরস্কার সমান নয়। তাঁর মতে মানুষের সুখের জন্য ঐশ্বরিক সাহায্য প্রয়োজন। কেউ যদি পাপের কারণে ঈশ্বরের করুণা বঞ্চিত হয়, আবার ঈশ্বরের ইচ্ছায় সে করুণা প্রাপ্তও হতে পারে। একমাত্র করুণা প্রাপ্তি ছাড়া কেউ পাপ মুক্ত হতে পারে না। ঈশ্বর মানুষের পাপের কারণ নন।

৪র্থ খন্ড আলোচিত হয়েছে মুক্তি (Salvation) সম্পর্কে। এই অধ্যায়ে তিনি মূলত খ্রিস্টান ধর্মের মূলনীতিগুলো যুক্তি দিয়ে উপস্থাপনের চেষ্টা করেন। ঈশ্বরের ত্রিত্ব, আদি পাপ, পবিত্র আত্মা, প্রভৃতির আলোচনা এখানে এসেছে। আদি পাপ কীভাবে একজন থেকে অন্য জনে সঞ্চারিত হয়, ব্যাপ্টিজম, পিতা, পুত্র, পবিত্র আত্মা (Father, the Son, the Holy Spirit) পুনরুত্থান ও শেষ বিদায় নিয়েও ও তিনি এখানে আলোচনা করেন। শাস্তিভোগ ও প্রতিদান কীভাবে সম্ভব তা নিয়েও তিনি এখানে বর্ণনা দেন। তাঁর মতে পাপাত্মারা মুক্তি পাবে না।

পর্যালোচনাঃ

একুইনাসের দর্শন সহজ কথায় এরিস্টললের নতুন সংস্করণ। বার্ট্রান্ড রাসেল[২৬] মনে করেন, একুইনাস সক্রেটিস- প্লেটোর মত যুক্তির অনুসরণ করেননি এবং যুক্তি অনুসরণ করে যেকোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেননা। তিনি বাইবেলের বিশ্বাসকেই দর্শনে স্থাপনের চেষ্টা করেন। তাছাড়া একুইনাস শিশু শিক্ষার

জন্য মাতার চেয়ে পিতার ভূমিকাকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে যে মত দেন, রাসেল সেটারও সমালোচনা করেন। পিতার শারীরিক শক্তি বেশি সেজন্য সন্তানকে শাস্তি দেয়া ও শাসন করার ক্ষেত্রে পিতার ভূমিকার প্রশংসা করেছিলেন একুইনাস। কিন্তু রাসেল মনে করেন এটা ছিল ভুল ধারণা। রাসেল বলেন, যে ধরনের শাস্তিতে অধিক শারীরিক শক্তির প্রয়োজন হয়, সে ধরনের শাস্তি শিশুর জন্য কাম্য নয়। একুইনাস খুব স্বল্প সময় জীবিত ছিলেন। এই অল্প সময়ে তাঁর জ্ঞানের পরিপক্কতা আসেনি বলেও কেউ কেউ মনে করেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি ধর্মীয় বিশ্বাসকেই যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন।

একুইনাসকে রাসেল আবার কান্ট-হেগেলের চেয়ে বেশি প্রভাবশালী মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে একুইনাস ছিলেন প্রচন্ড মেধা শক্তির অধিকারী। তাকে অনুসরণকারী খ্রিস্টান দার্শনিকদের টমিস্ট বলা হয়। এরিস্টটলের বিভিন্ন পুস্তক অনুবাদ করে সেগুলোর উপর টীকা লেখা তাঁর মৌলিক অবদান। তাঁর পূর্বসূরী অগাস্টিনের মত তিনিও একনিষ্ঠ খ্রিস্টান ছিলেন। কিন্তু পার্থক্য হল অগাস্টিন প্লেটোকে সবচে বড় দার্শনিক বলেন আর একুইনাস বলেন এরিস্টটল। উভয়ের অবদানই দর্শনে বিরাট।

তথ্য নির্দেশ:

1. http://Plato. Stanford.edu/entries/aquinas
2. Webbear, A, History of Philosophy (tr. F. Thilly), New York, 1905, P. 246
3. বার্ট্রান্ড রাসেল, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস [প্রাচীন ও ক্যাথলিক দর্শন: নির্বাচিত অংশ]*, (অনুবাদ- প্রদীপ রায়), ঢাকা, নিউ এজ পাবলিকেশন, পৃ-২১৭
4. প্রাগুক্ত, পৃ: ২১৬
5. Aquinas, Summa Theologica, Ques. 2, P. 10-14
6. Ibid, P. 15
7. Ibid, P. 16
8. Aquinas, SummaContragentiles, Book-1, Chap-1, Part-1
9. Ibid, Book-1, Chap-2, Para-1
10. Ibid, Chap-4, Para-3
11. Ibid, Para- 7-8
12. Ibid, Chap- 14, Para-1
13. Ibid, Chap- 15, Para- 1,2
14. Ibid, Chap-17 , Para- 1,3
15. Ibid, Chap- 20, Para- 1
16. Ibid, Chap- 28, Para- 1-10
17. Ibid, Chap- 39, Para- 1-5
18. Ibid, Chap- 42, Para- 20-21
19. Ibid, Chap- 50

২০. Ibid, Chap- 55, Para- 3-5
২১. Ibid, Chap- 59-62
২২. বার্ট্রান্ড রাসেল, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস [প্রাচীন ও ক্যাথলিক দর্শন: নির্বাচিত অংশ]*, (অনুবাদ- প্রদীপ রায়), নিউ এজ পাবলিকেশন, ঢাকা, পৃ- ৪৭৯
২৩. Contragentilies, Book-2, Chap-4
২৪. Ibid, Chap- 21
২৫. Ibid, Book-3, Chap-1
২৬. বার্ট্রান্ড রাসেল, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস [প্রাচীন ও ক্যাথলিক দর্শন: নির্বাচিত অংশ*, পৃ২২৬-২৮

Dhaka University Institutional Repository

৩. ব্রাডলি

সমকালীন দর্শনের ইতিহাসে এফ.এইচ. ব্রাডলি[১] (১৮৪৬-১৯১৪) একটি বিখ্যাত নাম । প্রচন্ড জড়বাদী দর্শনের যুগে তিনি ভাববাদের পক্ষে যে জোরালো ভূমিকা রাখেন তা ছিল রীতিমত দুঃসাহসিক কাজ। বৃটিশ চিন্তাধারায় তিনি খ্যাতির উচ্চ শিখরে আরোহন করেন। ব্রাডলির জন্ম ৩০ জানুয়ারি ১৮৪৬ সালে লন্ডনের ক্লাফামে ।পিতা চার্লস ব্রাডলি ও মাতা ঈ'মা লিন্টনের ৪র্থ এবং জীবিত জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন এফ.এইচ. ব্রাডলি। পিতা চার্লস ব্রাডলির সাথে তৎকালীন বৃটিশ রাজবংশের সম্পর্কের সুবাদে ঔপনিবেশিক শাসনামলে একসময় তিনি বাংলার গর্ভনর জেনারেল ছিলেন, তাছাড়া সিয়েরালিওনের গর্ভনর হিসেবেও ছিলেন কিছু দিন। তৎকালীন বৃটিশ পার্লামেন্ট সদস্য এবং ঔপনিবেশিক কার্যক্রমের স্থায়ী প্রধানও ছিলেন চার্লস ব্রাডলি।

১৮৫৬ সালে এফ.এইচ. ব্রাডলি শেলটেনহাম কলেজে ভর্তি হন। ১৮৬১ সালেMarlborough College এ স্থানান্তরিত হন। ১৮৬২-৬৩ সালে তিনি মারাত্মক টাইফয়েড পরে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। ১৮৬৫ সালে একজন গবেষক হিসেবে তিনি অক্সফোর্ডের ইউনিভার্সিটি কলেজে যোগদান করেন। সেখানে বিখ্যাত প্লেটো পন্ডিত এ.ই. টেইলর তরুণ ব্রাডলিকে দেখে অত্যন্ত আশান্বিত হন। কয়েকবার চেষ্টার পর ১৮৭০ সালে তিনি অক্সফোর্ডের metron college এর ফেলোশিপ লাভ করেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এখানেই তিনি কাটিয়ে দেন। ১৮৭১ সালের জুনে তিনি কিডনি সমস্যা, ঠান্ডাজনিত রোগ প্রভৃতি কারণে কিছুদিন অবসর জীবন যাপন করেন। এরপর আবার তাঁর কলেজে যোগদান করেন, তবে মানুষের সাথে সংস্পর্শ একেবারে কমিয়ে দেন। কলিংউড তাঁর আত্মজীবনীতে লেখেন, "আমি ব্রাডলির মাত্র কয়েকশ গজ দূরে জীবনের ১৬ বছর কাটিয়েছি, কিন্তু আমার জানামতে কখনো তাঁর উপর আমার চোখ পড়েনি।" কিন্তু একজন ভগ্ন স্বাস্থ্যের অধিকারী সত্ত্বেও ব্রাডলির কর্ম ও খ্যাতি ছিল অবিস্মরণীয়। ১৮৮৩ সালে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে সম্মান সূচক LLD উপাধি দেওয়া হয়। ১৯২১ সালে রয়েল ডেনিশ একাডেমির সদস্যপদ ও ১৯২৩ সালে তিনি ব্রিটিশ একাডেমির সম্মান সূচক ফেলোশীপ লাভ করেন। ১৯২৪ সালে রাজা পঞ্চম জর্জ ১ম একজন দার্শনিক হিসাবে তাঁকে Order of Merit সম্মাননায় ভূষিত করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলীর কয়েকটি হচ্ছে Appearance and Reality, The Pre- supposition of critical History, Ethical studies, Principles of Logic, Essays on truth and Reality প্রভৃতি।

Dhaka University Institutional Repository

ব্রাডলির অধিবিদ্যা

আমরা প্রথম অধ্যয়ে এই বিষয়ে বলেছিলাম, হেগেলীয় ভাববাদের প্রভাবে যে কজন দার্শনিক সবচে প্রভাবিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে একজন এফ.এইচ. ব্রাডলি। ব্রাডলি নিজেকে হেগেল-পন্থী না বললেও হেগেলীয় আদর্শকেই তিনি বেশি গ্রহণ করেন। ব্রাডলির আধিবিদ্যক আলোচনা এসেছে তাঁর বিখ্যাত Appearance and Reality গ্রন্থে। ১৮৮৩ সালে তিনি মিল অনুসারীদের বিপরীতে Principles of Logic গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ প্রকাশের পরই তিনি Appearance and Reality লেখার কাজ শুরু করেন যা ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটির উপর ভিত্তি করেই আমরা তাঁর আধিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করব।

গ্রন্থটিকে তিনি দুটি অংশে ভাগ করেছেন। Appearance (অবভাস) এবং Reality (বাস্তবসত্তা)। মোট ২৭ টি অধ্যয়ের প্রথম ১২ টিতে এসেছে Appearance সংক্রান্ত নৈতিবাচক আলোচনা এবং বাকী ১৫ টি অধ্যায়ে এসেছে Reality বা বাস্তবসত্তা সংক্রান্ত ইতিবাচক আলোচনা। গ্রন্থের শুরুতেই গুরুত্বপূর্ণ Introduction আছে যেখানে অধিবিদ্যার সংজ্ঞা, অধিবিদ্যা বিরোধী কিছু যুক্তি খন্ডনসহ অধিবিদ্যা সংক্রান্ত একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেন। অধিবিদ্যার পরিচয় সম্পর্কে তিনি বলেন, অধিবিদ্যা হচ্ছে অবভাসের বিপরীতে বাস্তব সত্তাকে জানার প্রয়াস, আদি নীতিমালা বা পরম সত্য কিংবা বিশ্বজগৎকে জানার একটি প্রচেষ্টা, খন্ড খন্ড বা আংশিক ভাবে নয় বরং সামগ্রিক ভাবে। অধিবিদ্যার বিরুদ্ধে এখানে প্রচলিত ৩টি আপত্তি ও তার জবাব দেন। সেগুলো হলোঃ

১। এটা যে জ্ঞান পেতে চায় তা সম্পূর্ণভাবে অর্জন অসম্ভব।

২। যদি কিছু অর্জন সম্ভবও হয় তবু তা অপ্রয়োজনীয়।

৩। অধিবিদ্যায় নতুন কোন জ্ঞান নেই । প্রাচীন দর্শনের বাইরে কিছু নেই এখানে।[২]

এর উত্তরে তিনি বলেন, যিনি মনে করেন অধিবিদ্যার জ্ঞান অসম্ভব তার প্রতি আমাদের বলার কিছু নেই। তবে আদি নীতিমালার ব্যাপারে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী তত্ত্বসহ তিনি একজন brother metaphysician এবং হয়ত অজ্ঞতা বশত: তিনি এই বিচরণ ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন। ব্রাডলি বলেন, To say the reality is such that our knowledge can not reach it,is a claim to know reality, to urge that our knowledge is of a kind which must fail to transcend appearance, it self implies that

transcendence. For, if we had no idea of a beyond, we should assuredly not know how to talk about failure or success.[৩]

তিনি আরো বলেন, যাকে আমরা সবচেয়ে সফল মনে করি, যিনি সর্বাধিক মেধার অধিকারী তিনিও কখনো বলেন না। তিনি জানেন বরং বলেন , জানার চেষ্টা করছেন। সেজন্য অবশ্য আমি মনে করি না সন্তোষজনক জ্ঞান সম্ভব, তবে আংশিকভাবে সন্তোষজনক হওয়া যাবে। আমি অত্যান্ত দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করি, পরম সত্তা সর্ম্পকে আমাদের জ্ঞান আছে নিশ্চিত ও বাস্তব জ্ঞান যদিও আমি নিশ্চিত আমার উপলব্ধি অপূর্ণ।[৪] অত্যন্ত জোর দিয়ে তিনি বলেন, আমি অবশ্যই আপত্তিকারীকে বলব, তাঁর চোখ খোলা উচিত এবং মানব প্রকৃতির চিন্তা করা উচিত। বিশ্বজগৎ সর্ম্পকে চিন্তা না করে কি থাকা সম্ভব? আমি বলিনা যে, সবাইকে অসচেতন বা অসচেতনভাবে এক পদ্ধতির অনুসারী হতে হবে। আমি বলতে চাই বিবিধ কারণেই প্রতিটি মানুষ বিস্মিত হতে ও চিন্তা করতে বাধ্য। And so when poetry art and religion have ceased wholly to interest or when they show no longer any technology to struggle with ultimate problems and to come to an understanding with them ; when the sence of mystery and enhantment no longer draws the mind to wonder aimlessly and to love it knows not what, when in short twlight has no charm the metaphysics will be worthless.[৫]

আপত্তিকারীর উদ্দেশ্যে তিনি আরো বলেন, হয় তাকে সব জিনিসের মূল এর চিন্তা করাকে নিন্দা করতে হবে এবং যদি তিনি তাই করেন তাহলে তিনি মানব প্রকৃতির সবচেয়ে বড় দিককেই আঘাতের চেষ্টা করবেন, অন্যথায় তিনি আমাদের প্রতি সমর্থন দেবেন। এরপর যাঁরা মনে করেন অধিবিদ্যার জ্ঞানে নতুনত্ব নেই তাঁরা অবশ্যই জানেন এবং স্বীকার করেন মানব প্রকৃতি যাকে সত্য এবং মিথ্যা বলে শনাক্ত করে তা চিরন্তন, এতে পরিবর্তন নেই। তাই অধিবিদ্যার নতুন ব্যখ্যা আসলেও এর বিষয়বস্তু ও কাজ একই।

ব্রাডলির অধিবিদ্যার মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে সম্বন্ধ । তিনি প্রমাণ করেন, আমরা যা দেখি ও জানি সবকিছুর মধ্যে পারস্পারিক সম্বন্ধের সম্পর্ক বিদ্যমান। যেসরের মধ্যে এই ধরণের সম্পর্ক বিদ্যমান সেসব জিনিস স্ববিরোধী এবং অবভাস। এর বিপরীতে এমন একটি বাস্তবসত্তা বিদ্যমান যার সাথে কোনে সম্বন্ধের সম্পর্ক নেই, আর সেজন্যই সেটাই পরম বাস্তবসত্তা এবং তাকে আবিষ্কারই তাঁর অধিবিদ্যার উদ্দেশ্য। এই ছিল সংক্ষেপে ব্রাডলির অধিবিদ্যা।

Dhaka University Institutional Repository

আমরা এবার একটু বিস্তারিত বলার চেষ্টা করব।

প্রথম অধ্যায় তিনি শুরু করেন Primary and Secondary qualities (মুখ্য ও গৌণ গুণ) সম্পর্কিত আলোচনার মাধ্যমে। তিনি বলেন, বিষয়টি অনেক প্রাচীন হলেও কোনো জিনিসকে বোধগম্য করার জন্য এর আলোচনা প্রয়োজন। প্রাথমিক ও মুখ্য গুণকে তিনি জন লকের মত দৈশিক বলেন আর গৌণ গুণকে বলেন বিস্তৃতি। গৌণ গুণ মুখ্য গুণ ছাড়া অস্তিত্বশীল হতে পারে না। বাস্তবে রঙিন এমন কিছু নেই। যে চক্ষু এটাকে লাল বলছে আরেকটি চক্ষু এটাকে কালোও বলতে পারে। গরম ও ঠান্ডা ত্বকের উপর নির্ভরশীল। স্বাদ, গন্ধ, জিহ্বা ও নাকের উপর নির্ভরশীল। এভাবে দেখা যায় গৌণ গুণগুলো স্বাধীনভাবে অস্তিত্বশীল হতে পারেনা। সে জন্য এগুলো স্ববিরোধী, তাই অবভাস। ২য় অধ্যয়ে তিনি Substantive and adjective এর আলোচনায় একমুষ্ঠী চিনির উদাহরন দেন। তিনি বলেন, চিনি এমন একটা জিনিস যার উপর গুণ ও বিশেষণ আরোপ করা যায়। যেমন: সাদা, কঠিন, মিষ্টি। চিনির কেবল সাদাত্ব, কঠিনত্ব বা মিষ্টিত্ব নেই। চিনির বাস্তব সত্তা Reality এই ৩টির সমন্বয়। যদি কোনো বিশেষণ ছাড়া আমরা চিনির কল্পনা করি তাহলে হতবুদ্ধি হওয়া ছাড়া আর বিকল্প থাকে না।[৬] এখানে চিনি হচ্ছে Subject আর গুণগুলো Predicate; এর বিপরীতক্রমে ঐ গুণগুলোর কোনো একটিকে উদ্দেশ্য করে এর Predicate খুঁজি তাহলে আমরা চিনি পাবনা। সুতরাং প্রমাণিত হয় সম্বন্ধ ছাড়া আমরা যেমন কিছুর ব্যাখা করতে পারি না, তেমনি সম্বন্ধের ব্যাখ্যাও একধরণের অনবস্থা দোষের সৃষ্টি করে। তৃতীয় অধ্যয়ের শুরুতে তিনি বলেন, অনিবার্য ভাবেই আমরা সম্বন্ধ ও গুণের স্বীকার করছি। যদিও তাত্ত্বিক ভাবে এটা সত্য বাস্তবতা নয় বরং অবভাস। এখানে তিনি দুটি সত্য আবিষ্কার করেন। 1) Qualities are nothing without relation 2) We have found that qualities taken without relation have no intelligible meaning শেষ পর্যায়ে তিনি বলেন পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত আমাদের যে অভিজ্ঞতা তা আসলে সত্য নয় এবং আমাদের সামনের এই বিশাল জগতের নিন্দা না করে আমরা পারি না।[৭]

এর পর ৪র্থ অধ্যায়ে দেশ ও কালের অবাস্তবতার কথা বলেন। তিনি বলেন, এগুলো অবভাস, কারণ যে কোনে স্থানই তার সাথে ঠিক একই ধরণের স্থানের সাথে যুক্ত এবং বর্ধিত স্থানটিও একটি স্থান। এভাবে দেশ বলতে বোঝানো যায় পরস্পর সর্ম্পক যুক্ত কিছু স্থানের সমন্বয়কে। সুতরাং এখানেও সম্বন্ধ ছাড়া আর কিছু নেই।[৮] একই ভাবে সময়ও সম্বন্ধের সমন্বয়। সময়কে যদি এ-সি-ই এভাবে ভাগ করি তাহলে এর মধ্যে এ-বি-সি-ডি-ই এভাবে পাওয়া যাবে। আবার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত এভাবেও সময় সম্পর্ক যুক্ত। সুতরাং কালও সমন্ধ ছাড়া

কিছু নয়। তাই দেশ ও কাল বাস্তব নয়, অবভাস। এভাবে তিনি গতি ও পরিবর্তন, কার্যকারণ, সক্রিয়তা ও বস্তুজগৎ সম্পর্কে দেখানোর চেষ্টা করেন, এসব কিছুতেই সম্বন্ধ বিদ্যমান, তাই অবভাস।

বাহ্যিক জগতের বর্ণনার পর তিনি আত্মা সম্বন্ধে বলেন ৯ম ও ১০ম অধ্যায়ে। তাঁর মতে আত্মা সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষের মত হলো, এটা বাস্তব, অবভাস নয়। কিন্তু তিনি যুক্তি দেন এটাও অবভাস, বাস্তব নয়। তাঁর ভাষায় We are all sure that we exit, but in what sense and what character as to that we are most of us in helpless uncertainty and in blind confusion.[9]তিনি মনে করেন আমরা আত্মা সর্ম্পকে যা বলি তা বাস্তব নয়, অবভাস। এ সংক্রান্ত প্রচলিত কয়েকটি মত উপস্থাপন করে তিনি সেগুলোর খন্ডন করেন।

আমরা একটা বিশেষ মুহুর্তের কথা ভাবতে পারি। যেমন- আমাদের অনুভূতি, চিন্তা, সংবেদন এগুলো সৃষ্টি হয় বস্তু জগত , অন্যান্য মানুষ এবং আমাদের নিজেদের মাধ্যমে। সব জিনিসকে আমরা এভাবেই দেখি। এতে আমি নিজের সর্ম্পকে যা বলতে পারি এটাই আত্মা। কিন্তু ব্রাডলি বলেন এটা সঠিক ব্যাখা নয়। আবার কেউ বলেন, একজন মানুষ মাছ খেলে যেমন সেটা তার পেটে অবস্থান করে আত্মা ও ঠিক এধরনের দেহের অভ্যন্তরীণ জিনিস। ব্রাডলি এটাকেও সঠিক ব্যাখ্যা বলেন না। আবার যাঁরা বলেন মানুষের স্বাভাবিক আচরণ ও কোনো কিছুর প্রতি তার যে আচরণ তার মাধ্যমেই আত্মার প্রকাশ ঘটে। ব্রাডলি বলেন, A man`s true self, we should be told, can not depend on his relations to that which fluctuates. And fluctuation is not the word. For in the life time of a man there are irreparable changes.[10]তিনি বলেন যদি কোনো বিপদ, মৃত্যু, ভালোবাসা কারো জীবনে আসে তাহলে তাকি একই ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঘটে না। সুতরাং আত্মাকে আচরণের সমষ্টি বললেও সেটা সঠিক নয়।

আবার একজন মানুষের মন সর্ম্পকে এর উপাদান কাঠামো ইত্যাদি আমরা বলতে পারি। কিন্তু তখন অবশ্যই আত্মা কোথায় অবস্থান করে সেটা চেষ্টা করেও পাব না। এটাকে যদি পরিবর্তনের সারসত্তা বলি তাও সঠিক হতে পারে না। কারণ যাকে আমরা সারসত্তা বলব তা আদৌ সারসত্তা হতে পারে না। যেমন, শৈশব, যৌবন, বার্ধ্যক্য, ব্যাধি, পাগলামিতে বিভিন্ন পরিবর্তন দেখা যায়। একদিকে উৎকর্ষতা অন্যদিকে ভোগান্তি, এধরণের বৈপরীত্য আত্মায় থাকতে পারেনা। লাইবনিজের মত আত্মাকে মোনাড বললেও সঠিক হয় না। কারণ, যদি এটাকে মোনাডের মতে অবিভাজ্য একক ধরা হয় তাহলে তা জীবনের সাথে সমান্তরালভাবে অবস্থান করবে।

সেটা হবে চলন্ত। আত্মার এ ব্যাখ্যা সঠিক হতে পারে না। সুতরাং দেখা যায় কেউ আত্মাকে Subjective আবার কেউ Objective বলেন। কেউ মনোবৈজ্ঞানিক এবং কেউ পৃথক সত্তা বলেন এসব কিছুই আসলে পরস্পর নির্ভরশীল ও সম্বন্ধযুক্ত। সুতরাং আত্মা একটি অবভাস।

আবভাসের আলোচনা শেষ করে তিনি বাস্তবসত্তার Reality আলোচনা শুরু করেন। ১৩তম অধ্যায় থেকে ১৫তম অধ্যায় পর্যন্ত তিনি Reality এর বৈশিষ্ট্য ও একত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাঁর মতে Real হচ্ছে যা সন্দেহের উর্ধ্বে অর্থাৎ যা সম্পূর্ণভাবে নিজের মতো এবং নিজের দ্বারা পরিচালিত হয় । এখানে সম্বন্ধের সম্পর্ক না থাকায় কোন স্ববিরোধ নেই। এখন প্রশ্ন আসে এধরণের সম্বন্ধবিহীন কোনো কিছুর অস্তিত্ব আছে কিনা। তিনি বলেন, প্রতিটি অবভাসের পেছনে অবশ্য একটি Reality থাকবে। সুতরাং বাস্তবসত্তাকে অবশ্যই অস্তিত্বশীল হতে হবে। কিন্তু বাস্তবসত্তা কি বহু না এক? তাঁর জবাব, Absolute Reality বহু নয় বরং এক। এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা তা উপলব্ধি করতে পারি।তাঁর ভাষায়, The absolute is one system and (that) its contents are nothing but sentient experience .It will hence be a single and all inclusive experience , which embraces every partial diversity is concord.For it can not be less than appearance , and hence no feeling or thought of any kind can fall out side its limits.[১১] কখনো তিনি বলেন, Real is individual অথবা সম্পূর্ণ নৈতিক ধারণা হিসাবে the real is perfect.[12] তাঁর মতে অ-বিরোধই হচ্ছে বাস্তবসত্তার যাচাই।

হেগেলের কথা হলো ঐশ্বরিক মন অন্য সব মনের ব্যাপারে অবশ্যই চিন্তা করবে এবং জ্ঞানের বস্তুসমূহ নিয়েও চিন্তা করবে। এতে বোঝা যায় পরম বাস্তবসত্তা Absolute Reality সব ক্ষুদ্রতর মনকে ধারণ করে আছে। কিন্তু ব্রাডলির কথা ছিল ভিন্ন। কারণ আমরা যদিও Absolute Reality বা হেগেলের বাস্তবসত্তার সাথে বাহ্যিক সম্পর্ক মুক্ত কিন্তু অভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ থেকে মুক্ত হতে পারি নি। তাই এখানে অংশকে ধারণকারী সমগ্র subject এবং objectএর সমন্বয়। অন্য কথায় এই আত্মা এবং অন্য সব আত্মার সমন্বয়। সুতরাং হেগেল যাকে বাস্তব বলেছেন, ব্রাডলি তাঁকে অবাস্তব বলেছেন। কিন্তু বাস্তবসত্তার অস্তিত্ব তিনি অবভাসের মাধ্যমেই প্রমাণ করছেন।

তাঁর মতে, বাস্তবসত্তার জ্ঞান আমরা কখনো অর্জন করতে পারিনা। আমরা যা জানি সবই একটি ধারণা নির্দেশকারী। বিমূর্ত বিশ্বজগতের চিন্তা থেকে এটা আমাদের মনে এসেছে। এই বিমূর্ত বিশ্বজগৎ আমার মস্তিষ্ক

ছাড়া প্রকৃত পক্ষে অস্তিত্ব লাভ করে না। আমি ঘাসের বিধেয় রূপে যখন সার্বিক সবুজকে উল্লেখ করি তখন আসলে কেউ তা দেখেনা। সার্বিক সবুজ আসলে হালকা, গাঢ়, উজ্জ্বল, পৃথক, সংযুক্ত কোনটিই নয়। প্রকৃতির ক্ষেত্রে এভাবে আমরা পূর্ণাঙ্গভাবে Reality কে জানতে পারি না। আর যেখানে পরিপূর্ণভাবে আমরা জানতে পারি না সেখানে সব সময় ভ্রান্তি থাকে; আমরা জানি না বা জানতে পারি না কতটুকু ভ্রান্তি হয়েছে। এভাবে আমরা একটি উভয় সংকটে পড়ি।আবার যদি আমরা Absolute কে জানতাম তাহলে সে জানাটা প্রকৃত জানা হত না, কারণ তখন তা জ্ঞানের বস্তু হত। আমাদের সব জ্ঞান অনুভূতি ও সম্বন্ধ থেকে পাওয়া। আমরা সম্বন্ধ ছাড়া অন্যের অনুভূতি সর্ম্পকে জানতে পারি না। সুতরাং আমাদের চিন্তা Reality সর্ম্পকে সঠিক ধারণা দিতে পারি না।এভাবে দেখা যায় ব্রাডলির যুক্তি এক ধরণের অজ্ঞেয়বাদের দিকে আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে। যেমনটি হাবার্ট স্পেনসারে আমরা দেখেছি। তাঁর কথা ছিল আমরা Absolute কে জানতে পারিনা। স্পেনসারের কথা ছিল Absolute torth আমরা পেতে পারি না, ব্রাডলি বলেন There is no such thing as absolute truth all truth is and must be partially false.

তবে ব্রাডলিকে অজ্ঞেয়বাদী বলা যায় না। কারণ তিনি এটাও বলেন, There is no truth can not be wholly true কিন্তু সব truth সমানভাবে মিথ্যা নয়। সত্যের কিছু Degree আছে, Reality এরও কিছু degree আছে। জড় সম্পূর্ণভাবে বাস্তব নয় কিন্তু তা ভ্রান্ত পর্যবেক্ষণ নয়। স্পেনসারের সাথে তাঁর আরেকটি পার্থক্য হল আমরা বাস্তবসত্তার পূর্ণ জ্ঞান না পেলেও তাকে জানার প্রচেষ্টাই আমাদের কাজ। রাশডালের মতে, ব্রাডলির মধ্যে ভাববাদ, স্পিনোজাবাদ এবং রূপবাদের সমন্বয়ে ঘটেছে। স্পিনোজা বলেছিলেন আমাদের সমস্ত জ্ঞাত সচেতন অভিজ্ঞতা সবই একটি দ্রব্যের বিধেয় যাকে আমরা জানি না, কিন্তু তা আড়াল থেকে কথা বলে চিন্তাশীল সত্তা ও চিন্তার বস্তুর সাথে। অন্যদিকে ব্রাডলির পরম সত্তাকে অতীন্দ্রিয় জগৎ থেকে কথা বলতে দেখা যায় না।

ব্রাডলির মতে Absolute এর মধ্যে সব অসামঞ্জস্যতা একত্রে অবস্থান করে, কিন্তু আমরা তা জানিনা কীভাবে তা অবস্থান করে। তবে এটা নিশ্চিত কোনো একটিকেও বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। Absolute সমস্ত বিরোধকে ধারণ করেই সমৃদ্ধ হয়।[১৪] তাঁর মতে অধিবিদ্যা ও ধর্ম পৃথক। ধর্মের ব্যাপারেও তাঁর মত, একটা অবভাস। নৈতিকতাকেও তিনি অবভাস বলেন। তাঁর ভাষায় Moral evil exist only is moral experience and that experience is its essence is full of inconsistency.[15] আর এ জন্যই অবভাস।

ঈশ্বর সর্ম্পকে ব্রাডলির মত, ঈশ্বরও পরম সত্তার অবভাস। তাঁর ভাষায় Religion naturally inplies a relation between man and God[16]আর যখন সম্বন্ধ সৃষ্টি হবে তখনই স্ববিরোধ তৈরি হবে। মানুষ একদিকে একটি সসীম সত্তা যা ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে মানুষের ধারণা কেবল একটি কল্পনা। ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে মানুষ কিছুই করতে পারে না। অন্যদিকে ঈশ্বরও সসীম সত্তা। মানুষের উর্ধ্বে তার অবস্থান, তার ইচ্ছা ও বুদ্ধির কারণে তিনি অন্যসব সম্বন্ধ থেকে কিছুটা স্বাধীন।[১৭] তাই ঈশ্বরকে যদি একটি চিন্তাশীল ও অনুভূতিশীল সত্তা বলি তাহলে তাঁর একটি নিজস্ব ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে। কিন্তু যে সম্বন্ধের মাধ্যমে তাকে ব্যাখ্যা করি, তা যদি বাদ দেওয়া হয় তাহলে তিনি হবেন সঙ্গতিহীন শূণ্যতা কিংবা তিনি হবেন সসীম সত্তা। তিনি Absuloute কে ঈশ্বরের উর্ধ্বে চূড়ান্ত বাস্তবসত্তা মনে করেন যা ধর্মের ঈশ্বর থেকে ভিন্ন। তাঁর ভাষায় If you identity the Absolute with God, that is not God of religion . If again you separtate them, God becomes a finite factor in the whole. And the effort of religion is to put an end to, and break down, this relation which none the less it essentially presupposes, Hence that goal he is lost and religion with him.[18]চূড়ান্ত বিশ্লেষণে তিনি পরের পৃষ্ঠায় বলেন, We may say that God is not God, till he has become all in all, and that a God which is all in all is not the God of religion . God is but an aspect and that must mean but an appearance of the absolute.[১৯]

অধিবিদ্যা ও ধর্মকে পৃথক বললেও তিনি উভয়ের মধ্যে একটি সমন্বয়ের চেষ্টা করেন। তাঁর মতে অধিবিদ্যার কাজ চূড়ান্ত সত্যকে নিয়ে এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকে এটা ধর্মের উর্ধ্বে। কিন্তু অন্যদিকে আমরা ধর্মের সারসত্তা হিসেবে জ্ঞানকে পাই না এবং এটা অবশ্য এই অর্থ করে না যে, এর সারসত্তা কেবল অনুভূতির মধ্যেই রয়েছে। বরং ধর্ম আমাদের সত্তার প্রতিটি ক্রিয়ার মাধ্যমে ভালোত্বের পূর্ণাঙ্গ Reality কে প্রকাশ করতে চেষ্টা করে। আর তাই এটা একটা ব্যাপকতর জিনিস এবং সেই জন্য দর্শন বা অধিবিদ্যার চেয়ে উচ্চতর। তিনি আরো বলেন দর্শনও অন্যান্য জিনিসের মতই এটা একটা অবভাস। একদিকে এটা অনেক উচ্চ, অন্যদিকে এর অবস্থান নিম্নতর। এর দুর্বলতা এটা কেবল তাত্ত্বিক। অন্যদিকে যেহেতু বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যের মধ্যেই এর সারসত্তা তাই এর অবস্থান উচ্চতর।

সর্বশেষ, ২৭তম অধ্যায় Ultimate doubts -এ তিনি তাঁর গ্রন্থের উপসংহার টানেন। Reality সর্ম্পকে এখানে তাই বলেন, We have found that Reality is one, that it essentially is

experience, and that it owns a balance of pleasure. There is nothing in the whole beside appearance, and every fragment of appearance qualifies the whole, while on the other hand, so taken together, appearances, as such, case.[22] তিনি আরো বলেন Beyond all doubt then it is clear that Reality is one. Reality must be one experience and to doubt this conclusion is impossible.[23]সর্বশেষে তিন হেগেলকে স্বীকার করেন I will end with something not very different, something perhaps more certainly the essential message of Hagel. হোগেলের সাথে তাঁর পার্থক্য Absolute কে হেগেল বলেছেন Spiritual, আর তিনি বলেন অভিজ্ঞতালব্ধ।

ব্রাডলি অধিবিদ্যা সংক্রন্ত এই গ্রন্থ রচনার পর আরো ৩০ বছর জীবিত ছিলেন। এই দীর্ঘ সময় তিনি অন্যান্য রচনার পাশাপাশি তাঁর অধিবিদ্যার উপর আরোপিত অভিযোগ খন্ডন করেন। মূর ও রাসেল তাঁর অধিবিদ্যার প্রচুর সমালোচনা করেন। রাসেলের ভাষায় অধিকাংশ লোকই স্বীকার করবে যে, এ যুক্তি ভেবে চিন্তে খাড়া করা হয়েছে। পারস্পারিক সম্মন্ধের মত একটা প্রত্যক্ষ বিষয়ের চেয়ে অতি সূক্ষ্ম, বিমূর্ত ও জটিল যুক্তি প্রক্রিয়ায় ভূল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।[২৫] তাঁর সম্বন্ধের সমস্যাই সবচে বড় সমস্যা। সম্বন্ধের কারণেই তিনি সবকিছুকে অবভাস বলেন। এবং সেজন্য এগুলো অবাস্তব। কিন্তু এর দ্বারা কি বুঝা যায়, যেমন ৭>৩ (৭, ৩ এর চেয়ে বড়) এই আকারটি মিথ্যা হবে। অথচ এটা বাস্তব সত্য।[২৩] রাসেল আরো বলেন এ এবং বি দুটি ঘটনা এবং বি এর আগে এ ঘটে। এখানে এ এবং বি-দুটি ঘটনার মধ্যবর্তী সম্পর্ক স্থাপিত হয় আগে সংঘটিত ঘটনার মাধ্যমে। এখানে ৩টি জিনিস A আগে ঘটে এবং B আর এগুলো অবস্থিত দেশ-কালের মধ্যে। এ সম্পর্কটা একটা বাস্তব সম্পর্ক, কিন্তু ব্রাডলি এটাকে অবাস্তব বলেন। রাসেল আরো দাবি করেন, His difficulties break out afresh when he comes to consider the relation of subject and predicate when a charecter is assigned to reality,and that he is therefore compelled to conclude that no truth is quite true. A conclusion of this sort, based upon an extermely abstract argument, makes it natural to suspect that here is some error in the argument.[24]

প্রকৃতপক্ষে ব্রাডলির সমালোচনার মূল বিষয় হিসাবে রাসেল উল্লেখ করেছেন তাঁর একত্ববাদী মতকে যা পারমেনাইডস , স্পিনোজা, হেগেলের মাধ্যমে এসেছে। অন্যদিকে রাসেলনিজে বাস্তববাদী মতের অনুসারী অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক। ব্রাডলির বক্তব্যে ধর্মতাত্ত্বিকদের খুব উৎফুল্ল হওয়ার কারণ নেই। যেহেতু তিনি ঈশ্বরকেও পরম বাস্তব সত্ত্বার অবাভাস বলে উল্লেখ করেন। তবে এর ইতিবাচক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। তথাপি এটাকে খুব সন্তোসজনক মত বলবেন না ধার্মিকগণ। কিন্তু তিনি বাস্তবসত্ত্বাকে উপলব্ধির জন্য যে প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেন তা সন্তোষজনক। আমরা একুইনাসের সাথে তাঁর বক্তব্য এভাবে সমন্বয় করতে পারি যে, একুইনাস যেহেতু বলেছেন ঈশ্বর কেমন আমরা জানিনা, জানতে পারিনা তাই তাকে জানার উপায়- তিনি কী নন তার ব্যাখার মাধ্যমে। একই ভাবে সম্বন্ধের কারণেই হোক আর যে কারণেই হোক আমরা পরম সত্ত্বাকে জানতে পারিনা তবে জানার চেষ্টা অব্যাহত রাখাটাই মঙ্গল জনক বলে দাবী করেন ব্রাডলি।

তবে ব্রাডলিকে মূল্যায়ন করে এডওয়ার্ড কোয়ার্ড বলেন, কান্ট পরবর্তী রচনার মধ্যে ব্রাডলির Appearance and Reality গ্রন্থটি সবচেয়ে বড় দার্শনিক ঐতিহ্য। কোন বড় দার্শনিকই সমালোচনার উর্ধ্বে নন। কিন্তু তাই বলে তার অবদানকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই।

তথ্য নির্দেশ:

১. http://Plato,stanford.edu
২. Bradly, F.H.; *Appealence and Reality.* 6th Impresion, London, George Allen & Unwin Ltd, 1916, P. 1-3
৩. Ibid, P. 2
৪. Ibid, P. 3
৫. Ibid, P. 3,4
৬. Ibid, P. 20
৭. Ibid, P. 26
৮. Ibid, P. 41-42
৯. Ibid, 9th Impresion, 1930, P. 64
১০. Ibid, P. 67
১১. Ibid, P. 129
১২. Ibid, P. 243
১৩. Rashdall, H; *The Metaphysics of Mr. F.H. Bradly,* London, 1912, P. 5
১৪. Bradly, F.H.; *Appealence and Reality.* 6th Impresion, London, George Allen & Unwin Ltd, 1916, P. 180
১৫. Ibid, P. 178

১৬. Ibid, P. 394
১৭. Ibid, P. 394
১৮. Ibid, P. 396
১৯. Ibid, P. 397
২০. Ibid, P. 453
২১. Ibid, P. 463
২২. Rashdall, H; *The Metaphysics of Mr. F.H. Bradly*, London, 1912, P.10
২৩. বার্ট্রান্ড রাসেল, বহির্জগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান, (অনুবাদঃ আব্দুল বারী), ঢাকা, ১৯৭৮, পৃ. ৬
২৪. Bertrand Russell,*An Outline of Philosophy*,London, Routledge,1927/1996.p.202

Dhaka University Institutional Repository

৪. এইচ ডি লিউইস

এইচ ডি লিউইস (Hywel David Lewis) সর্ব সাম্প্রতিক কালের একজন ব্রিটিশ ধর্মতত্ত্ববিদ ও দার্শনিক। ভাষাতাত্ত্বিক দর্শন, যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ ও সমকালীন অধিবিদ্যা বিরোধী মনোভাবের তিনি একজন বিশিষ্ট সমালোচক। তিনি ১৯১০ সালের ২১ মে ওয়েলসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ডেভিড জন লিউইস ছিলেন ওয়েলসের Presbyterian Church এর একজন মন্ত্রী। তিনি ওয়েলসের Caernarfon Grammar School এ পড়াশুনা শেষ করে বাঙ্গোরে University of North Walse এ দর্শনে ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯৩২ সালে ১ম শ্রেণীর অনার্স ডিগ্রী সম্পন্ন করে অক্সফোর্ডের jesus college -এ মাস্টার্স করেন ১৯৩৪ সালে। অক্সফোর্ডে তিনি H A Prichard এবং W.D.Ross এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। ১৯৩৫ সালে B.litt অর্জন করে ব্যাঙ্গোর কলেজে লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন। এরপর ১৯৫৫ সালে তিনিuniversity of london এর Kings collegeএhistory and philosophy of religionDepartment এর চেয়ারম্যান হিসেবে যোগদান করে ১৯৭৭ সালে অবসর গ্রহণ পর্যন্ত অতিবাহিত করেন। কর্মজীবনে তিনি বিবিধ দায়িত্ব পালন করেন। যেমন ১৯৪৭ থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত তিনি মূরহেড লাইব্রেরি অব ফিলোসোফির সম্পাদক, ১৯৬২-১৯৬৩ এরিস্টটলিয়ান সোসাইটির প্রেসিডেন্ট, ১৯৬৫-১৯৬৮ রয়েল ইনস্টিটিউট অব ফিলোসাফির চেয়ারম্যান ছিলেন। এছাড়া Religious Studies নামের সাময়িকীর একজন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং ১৯৬৪-৭৯ পর্যন্ত এর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিবাহিত ছিলেন। ১৯৯২ সালের ১৭ জুলাই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। [১]

তাঁর প্রধান আকর্ষণ ছিল রাষ্ট্রদর্শন, নীতিবিদ্যা ও ধর্মদর্শনের উপর। ২০টির উপর গ্রন্থ এবং অসংখ্য প্রবন্ধ তিনি রচনা করেন। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থের নাম হলো : Our Experience of God (1959), Freedom and history (1962) The Elusive Mind (1969) প্রভৃতি। তিনি আমেরিকা, কানাডা, জাপান, বোস্টন, ফিলাডেলফিয়া, হার্ভাড, মাদ্রাজসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে Visiting Professor হিসেবে ভাষণ দেন। এছাড়া এডিনবার্গের Gifford Lectures (1966-68), The Wilde Lecture at Oxford (1960-63) প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতা।[২]তিনি ছিলেন আড়ম্বরহীন, প্রচার বিমুখ ও খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাসী একজন দার্শনিক। তিনি দেহ ও মনের ব্যাপারে Ryle এর প্রচন্ড সমালোচনা করেন এবং অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে ভাষাতাত্ত্বিক ও যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী দর্শনের সমালোচনা করেন।

এইচ ডি লিউইস এর অধিবিদ্যা সংক্রান্ত মতবাদ তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ ,রচনা এবং বক্তৃতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আমরা এখানে তাঁর ঈশ্বর সংক্রান্ত মতবাদ, দেহ ও মনের সর্ম্পক ও আত্মার অমরতা প্রসঙ্গে বক্তব্য আলোচনা করব। যৌক্তিক দৃষ্টবাদ ও ভাষাতাত্ত্বিক দর্শনের সমালোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করব।লিউইস

তাঁর বিখ্যাত Our Experience of God গ্রন্থে ঈশ্বর ও ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর কথা বলেন। গ্রন্থের সূচনাতেই তিনি বার্ট্রান্ড রাসেলের সমালোচনা করেন। রাসেল তাঁর My Philosophical Development গ্রন্থে বলেছিলেন, ধর্মীয় বিশ্বাসের পক্ষে দর্শন কিছু করতে পারে কি না এমন একটি চিন্তা থেকে তিনি দর্শনে এসেছেন এবং এক পর্যায়ে তিনি বলেন, প্রথম আমি স্বাধীন ইচ্ছার প্রতি বিশ্বাস হারাই, এরপর অমরতা এবং সর্বশেষ ঈশ্বরে। অন্যদিকে লিউইস বলেন, ধর্ম আমার প্রাথমিক দর্শন চিন্তায় খুব কমই প্রভাব ফেলেছে। তিনি আরো বলেন- I found in Philosophy a new and independent way of establishing religious truth , an alternative route to the one I had traversed before.[3]তিনি মনে করেন, অনেক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ধর্ম থেকে দূরে সরে পড়েন কিংবা ধর্মকে গভীর ভাবে বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এর কারণ তারা ধর্মের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে কিভাবে ব্যাখা করতে হয় তা উপলব্ধি করেন নি, বিশেষত যে সব মতবাদ তাদের কাছে আপত্তিকর মনে হয়। এই গ্রন্থের প্রথম দুটি অধ্যয়ে তিনি ইশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে বিভিন্ন প্রচলিত যুক্তি আলোচনা করেন এবং কিছু মূল্যবান মতামত সংযোজন করেন। আমরা এখন সেগুলো আলোচনা করব।

ঈশ্বর সম্পর্কিত প্রচলিত তত্ত্ববিষয়ক, বিশ্বতাত্ত্বিক, কার্যকারণ সংক্রান্ত, উদ্দেশ্যবাদী প্রভৃতি যুক্তির ত্রুটি বিচ্যুতিসহ আলোচনা করে তিনি এগুলোকে (যুক্তি দিয়ে) পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তবে ঈশ্বর সম্পর্কিত রহস্যবাদী যুক্তিটি তাঁর নিকট বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। এ সর্ম্পকে তাঁর একটি প্রবন্ধ God and Mystery[4] তে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেন। সজ্ঞার মাধ্যমে কীভাবে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় সেটা ও তিনি গুরুত্বসহ আলোচনা করেন।

প্রচলিত বিশ্বতাত্ত্বিক ও তত্ত্ববিষয়ক যুক্তির মূল্যায়ন করে লিউইস বলেন, এখান থেকে আমরা দুইটি উপকার পাই। তাঁর ভাষায় The Benefit we derive from the study of the traditional argument in thus two fold. We appreciate in the first instance how they fail as arguments and in the second place, we acquire an insight into the movement of thought which lies behind them and makes them plausible.[5]

তাঁর এই মূল্যায়ন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে এ দুটি যুক্তি যে জিনিসটিতে এসে একীভূত হয়ে পড়ে তাহলো আমরা প্রত্যক্ষভাবে যে সব শর্তমূলক ও অসম্পূর্ণ সত্তার মুখোমুখি হই সেগুলোর এমন কিছু উৎস থাকা দরকার যা সেই প্রক্রিয়ায় সীমিত হতে পারে না। বিশ্বতাত্ত্বিক যুক্তিতে বলা হয় 'অস্তিত্ব' জিনিসটি কেবল এক ধরনের গুণ বা বিধেয় হতে পারে। কান্টের মত আপত্তিকারীগণ এর ত্রুটি নির্দেশ করেন। কান্টের কথা ছিল অস্তিত্ব ঈশ্বরের অনিবার্য গুণ নয়। সুতরাং ঈশ্বরের ধারণা থেকে তাঁর অস্তিত্বের ধারণা নিঃসৃত করা অর্থহীন।[৬]আবার তিনি প্রশ্ন করেন, ইন্দ্রিয় জগতে প্রযোজ্য কার্যকরণ নীতি অতীন্দ্রিয় জগতে কীভাবে প্রযোজ্য হবে, তার কোনো জানার প্রক্রিয়া নেই; আর এখানে তত্ত্ববিষয়ক প্রমাণ প্রজ্ঞা বা বুদ্ধির আশ্রয় নেয়। এই জন্যই বিশ্বতাত্ত্বিক যুক্তির সাথে

তত্ত্ববিষয়ক যুক্তির মৌলিক পার্থক্য নেই। লিইউস তাঁর উত্তরে বলেন, যদি আমরা এটাকে সহজ ভাবে গ্রহণ করি যে, আমরা এমন কিছু অনিবার্য চিন্তার অধীন যা আমাদের ঈশ্বর সর্ম্পকে চিন্তা করতে প্রভাবিত করে এবং জোর প্রদান করে বলে, অস্তিত্বের কিছু অনিবার্যতা আছে যা আমরা অন্য কোথাও খুজে পাই না, তখন এটা আমাদেরকে একটি দৃঢ়তর ভিত্তির দিকে নিয়ে যায়, যা বিশ্বতাত্ত্বিক যুক্তিতে শর্তহীন সর্বোচ্চ সত্তা হিসাবে ব্যাখা করা হয়। যারা মনে করেন কারণের প্রাকৃতিক রীতি আমাদেরকে সুশৃঙ্খল অভিজ্ঞতার কথা বলে এবং সব কিছুর নিবিড় পরিচালনার নির্দেশ করে তাহলে সেটার একটি যুক্তি আছে। আমাদের সমস্ত পর্যবেক্ষণ একটি আদি কারণ ছাড়া কখনো বিশ্বজগৎ পাওয়ার দাবি করতে পারে না।[৭]

লিইউস এই যুক্তির পক্ষে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি যুক্তি তুলে ধরেন যাকে তিনি সবচে বিধি সম্মত বলেন। তাহচ্ছে- A technique for evoking the insight into the inevitability of ultimate self subsistent being.[৪]এখানে তিনি অজ্ঞেয়বাদীকে প্রশ্ন করেন- বিশ্বজগতের এসব জিনিস কেমন করে হলো তা জানতে কি তার কোন উৎসাহ নেই? যদি তিনি উত্তর দেন- এগুলো আমাদের সমস্যায় ফেলে না, তাহলে আমাদের প্রশ্ন- আমাদের সমস্ত চিন্তার উপযোগী একটি পটভূমি নির্ধারণ করতে বা বিশ্বজগৎকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে তিনি কি বাধ্য? তিনি কি তা পারেন না? লিউইস তখন বলেন, হয়ত এতে তিনি প্রভাবিত হবেন না এবং যদি তার ধৈর্য থাকে তাহালে আমরা অন্য একটি জিনিসের কথা বলি, (জোরালোভাবে যুক্তি না দিয়েও) সেটা হলো দেশ-কালের শুরু বা সমাপ্তির প্রশ্ন। তিনি বলেন, আমরা এটাকেই সবচেয়ে সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দাবি করছিনা। আমাদের কাছে এখনো এমন কোনো অভিজ্ঞতা নেই যা বিশ্বজগৎকে সবচেয়ে উপযোগী পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করবে, যা সম্পূর্ণ মৌলিক ও ভিন্নতর। আবার যদি ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে বা বিপক্ষের উত্তরে অজ্ঞেয়বাদীর মত কেউ বলেন Nothing, তাহলে এতে কোনে সত্তার অস্তিত্বই অস্বীকার করা হবে। লিউইস বলেন, এটা ভুল হবে; কারণ এটা অন্তত স্বীকার করে- কোনো কিছুর থাকা উচিত নয় এবং ফলস্বরূপ তখন বলতে হবে, ঈশ্বরের অস্তিত্বের মত একটা কিছু আসলে আছে। কিন্তু এই জবাব বস্তুজগৎকে সম্পূর্ণ শেষ করে দেয়। অথচ বস্তু জগতের ব্যাপারে আমাদের অনিবার্য অন্তর্দৃষ্টির কারণে আমরা পরস্পর মুখোমুখি হই।

তত্ত্ববিষয়ক যুক্তির ব্যাপারে তিনি বলেন, যাঁরা এই যুক্তির বিরোধিতা করেন তাঁরা অস্তিত্বকে কোনো বিধেয় বলতে নারাজ। তাদের এই দাবি আসলে ঠিক নয়। আপত্তিকারীগণ যারা বলেন অস্তিত্ব কোন ধারণার অংশও নয়। লিউইস এর মতে, এটা সব সসীম জিনিসের জন্যই সত্য যে, সেগুলো তাদের নিজস্ব প্রকৃতির অনিবার্যতার কারণে অস্তিত্বশীল হতে পারে না। ঈশ্বরের বিষয়টি ভিন্ন। সসীম বস্তুর জন্য যা প্রযোজ্য তার জন্য তা প্রযোজ্য নয়।

ডেকার্তের যুক্তিতে অনেক ভ্রান্তি ও অদ্ভূত অনুমান থাকলেও বুদ্ধিবাদী প্রমাণের মাধ্যমে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বের যুক্তি দেন। ঈশ্বরের ধারণা একটি হৃদয়গ্রাহী ধারণা। এটাই ডেকার্তের মৌলিক বুদ্ধিবাদী উক্তি। লিউইস বলেন, সংশয়বাদীগণ ডেকার্তের সমালোচনা করলেও আমার কাছে মনে হয় ডেকার্তের ঈশ্বরের ধারণা খুবই স্পষ্ট ও সরল। ডেকার্তের উক্তিটি ধর্মীয় ভাবাপন্ন নয়। চার্চ যেভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা বলে সে ধরনের কোনো প্রত্যাদেশ বা চার্চের কোন শিক্ষাও নয় এটা। কিন্তু একটি স্বাধীন, স্বচ্ছ ও অপ্রত্যাখ্যানযোগ্য প্রত্যয়- একজন বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন জীব হিসাবে তিনি তা উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, "একজন ঈশ্বর আছেন একথার চেয়ে আরো স্পষ্ট কোন কথা আছে কি? যিনি নিরংকুশ সত্তা, যার সারসত্তা কেবল অস্তিত্বের অন্তর্ভূক্ত।" অথাৎ অস্তিত্ব তার থেকে পৃথক করা যায় না। তবে এসব উক্তি তৈরি হয়েছে খুব সংশয়পূর্ণ একটি যুক্তি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে (Cegito ergo sum)। লিউইস বলেন, ডেকার্ত ও তাঁর অনুসারীদের উচিত ছিল তাঁদের বুদ্ধির মাধ্যমে প্রমাণিত রূপে তাঁদের প্রত্যয়কে উপস্থাপন করা। তাহলে তা আরো সহজ-সরল ও বুদ্ধিবাদী হতো। এর কোনো সুদৃঢ় অভিজ্ঞতামূলক ভিত্তি ছিলনা এবং কিছু সীমিত অন্তর্দৃষ্টি ছাড়া আমরা কেমন করে অগ্রসর হতে পারি তা এখানে নেই। ডেকার্ত কমপক্ষে মনে করতেন এর কোনো বিকল্প নেই, এটাই ছিল তাঁর ভুল। তবে ঈশ্বরের অনিবার্য সত্তার প্রত্যয়ের সাথে বুদ্ধির পৃথক কার্যের সংযোগ সাধনে তিনি ভুল করেননি।[১০]

লিউইস কার্যকরণ সংক্রান্ত যুক্তিটাকেও পুনর্বিন্যাস করেন। যখন ঈশ্বরকে সব কিছুর ব্যাখ্যা, ভিত্তি বা আদি কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়, তখন এটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। কারণ আমরা প্রত্যেকটি ঘটনার কারণ খুজি। কারণ কোনো কিছু এমনিতে ঘটতে পারে এমনটা চিন্তাও করতে পারিনা। এভাবে স্বাভাবিক প্রয়োজনেই ঈশ্বরের মধ্যে আমরা সামগ্রিক ব্যাখ্যা খুজে পাই। যখন পিস্তল থেকে গুলি বের হয় এর কারণ কি? -আমরা গুলি করি; কিভাবে তা ঘটে? কারণ গান পাউডার, অগ্নি স্ফুলিঙ্গ ইত্যাদির প্রকৃতি এধরনের। কিন্তু যখন গুলি করা হয় তখন এগুলোর বিষ্ফোরণ হওয়া উচিত কেন? কারণ রাসায়নিক বিক্রিয়া। কিন্তু কেন এই ধরনের উপাদানগুলোর এমন আচরণ করা উচিত। কারণ পরমাণু, অণু ইত্যাদির প্রকৃতিই এধরনের। পদার্থবিদকে তখন রসায়নবিদ উদ্ধার করেন। কিন্তু পদার্থবিদ যেভাবে চান বস্তু কেন সে রকম আচরণ করে? যাই হোক এই উত্তরগুলো পূর্ণাঙ্গ। লিউইস এই ধরনের উদাহরণের মাধ্যমে বলেন, আমরা এভাবে অনন্ত প্রশ্নের অবতারণ করতে পারি। কিন্তু শেষ প্রশ্নের উত্তর পাইনা। তখনই একটা ব্যাখ্যার জন্য ঈশ্বরের কাছে আমরা পৌছি। কিন্তু কারণের মধ্যে কোন আংশিক সম্পর্ক আছে কিনা? তিনি বলেন, আমরা এধরনের কোনো অনিবার্যতা পর্যবেক্ষণ করতে পারিনা, আবশ্যকীয়তা প্রত্যক্ষ করিনা। কিন্তু আরোহের মাধ্যমে ঘটনা পরম্পরায় এবং বিশ্বজগতে নিয়মের রাজত্বে আমরা অনিবার্যতা প্রতিষ্ঠা করতে চাই। লিউইস বলেন, আমি মনে করিনা এটা একটা সফল প্রচেষ্টা। অন্যদিকে হিউম

কার্যকারণ সর্ম্পকের আবশ্যকীয়তাকে মনোবৈজ্ঞানিক ঘটনা বলে যে দাবি করেন তাও সঠিক নয়। একটি গভীর বা অলংঘনীয় প্রকারের আকাঙ্ক্ষা দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে যা ভবিষ্যতে ঘটবে এমন ব্যাখ্যা না দিয়ে আমরা পারি না, কিংবা সেখানে অবশ্য তা থাকবে, এমনকি যদি আমরা সেটা এই মুহূর্তে নাও পেয়ে থাকি। এটা কোনো অনুমান নয়, বরং নিশ্চয়তা এবং একটি প্রত্যয় এবং কেবলই তা মনস্তাত্ত্বিক বিষয় নয়। এটা আদৌ সম্ভব নয় যে, সম্পূর্ণ আকস্মিক কোনো ঘটনা থাকা উচিত। আমরা এমটা আশা করতে পারিনা। কিন্তু বাস্তবে অবশ্য এমন একটি ব্যাখ্যা থাকবে। এখানে এধরনের আকস্মিক দৈব ঘটনা স্বীকারের ফলে বিশ্বতাত্ত্বিক যুক্তির জন্য একটি সমস্যা হতে পারে। অর্থাৎ প্রতিটি ঘটনার একটি কারণ থাকবে একথাটির মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি করে। লিউইস এর জবাবে বলেন, No serious difficulty here if the necessity of causal relations is seen to be lent to them by the way they are embeded in the ultimately self explanatory character of the universe.[13]

কার্যকারণ সর্ম্পকের মধ্যে সৃষ্ট সমস্যার সমাধান লিউইস স্বজ্ঞার মাধ্যমে দেন। তাঁর মতে, ঈশ্বরের আবশ্যিক সত্তাকে উপলব্ধির জন্য এটা একটা উপযুক্ত মাধ্যম। তবে অন্যান্য স্বজ্ঞার মত নয় ঈশ্বরের স্বজ্ঞা; যেমন কেউ নারীর ধ্যান করলে যে স্বজ্ঞা আসে কিংবা হিটলারের ধ্যান করলে যে ধরনের স্বজ্ঞা আসে। এতে কিছু অসুবিধা থাকলেও লিউইস এটাকে গুরুত্ব দেন। অন্যান্য সসীম সত্তার মত ঈশ্বরের স্বজ্ঞা হতে পারেনা। বরং সৃষ্টিগত সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে প্রত্যক্ষভাবে মনের মাধ্যমে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষণ করা।[১৪] তবে এ সর্ম্পকে ইসলাম খ্রিষ্টান ও ইহুদি ধর্মের মধ্যে বিরোধ আছে। তবে স্বজ্ঞা প্রত্যক্ষভাবে বা ঈশ্বরের সাথে অমাধ্যম সংযোগ নয়, বরং সমস্ত যুক্তির উর্দ্ধে তাকে মেনে নেওয়ার বাধ্যবাধকতা, যেমনটি নীতিবিদ্যায় দেখা যায়।

লিউইসের কাছে ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি রহস্যবাদী যুক্তি।[১৫] লিউইস বলেন, ঈশ্বরের ধারণা এক অনন্য ধারণা। অন্য যে কোন ধারণার চেয়ে তাঁর ধারণা পৃথক। এই ধারণা অভিজ্ঞতামূলক নয় বলার সুযোগ নেই । মরমী অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে পারি, যার সূচনা স্বজ্ঞার মাধ্যমে হয়ে থাকে।

গণিত কিংবা অভিজ্ঞতামূলক কিছু নীতিমালা কিংবা নীতিবিদ্যায় সাম্প্রতিক অনেক ধারণা থাকলেও সেগুলোকে আমরা সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করার দাবি করতে পারি। এগুলোর ব্যাপারে কঠোরতর কোনো ব্যাখ্যা হয়ত নেই, যেমন ভালোত্ব-র কোন প্রকার অপ্রাকৃতিক বিশ্লেষণই সম্ভব নয়। একইভাবে পদার্থিক জগৎ, গাণিতিক কিংবা কার্যকারণগত বিষয়ের কথা বলতে পারি। এগুলোর বর্ণনা হয়ত সম্ভব নয়, তবে এগুলোর সাথে যুক্ত বিভিন্ন

জিনিসের মাধ্যমে আমরা এগুলোকে উপলব্ধি করতে পারি। যেমন- পদার্থবিদ্যা, আলোর তরঙ্গ, চৌম্বক ক্ষেত্র, পরমাণু কিংবা আণবিক শক্তির ধারণা। কোনো বিজ্ঞানী জানেন না এগুলো আসলে কি? যেমন রং সর্ম্পকে মানুষ জানে, এগুলোও সে রকম। এসব ব্যাপারে অনেক কিছু আমরা বলতে পারি কিন্তু এধরনের বৈজ্ঞানিক বিষয়ের রহস্যের সমাধান কারো কাছে নেই।

আমাদের মনটাও একটা রহস্য। আমরা অন্যের মন সর্ম্পকে জানিনা। তবে এতটুকু জানি কেউ সন্তুষ্ট বা রাগান্বিত কিনা যা সাধারণ আলোচনায় আসে। বাস্তবে অন্যের মন সম্পর্কে সঠিকভাবে জানা খুব জটিল ব্যাপার, জানলেও ভ্রান্তি, ভুল উপলব্ধি ও সম্ভাব্যতা নির্ভর। আমার মধ্যে এখন যে জ্ঞান আছে তা সম্পূর্ণভাবে অন্যের মধ্যে নেই। যারা এটাকে সমস্যা মনে করেন না তাদের জন্য এটা কিছুই না। কারণ এটা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রদর্শনের বিষয় নয়। এটা অনুমান করা যায়, বর্ণনা করা যায় না। কিন্তু অন্যের মন সম্পর্কে জানতে কে বাধার সৃষ্টি করে? প্রকৃতপক্ষে সব সসীম অর্জনের একটি বাস্তব চূড়ান্ত অপরিহার্য সীমানা থাকাটা স্বাভাবিক।

তিনি যে রহস্যের কথা বলেন তা উচ্চতর গণিতকে যারা রহস্য মনে করেন তাদের মত নয়। কিংবা গোয়েন্দা কাহিনীও নয়। বরং এই রহস্য হলো যার ব্যাখ্যা সম্ভব নয় তা স্বীকার করা । বিশ্বজগৎ শূন্য থেকে উদ্ভব হতে পারে কিনা এধরনের প্রশ্ন থেকে রহস্য। লিউইস বলেন, আমাদের অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতার কারণে রহস্যের সূচনা, তবে ইতিবাচক অর্থেও রহস্যের ব্যাখ্যা রয়েছে। যেমন দেশও কালের সমস্যা। তিনি বলেন, দেশের ধারণাটি একটি অসীমতার সমস্যা (ad infinitum) এবং হতবুদ্ধি সৃষ্টিকারী। আর এজন্য এর পক্ষে আমি আর যুক্তি দিতে পারিনা। আমি অন্যদেরকে এই বিষয়ে চিন্তা চালিয়ে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। যদি তারা তাই করেন তাহলে এমন একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন যেখানে বিশ্বজগৎ একটি Supra rational চরিত্র প্রদর্শন করে যার রহস্যকে আমরা কখনো হ্রাস করতে পারি না। এভাবেই লিউইস রহস্যের (Mystery) মাধ্যমে ঈশ্বরের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা দেন। তাঁর মতে পদার্থবিদ্যার রহস্যে ঈশ্বরই তার সমাধান, অন্যের মন সর্ম্পকে একমাত্র ঈশ্বরই জানেন এবং সেই ধাধা তিনিই অতিক্রম করেন।

লিউইস প্রচলিত দেহ-মন সর্ম্পকিত আচরণবাদী মতের প্রচন্ড সমালোচনা করেন। গিলবার্ট রাইল ছিলেন এমতের প্রধান সমর্থক যা তাঁর The Concept of Mind গ্রন্থে এসেছে। আচরণবাদ (Behevior) অনুযায়ী আমরা চেতনা সম্পর্কিত যত ধারণা পোষন করি সেগুলি দৈহিক আচরণ প্রকাশ পাবে। রাইল ডেকার্তের দ্বৈতবাদের কঠোর সমালোচনা করেন। দ্বৈতবাদকে তিনি Official doctrine নামে ব্যঙ্গ করেন। লিউইস রাইলের

মতবাদকে আবেগ নির্ভর বলে দাবী করেন। The Elusive Mind[16] গ্রন্থে/ বক্তৃতায় লিউইস রাইলের কিছু মন্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর সমালোচনা করেন। প্রসঙ্গত বলতে হয়, লিউইস ডেকার্তের দ্বৈতবাদের সমর্থনকারী ছিলেন। আর দ্বৈতবাদ অনুসারে দেহ ও মন পৃথক সত্তা এবং মৃত্যুর পর মন বা আত্মা অমর থাকে। তিনি বলেন, ডেকার্তের এই দ্বৈতবাদকে সমর্থন করেন প্রাচ্যবিদগণ; পাশ্চাত্যের প্লেটো ও অগাষ্টিনের আত্মা সম্পর্কিত মতবাদও এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, বার্কলি, কান্ট এবং কিছু ক্ষেত্রে লাইবনিজের মতও ছিল অনুরূপ। রাইল ডেকার্তের মতবাদকে ব্যাখ্যা করেন, "কিছু মূর্খ্য ও শিশু ছাড়া প্রতিটি মানুষেরই একটি দেহ ও একটি মন আছে।" অথচ ডেকার্ত Idiot বা infant কে এভাবে বাদ দেননি। এগুলো রাইলের আবেগমূলক প্রকাশ যা দর্শনে ব্যবহৃত হতে পারে না। তিনি বলেন, His clim attempt to understand or whatever his mental process we thought to be are activities as distinct from physical process as the most abstract operations of a genius.[17] ডেকার্ত পিনিয়াল গ্রন্থির মাধ্যমে দেহ ও মনের সংযোগ সাধনের যে ব্যাখ্যা দেন তারও সমর্থন করেন লিউইস। রাইল ডেকার্তের মতবাদকে The dogma of the Ghost in the machine বলে যে সমালোচনা করেন লিউইস তারও জবাব দেন। তিনি বলেন, মানসিক ঘটনাকে Just avariety of Mechanical বলাটা যথার্থ হয়নি। কারণ মানসিক ধারণার মধ্যে কারণিক সম্পর্ক বিদ্যমান। ডেকার্ত মানসিক ঘটনাকে দৈহিক ঘটনার চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক বলেননি, বলেন, মনের উপর আমাদের প্রত্যক্ষ প্রবেশ আছে যা প্রাকৃতিক ব্যাপার। ডেকার্ত সমর্থকদের রাইল বলেন, তারা Avert Disaster এর দিকে ধাবিত হয় অথচ এটা সঠিক নয়। লিউইস বলেন, যদি মনের কাজ দেহের মতই হয়, তাহলে দেহ যেহেতু যান্ত্রিক নিয়মের অধীন সুতরাং মনও যান্ত্রিক নিয়মের অধীন হবে অবশ্যই। যেহেতু পদার্থিক জগৎ পূর্ব নির্ধারিত তাই মানসিক জগৎও পূর্ব নির্ধারিত হবে। এতে মূলত ইচ্ছার স্বাধীনতার অস্তিত্বই থাকে না। লিউইস তাই শেষ পর্যায়ে বলেন, Now it seems to me that if anyone is a victim of a category mistake here it must be professor Ryle himself.[18]

উল্লেখ্য, রাইল ডেকার্তকে Category mistake বলে অভিহিত করেন।

তথ্য নির্দেশ:

১. http://wbo.llgc.org.uk/H.D. Lewis

২. http://philpapers.org/www.wikipedia.org

৩. Lewis, H.D. , *Our Experience of God*, London, 1959, P. 13

৪. Lewis, H.D. , *God and Mystery*, in I.A.N. Ramsey, (ed.) *Prospect for Metaphysics*, London, 1961, P. 206-237

৫. Lewis, H.D. , Our Experience of God, London, 1959, P. 42

৬. সৈয়দ কমরুদ্দীন হোসেইন, *কান্টের দর্শন*, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ৯৫

৭. Lewis, H.D. , God and Mystery, in I.A.N. Ramsey, (ed.) *Prospect for Metaphysics*, London, 1961, P. 219

৮. Ibid, P. 220

৯. Ibid, P. 223

১০. Ibid, P. 221

১১. Lewis, H.D. , *Our Experience of God,* London, 1959, P. 38

১২. Lewis, H.D. , *God and Mystery*, in I.A.N. Ramsey, (ed.) *Prospect for Metaphysics,* London, 1961, P. 228

১৩. Ibid, P. 230

১৪. Lewis, H.D. , *Our Experience of God*, London, 1959, P. 45

১৫. Ibid, P. 41

১৬. www.gifford lectures.org/ The Elusive Mind (1966-1968)

১৭. Ibid,

১৮. Ibid,

Dhaka University Institutional Repository

৩য় অধ্যায়

অধিবিদ্যা সম্পর্কে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের অবস্থান বিচার

দর্শনের ইতিহাসে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ একটি বিপ্লবী চিন্তাধারার নাম। ভাববাদী, আধ্যাত্মিক স্বজ্ঞাবাদী কিংবা আধিবিদ্যক মতবাদের বিরুদ্ধে এক প্রচন্ড আন্দোলন। যৌক্তিক অভিজ্ঞতাবাদ (looncal empiricism),বৈজ্ঞানিক দর্শন (Scientific philosophy) এবং নব্য প্রত্যক্ষবাদ (neo-positivism) নামেও এই মতবাদের ব্যাখ্যা করা হয়। হিউমের অভিজ্ঞতাবাদ ও লাইবনিজের বুদ্ধিবাদের সমন্বয় ঘটে এখানে। গণিত, যুক্তিবিদ্যা ও ভাষাতাত্ত্বিক দর্শনের মিলন হয় এখানে। এটা ছিল এক ধরনের ভাষা তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণী দর্শন। অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক এই মতবাদের অনুসারীদের সংঘ ছিল ভিয়েনা সার্কেল। তাছাড়া জার্মানির বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক বার্লিন সোসাইটি এবং এতদুভয়ের সমর্থনকারী ব্রিটিশ ও মার্কিন দার্শনিকদের মিলিত প্রচেষ্টায় ১৯২০ ও ৩০ এর দশকে যাত্রা করে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ। প্রতিষ্ঠার পরপরই তীব্র সমালোচনার মুখোমুখি হয় এই মতবাদ। আধিবিদ্যা বর্জনের বিপ্লবী ঘোষণা নিয়ে যাদের আবির্ভাব হয়েছিল কিছুকাল পর যুক্তি ও বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা হারিয়ে যায়। আমরা এই অধ্যায়ে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের একটি পর্যালোচনা উপস্থাপনের চেষ্টা করব।

উৎপত্তি ও ইতিহাস

যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের মূল অনুপ্রেরণা আর্নস্ট ম্যাক (১৮৩৮-১৯১৬), গটোলব ফ্রেজে (১৮৪৮-১৯২৫), বার্ট্রান্ড রাসেল (১৮৭২-১৯৭০), ভিটগেনস্টাইন (১৮৮৯-১৯৫১)। তাছাড়া তৎকালীন পদার্থবিদ বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বেরও প্রভাব ছিল এই আন্দোলনে। গণিত, যুক্তিবিদ্যা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে একদল তরুণ-দার্শনিক সবকিছুকে বিজ্ঞানের আলোকে মূল্যায়ন করতে চেষ্টা

করেন। ফ্রেজেকে বলা হয় আধুনিক যুক্তিবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি প্রচলিত সিমান্টিক ও ভাষা দর্শনের অগ্রপথিক ছিলেন। রাসেল, কার্নাপ ও ভিটগেনস্টাইনের উপর তাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল। আর একারণে তাঁকে বিশ্লেষণী দর্শনেরও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। জার্মান এই গণিতবিদ, যুক্তিবিদ ও দার্শনিক এ কারণেই যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের মূল প্রেরণা। ফ্রেজের ছাত্র ছিলেন ভিটগেনস্টাইন এবং ১৯১০ থেকে ১৯১৩ পর্যন্ত কার্নাপও ছিলেন তাঁর ছাত্র। ১৮৯৫ সালে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন করে সৃষ্ট Philosophyof Inductive Science ডিপার্টমেন্টের প্রধান হিসেবে যোগ দেন আর্নস্ট ম্যাক- যিনি বৃটিশ অভিজ্ঞতাবাদের সমর্থক ও প্রচন্ড অধ্যিবিদ্যা বিরোধী।[১]

১৯০৭ সালে গণিতবিদ হ্যান্স হান, অর্থনীতিবিদ অটোনিউরেথ, পদার্থবিদ ফিলিপ ফ্রাংক ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের দর্শন নিয়ে অনানুষ্ঠানিক আলোচনা করতেন। অন্যদিকে তরুণ ভিটগেনস্টাইন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অস্ট্রিয় সামরিক বাহিনীতে থাকাকালীন শত্রুর হাতে বন্দী হন। বন্দী অবস্থায় তিনি Tractatuslogico philosophicus গ্রন্থের মূল পান্ডুলিপি রচনা করেন।[২] ১৯২১ সালে যুদ্ধ পরবর্তীতে জার্মান ভাষায় ও ১৯২২ এ ইংরেজি ভাষায় এই গ্রন্থ প্রকাশিত হলে সৃষ্টি হয় তুমুল আলোচনা- বিতর্ক। ১৯২২ সালে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্নস্ট ম্যাকের পদে অধিষ্ঠিত হন মরিজ শ্লিক- যিনি ইতোমধ্যেই বিজ্ঞান-দার্শনিক ও বিশেষত আইনস্টাইনের একজন ভাষ্যকার- হিসেবে পরিচিতি পান। শ্লিককে কেন্দ্র করেই ভিয়েনা সার্কেল প্রতিষ্ঠিত হয় যার অন্যান্য প্রাথমিক সদস্য ছিলেন ফিলিপ ফ্রাংক, হ্যান্স হান ও অটো নিউরেথ।[৩] গোড়ার দিকে প্রতি বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন ভবনে তারা মিলিত হতেন এবং দর্শন ও বিজ্ঞানের সমন্বয় প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করতেন। ১৯২৬ সালে রুডলফ কার্নাপ এখানে আমন্ত্রিত হন এবং অচিরেই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। ভিটগেনস্টাইন আলোচনায় না বসলেও শ্লিক ও ওয়াইজ ম্যান তাঁর সাথে আলোচনা করতেন। ১৯২৮ সালে ঢমুট শগবে ূগহেডটচ নামে এই সংঘ প্রচারণা চালায়। অন্যদিকে বার্লিনে এই সময় হ্যান্স রেইচেনবাক এর নেতৃত্বে Society for Empirical philosophy গঠিত হয়।[৪] ১৯২৮ এর নভেম্বরে ভিয়েনা সার্কেলের (ম্যাক সোসাইটি) প্রতিষ্ঠাকালীন অধিবেশন হয় এর প্রথম সভাপতি হন মরিজ শ্লিক, সহ সভাপতি হান, এবং সেক্রেটারিয়েট সদস্য নির্বাচিত হন নিউরেথ ও কার্নাপ।[৫] ১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বরে এর নিজস্ব নাম, মেনিফেস্টো প্রভৃতি নিয়ে একটি কনফারেন্স হয়। কার্নাপ, হান, নিউরেথ স্বাক্ষরিত ১ম প্রকাশনা The scientific world conception: The vienna Circle যার মধ্যে এই চক্রের

উদ্দেশ্য, পরিচিত প্রভতি স্থান পায়। ১৯৩০ সালে বার্লিন সোসাইটির মিলিত প্রচেষ্টায় কার্নাপ ও রেইচেনবাক এর সম্পাদনায় Annales der philosphie সাময়িকী প্রকাশিত হয়। ১৯২৮ থেকে ৩৬ পর্যন্ত শ্লিক ও ফ্রাংক এর সম্পাদনায় writings on the scientifc world concerption নামে এই চক্রের সিরিজ পুস্তক প্রকাশিত হয়। ১৯৩০ থেকে ৩৯ পর্যন্ত নিউরেথ এর সম্পাদনায় Unified science সিরিজ প্রকাশিত হয়। ১৯৩১ সালে এই মতবাদের নতুন নাম Logical positivism (যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ) দেন AE Blumberg এবং HerbertFeigl. [৬]

ইতোমধ্যে জার্মানিতে নাৎসীবাদের উদ্ভব হয়। নাৎসীবাদের উত্থানে এই মতবাদের অনুসারীগণ দেশ ছেড়ে চলে যান। ১৯৩১ এ কার্নাপ ভিয়েনা ছেড়ে প্রাগে যান। ফেইজল যান মিনেসোটা, হান মৃত্যুবরণ করেন ১৯৩৪ সালে, ১৯৩৬ এ কার্নাপ শিকাগোতে স্থানান্তরিত হন, মরিজ শ্লিক মানসিক বিকারগ্রস্থ একজন ছাত্র কর্তৃক নিহত হন ১৯৩৬ সালে। এতে সার্কেলের অনুষ্ঠান অনিয়মিত হয়ে পড়ে। আর ১৯৩৮ সালে আনুষ্ঠানিক ভাবে এই সংঘের বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয়।[৭]

তবে এর অনুসারীগণ বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। কার্নাপ আমেরিকায় গিয়ে সেখানকার দার্শনিকদের প্রভাবিত করেন। আমেরিকায় এই মতের অনুসারী ছিলেন সি.ডব্লিও.মরিস, আর্নেস্ট নেগেল। ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটির এল সুসান, জন উহজডম; অক্সফোর্ডের গিলবার্ট রাইল, এয়ার; ফ্রান্সের Louis Rougier প্রমূখ এই মতের সমর্থক ছিলেন। তবে ব্রিটিশ দার্শনিক এ.জে. এয়ার (১৯১০-১৯৮৯) ছিলেন এই মতের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। প্রকৃতপক্ষে মরিজ শ্লিক, রুডলফ কার্নাপেড ও এয়ারের রচনাই যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের পরিচয় তুলে ধরে।

যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের মৌলিক চিন্তাধারার মধ্যে রয়েছে বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক বচনের ব্যাখ্যা, পরখনীতি, অধিবিদ্যা বর্জন, বিজ্ঞানের ভাষা, নীতিবিদ্যার ব্যাখ্যা প্রভৃতি। আমরা সংক্ষেপে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করব।

১। বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক বচনঃ

ভিটগেনস্টাইনের ট্রাকটেটাসের মূল কথা ছিল : What can be said at all can besaid clearly, and what we can not talk about we must pass over in silence.[৪] এটাই

ছিল যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের মূল প্রেরণা। যা বলতে হবে স্পষ্ট করে বলতে হবে। ট্রাকটাসের ভূমিকায়- রাসেল বলেন, ভিটগেনস্টাইন এই গ্রন্থে বুঝাতে চেয়েছেন, Theessential business of language is to assert or deny facts, Given the syntax of a language, the meaning of a sentence is determinate as soon as the meaning of the component world is known.[৯]ভিটগেনস্টাইন অর্থপূর্ণ বচনকে মৌলিক ও যৌগিক বলে বিভক্ত করেন। মৌলিক বচন জগৎ সংক্রান্ত ও যৌগিক বচন পুনরক্তিমূলক।[১০] ভিটগেনস্টাইনের ট্রাকটেটসের প্রভাবে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের প্রধান সমর্থক রুডলফ কার্নাপ লেখেন The Logical Syntax of Language (১৯৩৭) এবং Philosophy and Logical Syntax. এছাড়াও অন্যান্য প্রবন্ধে এয়ারসহ মরিজ শ্লিক সবাই বিশ্বাস করতেন অর্থপূর্ণ বচনকে কেবল দুটি ভাগে ভাগ করা যায়: analytic (বিশ্লেষক) এবং senthatic (সংশ্লেষক) এর সাথে আরো দুটি শব্দ অনিবার্যভাবে যুক্ত হয় aprior এবং aposteriori(অভিজ্ঞতাপূর্ব ও অভিজ্ঞতা নির্ভর)। বিশ্লেষক বচন হচ্ছে উদ্দেশ্যের মধ্যেই যার বিধেয় অবস্থান করে, যেমন সব কুমার অবিবাহিত। কুমার মানেই হচ্ছে অবিবাহিত। অন্যদিকে সংশ্লেষক বচনের উদ্দেশ্যে বিধেয় থাকেনা বরং নতুন তথ্য প্রদান করে। যেমন পুকুরে মাছ আছে। প্রত্যক্ষবাদীদের মতে বিশ্লেষক বচন পুনরুক্তিমূলক বচন এবং স্ববিরোধী (tautology and contradictory)| এধরনের বচন পাওয়া যায় যুক্তিবিদ্যা, গণিত, জ্যামিতি প্রভৃতিতে। অন্যদিকে সংশ্লেষক বচন ব্যবহৃত হয় পদার্থ বিদ্যা, জীববিজ্ঞান, রসায়ন প্রভৃতিতে। ফ্রেগে ও রাসেলের অনুসরণ করে তাঁরা বলেন যুক্তিবিদ্যা ও গণিত কোনো বাস্তব তথ্য দিতে পারেনা কেবল পুনরুক্তি ছাড়া। এগুলো কিছু স্বত:সিদ্ধ ও আশ্রয়বাক্য থেকে নিসৃত হয়। অন্যদিকে সংশ্লেষক বচন নিয়ে বুদ্ধিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদের মতের মধ্যে রয়েছে পার্থক্য। বুদ্ধিবাদ বলে অভিজ্ঞতা ছাড়া সংশ্লেষক বচন সম্ভব অন্যদিকে অভিজ্ঞতাবাদ বলে সম্ভব নয়। প্রত্যক্ষবাদীগণ অভিজ্ঞতাবাদের অনুসরণ করেন। বুদ্ধিবাদের মতে ঈশ্বরও নৈতিকতা সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে সহজাত ধারণার মাধ্যমে প্রমাণ করা যায় যা অভিজ্ঞতা- পূর্ব। অন্যদিকে অভিজ্ঞতাবাদের অনুসারী প্রত্যক্ষবাদ বলবে অভিজ্ঞতার বাইরে কোনো কিছু প্রমাণ সম্ভব নয়। সুতরাং ঈশ্বর ও আধিবিদ্যা সংক্রান্ত সমস্ত বচন যেহেতু বিশ্লেষক নয় এবং সংশ্লেষকও নয় সুতরাং এগুলো কোনো বচনের মধ্যেই পড়েনা, আর তাই অর্থহীন। এই কথাগুলো এয়ারের Language, Truth and Logic গ্রন্থেও বর্ণনা করা হয়েছে।[১১]

২। পরখনীতি

যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ যে নীতির মাধ্যমে অধিবিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব ও নীতিবিদ্যার বচনকে অর্থহীন প্রমাণ করে তার নাম পরখনীতি। এই নীতির মূল কথা হলো বিশ্লেষণী বচন যেহেতু কোনো তথ্য বহন করে না বা নতুন জ্ঞান দেয়না তাই এগুলো আমাদের কাছে কম গরুত্বপূর্ণ। এগুলো কেবল ভাষায় ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের যথার্থ ব্যবহারের নিয়ম নির্দেশ করে। এগুলোকে যাচাই করার প্রয়োজন হয়না। অন্যদিকে সংশ্লেষক বচনের জন্য অভিজ্ঞতা প্রয়োজন-প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা কিংবা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মাধ্যমে প্রমাণিত অভিজ্ঞতা। শ্লিক এ প্রসঙ্গে বলেন, verifiability which is the sufficient and necessary condition of meaning, is a possibility of the logical order; it is created by constructing the sentence in accordance with rules by which its terms are defined. [12]

এয়ার ১৯৩৬ সালের গ্রন্থে বলেন, একটি বাক্য কেবল তখনই অর্থপূর্ণ হবে যখন কীভাবে তা যাচাই করা যায় তা জানা যাবে এবং যে পর্যবেক্ষণ সেটাকে সত্য বা মিথ্যা বলতে সক্ষম করবে। এর ব্যাখ্যায় তিনি দুই ধরণের যাচাইযোগ্যতার কথা বলেন। দুই কারণে একটি বচন যাচাই সম্ভব নয়, যেমন, চাঁদের বিপরীত পার্শ্বে পাহাড় আছে- এমন বচনের যাচাই আদৌ সম্ভব নয়। এগুলো in principle not verifiable, আবার আরেক ধরনের বচন, যেমন কেউ নতুন একটি শব্দ উদ্ভাবন করে এটা ব্যবহার করল- এ সম্পর্কে অন্যদের কোন জ্ঞান নেই- তাই এটা practically not verifiable.এক্ষেত্রে যিনি আবার দুর্বল ও শক্তিশালী যাচাই যোগ্যতার কথা বলেন। কিন্তু ১০ বছর পরের সংস্করণে তিনি তাঁর মতের কঠোরতা লাঘব করেন। তাঁর ভাষায়- I propose to say that a statement is directly verifiable if it either an observation- statement, or is such that is conjunction with one or more observation- statements it entailsal lest one observation- statement which is not deducible from the other premises alone; and I propose to say that a statement is indisectly verifiable if it satisfies the following condition: 1st that in conjunction with

certain other premises it entails one more directlyverifiable statements which are not deducible from these other premises alone; and secondly: that these other premises do not include any statemnt that is not either analytic; or directly verifiable or capable of being independently established as indirectly verifiable. And I can now reformulate the principle of verification as requiring, of a literally meaningful statement, which is not analytic, that it should be either directly or indirectly verifiable, in the foregoing sense. [15]

এই আত্মসমালোচনা শ্লিকসহ অন্যদের মধ্যেও দেখা যায়। যেমন তাঁদের পরবর্তী মত অনুযায়ী সব জড় বস্তু মাটির দিকে আকৃষ্ট হয়- এ ধরনের সার্বিক উক্তি এবং চাঁদের অপর পিঠে পর্যন্ত আছে- এ ধরনের বর্তমানে অপ্রতিপাদনযোগ্য উক্তিকেও পরখনীতির সংশোধিত ভাষ্যানুসারে অর্থপূর্ণ বলা যায়। নীতিগত পরখের সমর্থনে শ্লিক তাঁর পূর্ববর্তী সংকীর্ণ মনোভাব সংশোধন করে বলেন,'তথ্যগত বচনাদিকে যথার্থ বচন বলা যায়, যদি নীতিগতভাবে এবং যৌক্তিক দিক থেকে তাদের প্রতিপাদনের সম্ভাবনা থাকে।'[১৬]

গ. অধিবিদ্যা বর্জন :

প্রত্যক্ষবাদের প্রধান কাজ ছিল দর্শন থেকে অধিবিদ্যাকে নির্বাসন প্রদান। কার্নাপের- The Elimination of Metaphysics Through Logical Analysis of Language প্রবন্ধের আলোকে আমরা প্রত্যক্ষবাদের অধিবিদ্যা বর্জনের মতবাদটি আলোচনা করছি।

কার্নাপের মতে, যদি কেউ প্রশ্ন করেন ভিয়েনায় বসবাসকারীদের মধ্যে যাদের টেলিফোন নাম্বারের শেষ অংক ৩ তাদের সবার গড় ওজন কত কিংবা ১৯১০ সালে ভিয়েনায় ৬ জন লোক বাস করছিল, এধরনের বাক্যগুলো অর্থহীন। তিনি অধিবিদ্যার বচনকে এস্তরে ফেলতে চান। তাঁর মতে কোনো ভাষা গঠিত হয় শব্দ ভাণ্ডার (vocabulary) এবং বাক্য রীতির (Syntax) মাধ্যমে। একটি বাক্যে ব্যবহৃত শব্দগুলো অবশ্যই অর্থপূর্ণ হবে এবং বাক্যগঠনের জন্য নির্ধারিত ব্যাকরণগত নিয়ম অবশ্যই পালন

করতে হবে, তা না হলে সেই বাক্য হবে, কার্নাপের মতে ছদ্ম উক্তি (Pseudo statement)| আর ছদ্ম উক্তির দুটি কারণে হতে পারে, কার্নাপের ভাষায়ঃ either they contain a word which is erroneously believed to have meaning, or the constituent words are meaningful, yet are put together in a counter- syntactical way, so that they donot yield a meaningful statement তাঁর এই মতের আলোকে তিনি শব্দের অর্থপূর্ণতা ও বাক্যের অর্থপূর্ণতা ব্যাখ্যা করেন।[১৭]

i. শব্দের অর্থপূর্ণতা[১৮] ঃ

তিনি বলেন, যে শব্দের অর্থ আছে তা একটি ধাণার প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু তা যে অর্থ বহন করে বাস্তবে যদি তা না থাকে তাহলে সেগুলো হবে ছদ্ম ধারণা (Pseudo-concept)। একটি শব্দের উৎপত্তির সময় যে অর্থ ছিল ধীরে ধীরে সময়ের পরিবর্তনে সেই অর্থ পরিবর্তিত হয়ে নতুন অর্থ সৃষ্টি করতে পারে। এভাবেই ছদ্ম ধারণার উদ্ভব হয়। মূলত একটি শব্দের অর্থ নির্ধারিত হয় তার প্রয়োগের মানদন্ডের উপর। তিনি বলেন, যদি কেউ একটি নতুন শব্দ æTeavy" উদ্ভাবন করেন এবং কোন জিনিস teavy এবং কোন জিনিস নয়- তা বলে দেন, আমরা তখন এই শব্দের অর্থ জানার জন্য তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এর প্রয়োগের মানদণ্ড কী,কিংবা কীভাবে তিনি এর অর্থ নির্ধারণ করলেন? তখন আমরা তার কাছ থেকে উত্তর পাব না, তিনি বলবেন এ ব্যাপারে তার কাছে কোনো অভিজ্ঞতামূলক প্রমাণ নেই। তখন আমরা বলব আসলে এই ধরনের শব্দ প্রয়োগের কোনো বৈধতাই নেই। অথবা কেউ toovy নামে আরেকটি শব্দ উদ্ভাবন করে বলে দিলেন এর মানে হচ্ছে quadrangular (চতুর্ভাজাকার)। এই ধরনের সমার্থক শব্দ উদ্ভাবন করলে তিনি ছাড়া এটা কেউই বুঝবেন না। সুতরাং এধরনের শব্দ আবিষ্কার করে তা অন্য একটি শব্দের সমার্থক বলে চালিয়ে দেওয়াটা একটা হাস্যকর ব্যাপারও বটে।

ii. আধিবিদ্যক শব্দ অর্থহীন[১৯] ঃ

কার্নাপ এ ধরনের অর্থহীন, অপ্রাসঙ্গিক শব্দের সাথে আধিবিদ্যক শব্দকে তুলনা করে অর্থহীন বলে মন্তব্য করেন। যেমন- একটি শব্দ æPrinciple"- যা সত্তার নীতি নিয়ে কথা বলে। অনেক অধিবিদ

এটা ব্যাহার করেছেন বিশ্বজগতের সর্বোচ্চ নীতি হিসেবে। আমরা অধিবিদ্যাকে যদি প্রশ্ন করি,'x হচ্ছে y'এর নীতি এই বাক্যটি কিসের ভিত্তিতে সত্য বা মিথ্যা হবে, অধিবিদ তখন হয়ত বলবেন y, x এর সত্তার মধ্যেই বিদ্যমান, কিন্তু অধিবিদ এখানে কোনো অভিজ্ঞতামূলক পর্যবেক্ষণযোগ্য সম্পর্ক আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হন। Principle শব্দটির মূল Principium যার অর্থ সূচনা (beginning) এই মূল অর্থ বাদ দিয়ে অধিবিদ একে রূপক অর্থে ব্যবহার করেন। এমনি আরেকটি শব্দ God. এই শব্দটির ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায় ৩টি পরিস্থিতিতে এর ৩টি অর্থ প্রকাশ পায়,

(১) Mythological বা পৌরানিক ব্যবহারে এর অর্থ, এমন একটি দেহ বিশিষ্ট সত্তা যাকে অলিম্পাস পর্বতে রাখা হয়েছে যা শক্তি, ক্ষমতা, প্রজ্ঞার প্রতীক।

(২) কখনো এটা আধ্যাত্মিক সত্তার নির্দেশ করে, যার মানুষের মত দেহ নেই কিন্তু প্রত্যক্ষ বস্তু বা প্রক্রিয়ারূপে বিদ্যমান। এই দুই অর্থে God এর অর্থ যাচাই করা যায়।

(৩) অন্যদিকে এর আধিবিদ্যক প্রয়োগ এমন কিছুকে নির্দেশ করে যা অভিজ্ঞতার সীমার উর্ধ্বে। কিন্তু এই তৃতীয় অর্থের সাথে পূর্বের দুই অর্থের সংযোগ নেই। এভাবে God তার মূল অর্থ হারিয়ে ফেলে এবং এক্ষেত্রে God এর যে সংজ্ঞা দেওয়া হয় তা Pseudo definition. এখানে যৌক্তিক নিয়মের লঙ্ঘন হয়েছে এবং সত্যতা যাচাইয়ের কোনো মানদণ্ড নেই।

একইভাবে Idea, Absolute, Unconditioned, Infinite, the being of being, non being, thing in itself, absolute spirit, essence, the Ego, ইত্যাদি সমস্ত আধিবিদ্যকে শব্দ অভিজ্ঞতার নিরিখে যাচাই করা যায় না, তাই অর্থহীন, যেমনটি আমরা teavy বা Toovy এর ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছি।

iii. বাক্যের অর্থপূর্ণতা[২০] ঃ

শব্দের অর্থপূর্ণতার আলোচনায় কার্নাপ দেখিয়েছেন যেহেতু আধিবিদ্যক শব্দকে অভিজ্ঞতার আলোকে যাচাই করা যায় না তাই অর্থহীন। এখন তিনি বলবেন বাক্য রীতি না মানলে বাক্য গঠন হতে পারে না। যেমন:

১. সিজার হচ্ছেন এবং

২. সিজার একটি মৌলিক সংখ্যা

এখানে প্রথম বাক্যে বাক্যরীতি লংঘন করা হয়েছে। কোনো বাক্যের বিধেয় অব্যয় হতে পারে না, তা অবশ্যই একটি বিশেষ্য বা বিশেষণ হবে। যদি বলি সিজার একজন সেনাপতি তাহলে তা অর্থপূর্ণ হতে পারে। ২য় বাক্যটিতে বাক্যবিধি লংঘন করা হয়নি, কারণ এখানে প্রথম বাক্যের সমস্যা নেই। তা সত্ত্বেও এটা অর্থহীন, কারণ একটি সংখ্যার ক্ষেত্রেই কেবল বলা যায় এটা মৌলিক সংখ্যা, কোনো ব্যক্তির স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতিবাচক কিছুই এখানে নেই।

iv.আধিবিদ্যক বাক্য- ছদ্ম উক্তি[২১] ঃ

উপরিউক্ত দৃষ্টান্ত আধিবিদ্যক বাক্যের ক্ষেত্রে প্রদর্শন করা যায়। কার্নাপ হাইদেগারের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন- What about this Nothing? Does the nothing exist only because the Not, i.e. the negation exists? তিনি প্রশ্ন করেন, আমরা Nothing কে কোথায় খোঁজ করতে চাই? কীভাবে Nothing কে পেতে পারি? আসলে যার অস্তিত্ব নেই তার খোঁজ আমরা পেতে পারি না। এ ধরনের বাক্য ব্যাকরণগত ভুল ও যৌক্তিক নিয়মেও ভ্রান্ত। তাঁর মতে, আধিবিদ্যক উক্তি কেবল কোনো ধারণা বা রূপকথা নয়। রূপকথা যুক্তিবিদ্যার সাথে সাংঘর্ষিক নয় কারণ এগুলো অর্থপূর্ণ যদিও মিথ্যা। আধিবিদ্যক উক্তি কোনো কুসংস্কার নয়, কুসংস্কার সত্য বা মিথ্যা হতে পারে, কিন্তু আধিবিদ্যক উক্তি মিথ্যা বা সত্য নয় বরং অর্থহীন। তথাকথিত 'মানবীয় জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা' অধিবিদ্যাকে রক্ষার একটি প্রচেষ্টা। এই মত অনুযায়ী আধিবিদ্যক উক্তিগুলো কোন মানুষ কিংবা সসীম সত্তা দ্বারা যাচাইযোগ্য নয়। অধিবিদ্যার প্রশ্নের উত্তর কেবল অসীম সত্তাই দিতে পারেন। কার্নাপ এর উত্তরে বলেন, ৭ সংখ্যাটি কি পবিত্র? জোড় না কি বিজোড়, কোন সংখ্যা খারাপ? এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর কেউ দিতে পারে না। এমনকি অসীম জ্ঞানী কারো পক্ষেও তা সম্ভব নয়। আমরা যে বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারিনা তা অন্যের সহযোগিতায় নিশ্চিত হতে পারি কিন্তু অন্যের সাহায্যে আমরা অর্থহীন,

বোধগম্যহীন কোনো কিছুর জ্ঞান পেতে পারিনা। সুতরাং কোনো দেবতা বা কোনো শয়তান আমাদেরকে আধিবিদ্যক জ্ঞান দিতে পারেনা।

কার্নাপ এর পর সব ধরনের আধিবিদ্যক বচনকেই অর্থহীন বলে দাবি করেন। একইভাবে এয়ারের গ্রন্থেও আমরা দেখতে পাই সব আধিবিদ্যক বচন অর্থহীন। এয়ার দেকার্তের cogito ergosum কে মিথ্যা বলেন। তাঁর ভাষায়- Infacthe was wrong, because non cogito would be self-contradictory only if it negated itself: and this no significant proposition can do.[২২] দেকার্ত বুদ্ধির মাধ্যমে জ্ঞানের উৎপত্তির কথা বলেন এবং সহজাত ধারণার মাধ্যমে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। যেহেতু এসব জিনিস অভিজ্ঞতার মানদন্ডে, পরখনীতির আলোকে যাচাই করা যায় না এজন্যই এয়ার এগুলোকে অর্থহীন বলে বর্জন করেন।

ঘ. নীতিবিদ্যা বর্জন

এয়ারের মতে, প্রচলিত নৈতিক পদ্ধতিগুলো যথার্থ নয়। এগুলো অধিবিদ্যার সাথে জড়িত। নৈতিক দার্শনিকগণ এগুলো দিয়ে কী চান; আবিস্কার করেন বা প্রমাণ করেন তা বোঝা খুব কঠিন।[২৩] তবে ১০ বছর পর তাঁর মতের পরিবর্তন ঘটে। তিনি বলেন, ... a man who is convinced utilitarian may simply mean by calling an action right that it tends to promote, or more probably that it is the sort of action that tends to promote, the general happiness; and in that case the validity of his statement becomes an empirical matter of fact. Similarly, a man who bases his ethical upon his religious views may actually mean by calling an action right or wrong that it is the sort of action that is enjoined or forbiddent by some ecelesiastical authority; and this aslo may be empirically verified.[২৪] শ্লিক বলেন, নীতিবিদ্যা আমাদের কোনো আদর্শনিষ্ঠ জ্ঞান দেয় না, কারণ এই অর্থে নীতিবিদ্যা অর্থহীন যেহেতু তার পরখ করা যায় না। তাঁর মতে, Ethics is the descriptive scienntific theory- আর এই অর্থে মানুষ স্বভাবতই আনন্দকে ব্যথায় উপর অগ্রাধিকার দেয়।[২৫] অর্থাৎ প্রত্যক্ষবাদী নীতিবিদ্যা অনেকটা উপযোগবাদী মতের কাছাকাছি।

নীতিবিদ্যার ব্যাপার ভিটাগেনস্টাইনের মত ছিল, জগতে প্রত্যেক জিনিস নিজের মতই আছে এবং প্রতিটি ঘটনা নিজের মতই ঘটে। এতে মূল্য বলতে কিছু নেই। [২৬]তিনি সিদ্ধান্ত টানেন, So too it isimpoossible for there to be propositions of ethics.[27] কার্নাপ তাঁকে অনুসরণ করেন নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে। তাঁর মতে, গতানুগতিকনীতিদর্শন তথ্যের অনুসন্ধান নয়, বরং কী শুভ আর কী অশুভ, কী করা ঠিক আর কী করা ঠিক নয় তার একটি ভানপূর্ণ অনুসন্ধান।[২৮]

প্রত্যক্ষবাদীগণের মূল স্লোগান ছিল ভাষার দুর্বোধ্যতা দূর করে সম্পূর্ণ স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন আদর্শ ভাষা আবিষ্কার যেখানে বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ নীতি এবং যুক্তিবিদ্যার বিশ্লেষণী পদ্ধতি অনুসৃত হবে। তাদের বিশ্বাস ছিল- এ ধরনের আদর্শ ভাষা প্রণয়ন করা গেলে যে কোনো সমস্যার দ্রুত সমাধান সম্ভব হবে। এ আদর্শ ভাষার কষ্টি পাথরে যেসব সমস্যার সমাধান করা যাবেনা। যেগুলোকে অবশ্যই নিরর্থক বলে প্রত্যাখান করতে হবে। এক্ষেত্রে অটো নিউরেথের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। তবে বাস্তবতা হলো দীর্ঘদিনের চেষ্টার পরও এ ধরনের আদর্শ ভাষা প্রণয়ন তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। সমালোচকদের মতে এটা কখনো সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।[২৯]

সমালোচনা

যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ শুরু থেকে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ে। এই সমালোচনায় তাঁদের অনুসারীদের মধ্যে অনেকেরই আত্মসমালোচনা লক্ষ্য করা যায়। ভিটগেনস্টাইন Tractatus লিখে যে সুনাম অর্জন করেছিলেন, সে ব্যাপারে জীবদ্দশায় আর মুখ খুলতে উৎসাহ বোধ করেননি, যার ফলে তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ Philosophical Investigation পূর্ব-মতের প্রচুর সংশোধনীসহ মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছিল। এজন্যই তাঁকে প্রাথমিক ও পরবর্তী ভিটগেনস্টাইন রূপে চিহ্নিত করা হয়। এ.জে. এয়ার ২৪ বছর বয়সে Language Truth and Logic এ যে মন্তব্য করেছেন ১০ বছর পরের সংস্করণে তার অনেক কিছুই সংশোধন করেন। মরিজ শ্লিক, কার্নাপসহ অনেক অনুসারীদের মধ্যেই এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

প্রত্যক্ষবাদের বিরুদ্ধে প্রথম সমালোচনা দেখা যায় কার্লপপারের The Logic of Scientific Discovery(১৯৩৪), গ্রন্থে, তিনি এখানে verifiablity principle এর পরিবর্তে falsification principle প্রতিস্থাপন করেন।[৩০] তিনি অর্থহীন বচন থেকে অর্থপূর্ণ বচনের পার্থক্যের সাথে সম্মত ছিলেন না, বরং তাঁর মত ছিল আধিবিদ্যক বচন থেকে বৈজ্ঞানিক উক্তিকে পার্থক্যকরণ। প্রত্যক্ষবাদীদের মত তিনি দাবি করেন নি, আধিবিদ্যক উক্তি অবশ্য অর্থহীন হবে, তিনি দাবি করেন, কোন মতবাদ বা উক্তিকে আমরা প্রায়োগিক বা অভিজ্ঞতা প্রসূত বলব কেবল তখনই, যখন একে প্রায়োগিকভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা যাবে। আধিবিদ্যক বচন অমিথ্যায়নাযোগ্য বা অবৈজ্ঞানিক হলেও অর্থহীন নয়। কোনো মতবাদের সূত্রপাত ঘটে কল্পনাপ্রসূত অনুমান হিসেবে আর পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য হলো বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে এদের মিথ্যা প্রমাণ করা। অনুমানকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার সংকল্পই বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির পরিচায়ক।[৩১]

রাধাকৃষ্ণণ যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের সমালোচনা করে বলেন, ... in their youthful enthusiasm for the reformation of philosophy and a rather blind respect for science, the positivitsts propound doctrines which not only through metaphysics in to the sphere of the meaningless but also turn some of the basic elements of science, e.g. the universal propositions expressing laws, causality, etc. into meaningless statement. But it is still more amusing to note that this criterion of meaning based on empirical verifiablity renders, as wittgenstein and others have to admit, the very sentences containing the criterion and other rules of syntax meaningless. Because these sentences are about sentences and not about empirical facts which only the latter sentences refer to.[32]

এইচ. ডি. লিউইস[৩৩] যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের যে সমালোচনা করেন তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, কিছু উক্তি এমনও আছে যা সম্পূর্ণ সঠিক, স্বাভাবিক ব্যাকরণগত নিয়মের অধীন এবং

প্রকৃতপক্ষে যাকে দেখতে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, কিন্তু বাস্তবে তার আদৌ কোনো অর্থ নেই। কারণ অভিজ্ঞতায় যাচাই করা সম্ভব নয়। যেমন, মধ্যাকর্ষণ শক্তি। এই শক্তিকে উপলব্ধি করা যায় কিন্তু যাচাই করা যায় না। পরখনীতির মানদেণ্ড তা গৃহীত হতে পারে না। কিন্তু আমাদের মেনে নিতে হবে। রাধাকৃষ্ণণের কথার সাথে এখানে তাঁর মিল রয়েছে।কার্নাপ আধিবিদ্যক শব্দকে অর্থহীন বলেছেন বিভিন্ন ব্যাখ্যার মাধ্যমে, যা সঠিক নয়। যেমন, state কিংবা society (বড় হাতের S যুক্ত) দ্বারা বোঝানো হত কয়েক ধরনের রহস্যপূর্ণ সত্তা বা তাদের আকৃতিকে এবং তাদের এক একজন সদস্যের জীবন ও ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করতে। কিন্তু বর্তমানে এই শব্দের রূপক অর্থ ব্যবহৃর হচ্ছে। একইভাবে ধর্ম তত্ত্ববিদগণ যুগ যুগ ধরে একজন পৌরানিক মানুষ (Mythical `man') শব্দটি ব্যবহার করে আসছেন যার পতনের জন্য তারা অনুশোচনা করেন। অথচ আমরা এখন সবাই `man' (মানুষ) রূপেই পরিচিত। ভাষাতাত্ত্বিক সংশয়ের জন্য আমাদের অনুশোচনা করা উচিত কিন্তু এই ধরনের সংশয় নিঃসন্দেহে কিছু অশুভ ধারণাকেই সত্য বানাতে সাহায্য করছে।

লিউইসের মতে, এই ধরনের ভাষাতাত্ত্বিক সমস্যা অতীতে অনাবিস্কৃত ছিল না। প্লেটো ও এরিস্টটল ভাষার ভ্রান্তির ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন এবং সবসময় সতর্ক বিশ্লেষণের জন্য চেষ্টা করতেন যেন উদ্দীষ্ট বিষয় ভুলভাবে, ভ্রান্ত যুক্তির মাধ্যমে বাতিল করা না যায়। অন্য দার্শনিকগণও প্লেটো ও এরিস্টটলকে অনুসরণ করে শব্দের প্রতারণার বিরুদ্ধে সতর্ক ছিলেন, কিন্তু তাঁরা ভাষাতাত্ত্বিক দার্শনিক ছিলেন না। ডেকাটের সহজাত ধারণার সমালোচকদের তিনি বলেন, instinct এর একটি স্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে। আমরা পাখিদের দেখি কোনো প্রশিক্ষণ ছাড়াই, বিশেষত সচেতন মনোযোগ ছাড়াই তারা তাদের বাসা তৈরি করছে। তারা অন্যদেশে চলে যাচ্ছে এবং পরের বছর আবার নিজের বাসায় ফিরে আসছে। এটা বোঝা খুব কঠিন, কীভাবে এগুলো হচ্ছে। আরেকটি শব্দ telepathy- কোনো মাধ্যম ছাড়াই অন্যের মনকে অনেক দূর থেকে উপলব্ধি করা। কোনো কোনো মানুষের পক্ষে এটা হয়ে থাকে বলেই শব্দটির উদ্ভাবন হয়েছে। এসবের ক্ষেত্রে পরখনীতির প্রয়োগ সম্ভব নয়।

অধিকাংশ ভাষাতাত্ত্বিক মনে করেন, আমাদের যদি কোনো ব্যাপারে স্পষ্ট অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞান না থাকে তাহলে সেটা ভাষায় ব্যবহারের অযোগ্য। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সংশয়পূর্ণ হলেও সে সব ভাষার মাধ্যমে বুদ্ধির চর্চা হতে পারে। যেমন, কাউকে একটি বর্গাকার ক্ষেত্রের গল্প বলা যে, এটা কোনো এক সময় একজন ব্যক্তি কর্তৃক উদ্ভাবিত হয়, যার সম্পর্কে অনেক কিছু বলা যায়। কারণ কেউ তার সম্পর্কে

জানে না। এক্ষেত্রে তার প্রসঙ্গে বিভিন্ন কথামালা ছড়িয়ে পড়ে, এমনকি পরস্পর-বিরুদ্ধ কথা যুদ্ধের দিকেও ধাবিত করে। ঐতিহাসিক তখন হিসাব করতে শুরু করবেন, কেউ হয়ত অন্যদের চেয়ে আরো সঠিকভাবে গল্পটি বলবেন, কেউ আরো সুন্দর বাচনভঙ্গি এবং রঙ দিয়ে বর্ণনা করবেন এবং অন্যরা বিভিন্ন উদ্দেশ্যের সাথে মিলিয়ে উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে যাচাই করবেন। কিন্তু এই কাজের জন্য যদি একটি সীমানা নির্ধারণ করে দেওয়া হয় তাহলে তাহবে সম্পূর্ণ নির্বোধের কাজ।

জুলিয়াস রুডলফ ভেনবার্গের An Examination of Logical Positivism (১৯৩৬) গ্রন্থে প্রত্যক্ষবাদের চুলচেরা বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করা হয়।[৩৪] তিনি প্রত্যক্ষবাদীদের মতের আলোকেই অধিবদ্যার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেন। প্রত্যক্ষবাদীদের মতে All assertions of metaphysical charecter are non-empirical.দ্বিতীয়ত এ ধরনের উক্তি পূর্বানুমান। তাঁর মতে, দেকার্ত, স্পিনোজা, লাইবনিজ অধিবিদ্যার পক্ষে আরোহমূলক যুক্তি দেন। এই আরোহ কিছু স্বত:সিদ্ধ থেকে হয়ে থাকে। আর প্রথমত এই স্বত:সিদ্ধগুলো আবেগ নির্ভর বা সাধারণ বিশ্বাস নয় বরং এগুলো নিশ্চিত ও প্রমাণিত সত্য। দ্বিতীয়ত যুক্তিবিদ্যার যথাযথ প্রক্রিয়া অবলম্বন করেই অবরোহের সিদ্ধান্ত অনুসৃত হয়। প্রত্যক্ষবাদীদের পরখনীতি The meaning of a proposition is its verification, এটাও পূর্বানুমান নির্ভর উক্তি। এই উক্তির মধ্যেই স্ববিরোধ বিদ্যমান। এর অর্থ একটি বচনকে যদি আদৌ যাচাইযোগ্য হতে হয় তাহলে অবশ্য এর যাচাইয়ের আগেই অর্থ থাকবে। এবং মিথ্যাবচনের কোনো অর্থই থাকবেনা। ভেনবার্গ আরো বলেন, তাঁরা বচনকে অর্থপূর্ণ ও অর্থহীন নামে দুভাগ করেন; বলেন কেবল অর্থপূর্ণ বচনই যাচাইযোগ্য। এটা এক ধরনের tautotogy- অর্থহীন বচন যাচাইযোগ্য নয়। তাহলে পরখনীতির ব্যর্থতা কেবল তাত্ত্বিক নয় ব্যবহারিকও বটে। যখন বলা হবে একটি বচন তাত্ত্বিকভাবে যাচাইযোগ্য নয় এর অর্থ প্রকৃতিতে কোনো যাচাই নীতি থাকতে পারেনা। চাঁদের অপর পাশ্বে কী আছে বা তারকার মধ্যভাগে কী আছে তা যাচাই করার কোনো উপকরণ আমাদের কাছে নেই। এটা প্রযুক্তিগত সমস্যা। তাছাড়া চাঁদের অন্ধকার পাশে একটি পাহাড় আছে সেটা তাত্ত্বিকভাবে যাচাইযোগ্যও হতে পারে। কিন্তু Adjectives love analysis এটা সেই ধরনের উক্তি নয়।

জন পাসমোর সহ অনেক দার্শনিক প্রত্যক্ষবাদকে মৃত বলে বর্ণনা করেন যা কখনো ফিরেআসবে না। ১৯৭০ এর দশকে প্রত্যক্ষবাদের একজন প্রধান প্রবক্তা এ.জে. এয়ার একটি সাক্ষাৎকারে মন্তব্য করেন, I suppose the most important (defect) was that nearly all of it was false. [36]

তথ্য নির্দেশ

1. Pormore, John,*A Hundred Years of Philosophy*, London, Penguin Books, 1966, P-367

2. http://www.en.wikipedia.org/weatgentstin

3. Shlick, M.,*Positivism an Realism*; is A.J. Ayer,ed, *Logical Positivism*, Illinois, the Free Press, 1959, P-82-107.

4. www.iep.utm.edu/logicalpositivism

5. http://plato.stanford.edu/logicalpositivism

6. Passmore, J.,*Logical Positivism*. In P. Edqards(ed.) *The Encyclopedia of Philosophy* (Vol-5) New.york:MacMillan, 1967. P-377

7. Ibid,P.52-57

8. Wittgenstein,*Tractatus Logico Philosophicus*, London, Routledge.Qarics, 1922, P-3

9. Ibid,P- (x).(Introduction by B. Russell)

10. আমিনুল ইসলাম, *সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শন*, ঢাকা ,বাংলা একাডেমি, ১৯৮৮,পৃ.৩৭৭

11. Ayer, A.J.,*Language, trufh and Logic*, London, 1945, P- 21.

12. Moritz Schlick,*Meaning and Verification*, Philosophical review XLV, Jul- 1936,In Quoted from*Philosophy of Recenttimes* Vol-11, P- 385

13., Ayer, A.J., *Language, trufh and Logic*P- 48

14. Ibid, P.50

15. Ibid, P- 17

16. *সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শন*, পৃ: ৩৬১

17. Rudolf Carnap,*The Elimination of Metaphysics Through Logical Analysis of Language* in A.J. Ayer (ed.) *Logical Positivism*, New York, The Free man Prem, 1966, P-61.

18.Ibid, P-61-64

19.Ibid,P-65-67

20.Ibid,P-67

21.Ibid, P-69-73

22*. LanguageTruth and Logic*, P-136

23.Ibid, P-137

24.Ibid, P-28

25.*www.encyclopedia.unbelief*

26. *Tractatus Logico Philosophies* 6.41

27.Ibid, P-42

28*. সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস*, পৃ: ৩৭০

29. প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৬৮

30. *www.wikipedia*

31.*সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শন*, : পৃ: ৩৬৩

32. Radhakrishnam,(ed.) ,*History of Philosophy*, Queted by Muhammad Ruhul Amin Scince, *philosophy and Religion*, Dhaka, 1979, P-111.

33. Lewis, H.D.,*Our Experience of God*, London, 1959, P-28-36

34. ,An Examination of Logical Positivism

35. Parsmore, J., Logical Positivism, In P. Fdwards (ed. The Ercyclopedia of Philosophy, Vol- 5, P-57.

36.http://www.wikipedia/A.J. Ayer

৪র্থ অধ্যায়

বর্তমান সময়ে অধিবিদ্যার প্রাসঙ্গিকতা

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে ডেকার্ত থেকে হেগেল পর্যন্ত সময়টিকে বলা হয় আধুনিক দর্শন। হেগেল পরবর্তী সময় থেকে চলমান সময়টি সমকালীন যুগ নামে পরিচিতি। সমকালীন যুগে দর্শনের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদ ব্যাপক প্রসার লাভ করে। এসবের যোগসূত্র পূর্ববর্তী দর্শনে থাকলেও যুগের প্রেক্ষাপটে এগুলো নতুনভাবে বিশ্বকে প্রভাবিত করে। দর্শনের আজন্ম সমস্যা ভাববাদ ও জড়বাদের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বে কখনো ভাববাদকে বিজয়ী আবার কখনো জড়বাদকে বিজয়ী হতে দেখা যায়। তবে ভাববাদীগণ কখনোই বিজয়ী আবার কখনো জড়বাদকে বিজয়ী হতে দেখা যায়। তবে ভাববাদীগণ কখনোই তাদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন না এবং জড়বাদীগণও তাদের আদর্শ বিসর্জন দেননা। সমকালীন ভাববাদের প্রধান প্রেরণা ছিলেন হেগেল। হেগেলের অনুসরণ করেই পরবর্তী বৃটিশ, ফরাসী, জার্মান ভাববাদ বিকশিত হয়। অন্যদিকে ভাববাদ বিরোধী ধারাটি বিবর্তনবাদ, প্রয়োগবাদ, অস্তিত্ববাদ, বিশ্লেষণী দর্শন, যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ প্রভৃতি নামে প্রচারিত হয়। আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এই অধ্যায়ে আমরা অন্যান্য ধারাগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করার সাথে অধিবিদ্যার প্রেক্ষাপটকেও তুলে ধরার চেষ্টা করব। বর্তমান সময়টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। এখন ভাববাদ, আধিবিদ্যা, ধর্ম ইত্যদির প্রভাব ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। কিন্তু তবুও

অধিবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা ফুরায়না। কয়েকজন বিজ্ঞানী এ সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক কিছু কথাও এখানে উল্লেখের চেষ্টা করব।

বিবর্তনবাদ

বৃটিশ জীব বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন (১৮০৯-৮২) দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে সামুদ্রিক জাহাজে চড়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে অসংখ্য জৈব উপাত্ত সংগ্রহ করে পঁচিশ বছর যাবত সেগুলির উপর গবেষণা চালিয়ে সিদ্ধান্ত নেন পৃথিবীর মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তু বর্তমানে যে অবস্থায় আছে প্রারম্ভিক অবস্থায় সেটা ছিলনা। তিনি সিদ্ধান্ত নেন মানুষ বানর থেকে এসেছে। তাঁর এই সিদ্ধান্তে ১৮৫৯ সালে তাঁর origin of species গ্রন্থে প্রকাশিত হওয়ার পর বৃটেন ও অন্যান্য দেশে এর বিরুদ্ধে তুমূল সমালোচনা ও বিতর্ক শুরু হয়। তবে ডারউইনের আগেও ফরাসী বিজ্ঞানী লা প্লাস (১৭৪৯-১৮২৭), লামার্ক (১৭৪৪-১৮২৯) এর বিবর্তনবাদ সম্পর্কিত তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। এগুলো ছিল যান্ত্রিক জৈবিক বিবর্তন সংক্রান্ত। বর্তমান সময়কালের জড়বাদীগণ এই বিবর্তনবাদ দ্বারা ব্যাপক প্রভাবিত হন।

যান্ত্রিক বিবর্তনের মূল কথা হলো, পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম (struggle for existence) করে। শীত, গ্রীষ্ম, তাপমাত্রা ইত্যাদি প্রাকৃতিক কারণে অনেক প্রাণী পৃথিবী থেকে হারিয়ে যায়, যারা জীবিত আছে তাদের মধ্যেও বিভিন্ন পরিবর্তন সূচিত হয়। এই পরিবর্তনকে বলা হয় আকস্মিক বা স্বতস্ফূর্ত পরিবর্তন ।এই পরিবর্তন অনুকূল হলে তা টিকে থাকবে এবং প্রতিকূল হলে তা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এটাকে বলা হয় Survival of the fittest বা যোগ্যতমের বেঁচে থাকা। এখানে কোনো উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনার স্থান নেই। যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ মানুষকে যন্ত্রের মত করে উপস্থাপন করে। পরবর্তী অনেক জীববিজ্ঞানী প্রমাণ করেন এই মতবাদ ছিল ভুল। তবে এর বিপরীতে ধর্মবিশ্বাসী ও অধিবিদগণ উদ্দেশ্যমূলক বির্তনের কথা বলেন এবং তার সূচনা প্লেটো এরিস্টটল থেকেই। যান্ত্রিক বিবর্তন বা ডারউইনের প্রভাবিত জড়বাদী দার্শনিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হার্বাট স্পেনসার (১৮২০-১৯০৩)।

স্পেনসারই বিবর্তনবাদী বৈজ্ঞানিক মতবাদকে দর্শনে নিয়ে আসেন। তবে স্পেনসার ডারউইনের গ্রন্থ প্রকাশের আগেই জৈবিক বিবর্তনবাদের ধারণা দেন। তাঁর মত ছিল অর্জিত বৈশিষ্ট্যের সংক্রমনের কারণেই বিবর্তন ঘটে যেখানে ডারউইনের মত ছিল প্রাকৃতিক নির্বাচন।অবশ্যই তিনি পরে ডারউইনের অনুসরণ করেন এবং যোগ্যতমের টিকে থাকা নীতির সমর্থন করেন।[১]

স্পেনসার একজন সমাজ দার্শনিক হিসেবে অধিকতর পরিচিত ছিলেন এবং সামাজিক বিবর্তনকে তিনি বেশি গুরুত্ব দেন। তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে কয়েকটি হলো- The synthetic philosophy (1896), The principles of psychology, (1855), The principles of sociology (১৮৯৬) প্রভৃতি। এসব রচনায় তার বিবর্তনবাদী দর্শন প্রকাশ পায়। তিনি ছিলেন একজন অজ্ঞেয়বাদী। তাঁর মত ছিল, we can not know anything non-empirical, we cannot know whether there is a God or what its character might be... his general position on religion was agnostic[২] অধিবিদ্যার গতানুগতিক মতাবলী সম্বন্ধে তাঁর মনে ছিল গভীর সংশয়। প্রাচীন পরম্পরাগত আধিবিদ্যক মতাবলী তাঁর কাছে সম্পূর্ণ অনুপযোগী বলে প্রতীয়মান হয় এবং তিনি মনে করেন যে, স্বগত সত্তা ব্যাখ্যা। নয় বরং অভিজ্ঞতার জগতের বস্তু ও ঘটনবালীকে বোঝাই দার্শনিক পদ্ধতির লক্ষ্য।[৩]

তবে অধিবিদ্যা বিরোধী জড়বাদী বিবর্তনবাদের বিপরীত প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রাচীন উদ্দেশ্যবাদী বিবর্তনের আধুনিক সংস্করণ দেখা যায় লয়েড মর্গান ও স্যামুয়েল আলেকজান্ডার এর উন্মেষমূলক বিবর্তনবাদে (emergent evolution)|লয়েড মর্গান (১৮২৫-১৯৩৬) গিফোর্ড বক্তৃতামালায় (১৯২২-২৩) সালে æEmergent Evolution" নামে যে ধারাবাহিক আলোচনা রাখেন তাই উন্মেষমূলক বিবর্তনরূপে পরচিতি পায়। গ্রন্থাকারে তা প্রকাশিত হয় ১৯২৩ (১ম সংস্করণ) এবং ১৯২৭ (২য় সংস্করণ) সালে। অন্য দিকে স্যামুয়েল আলেকজান্ডার (১৮৫৯-১৯৩৭) তাঁর space time and deity, ১৯২০ গ্রন্থেও এই মতবাদ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেন। তাঁদের উভয়ের প্রচেষ্টায় উন্মেষমূলক বিবর্তন যান্ত্রিকতা বিরোধী একটি সুশৃঙ্খল মতবাদে পরিণত হয়। এই মতবাদ অনুসারে বিবর্তন একটি ব্যাপক পরিকল্পনার নাম যেখানে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় প্রত্যেক স্তরে নতুন গুণ বিশিষ্ট বস্তুর আবির্ভাব ঘটে। মর্গানের ভাষায়: Evolution, in the broad sense of the word, is the name we give to the comprehensive plan of sequence in all natural events.[4] জড় থেকে

প্রাণের, প্রাণ থেকে মনের এবং মন থেকে অনুধ্যানী চিন্তার উন্মেষ ঘটে বিবর্তনে। মর্গান আলেকজান্ডারের অনুসারে বিবর্তনকে পিরামিডের সাথে তুলনা করেন।[৫]

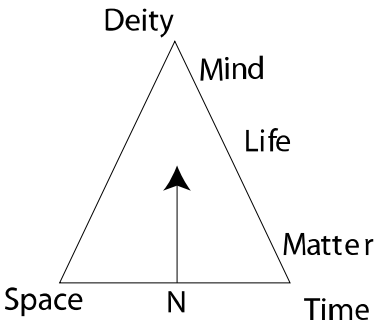

চিত্রে আলেকজান্ডার দেখিয়েছেন বিবর্তনের শুরু জড় থেকে প্রাণ, প্রাণ থেকে মনে। আর এই সমগ্র প্রক্রিয়ায় একটি প্রেরণামূলক তেজশক্তি রয়েছে। এই তেজশক্তির নাম তিনি দেন nisus[৬] লয়েড মর্গান এই তেজশক্তিকেই ঈশ্বর নাম দেন। তাঁর ভাষায়- For better or worse, I acknowledge God as the Nisus through whose Activity emergentis emerge, and the whole course of emergent evolution is directed. Such is my philosophic creed, supplementary to my scientific policy of interpretation.[৭]

আলেকজান্ডারের মতে, অতীতের দার্শনিকরা ঈশ্বরকে জগতের যদি কারণ বলে ভুল করেছেন। ঈশ্বর জগতের আদি কারণ না, বরং বির্তন প্রক্রিয়ায় উন্মেষিত সর্বশেষ সত্তা।[৮]

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ

সমকালীন যুগে অধিবিদ্যা ধর্মের বিরুদ্ধে একটি বিপ্লবী নাম ছিল কার্ল মার্ক্সের (১৮১৮-৮৩) দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ। মার্কস জীবদ্দশায় তাঁর তত্ত্বের বাস্তবায়ন দেখে যেতে পারেননি। কিন্তু ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে মার্ক্সবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়ে ছিল এবং '৯০ এর দশকে সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের আগ পর্যন্ত তা সাড়ম্বরে পৃথিবীর উপর প্রভাব বিস্তার করে চলে। তবে এখনো লাতিন আমেরিকা, চিন সহ বিভিন্ন দেশে মার্ক্সবাদের যথেষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। এই মতবাদ হেগেলের দ্বান্দ্বিকতা ও ফয়েরবাখের বস্তুবাদের মাধ্যমে রূপ লাভ করে। মার্ক্সস এঙ্গেলসের ভাষায়- "আজ পর্যন্ত বিদ্যমান

সকল সমাজের ইতিহাস হচ্ছে শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস। স্বাধীন মানুষ ও দাস, প্যাট্রিশিয়ান এবং প্লিবিয়ান, জমিদার ও ভূমিদাস, গিল্ড কর্তা আর কারিগর, এক কথায় অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত শ্রেণি অবিরাম পরস্পরের প্রতিপ্কষ হয়ে থেকেছে, অব্যাহত লড়াই চালিয়েছে কখনো আড়ালে কখনো প্রকাশ্যে।" ফয়ের বাখ সম্পর্কে মার্কস ১১টি থিসিস লিখেন এবং ১১ নম্বর থিসিসটিই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বা মার্কসীয় দর্শনের মূল কথা।[৯] সেটি হলো "দার্শনিকের কেবল নানাভাবে জগতকে ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু আসল কথা হল তাকে পরিবর্তন করা।"[১০] জগতকে পরিবর্তনের জন্যই মার্কস রূপরেখা প্রণয়ন করেন। অর্থনৈতিক মুক্তিই ছিল তাঁর দর্শনের মূল বিষয়। পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের মাধ্যমে সর্বহারাগণ এক সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে যেখানে থাকবেনা কোনো দ্বন্দ্ব, পার্থক্য, ভেদাভেদ। এই মুক্তির সংগ্রামের জন্য প্রতিবন্ধক ভাববাদী দর্শন, আধিবিদ্যা, ধর্ম ও প্রচলিত নৈতিকতা।

মার্কসবাদ অনুযায়ী ধর্ম যেসব ভ্রাতৃত্ব ধারণায় জন্ম দিয়েছে তার কেন্দ্রীয় অবস্থানে রয়েছে ঈশ্বরের ধারণা। ঈশ্বর হল এক স্থায়ী, অপরিবর্তনীয় সত্তার ধারণা, যা সমগ্র জগতের স্রষ্টা, যা সমগ্র জগতকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। ঈশ্বর হলো এক অতীন্দ্রিয় সত্তা, যা সমগ্র ইন্দ্রিগ্রাহ্য জগতের আদি কারণ। ইতিহাসের বাস্তবাদী ধারণা ঈশ্বর নামক এই ভ্রান্ত ধারণা নাকচ করে দিয়েছে এই যুক্তিতে যে, আদিম পরিবেশে না ধরনের ভয় যেমন, নিরাপত্তাহীনতা, অসহায়ত্ব, মৃত্যু ভয় ইত্যাদি থেকে ঈশ্বরের ধারণার উদ্ভব।[১১] মার্কস বাদ অনুযায়ী নৈতিকতারও কোনো চিরন্তন উৎস বা নিয়ম নেই। ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় এসব ধারণা স্থায়ী নয়, সমাজের বাস্তব অবস্থা পরিবর্তনের সাথে সাথে এগুলোও পরিবর্তিত হয়। এঙ্গেলস মাকর্সবাদকে ডারউইনের তত্ত্বের সাথে তুলনা করেন।

প্রয়োগবাদ

১৮৭০ এর দিকে আমেরিকায় এক নতুন দার্শনিক চিন্তার আবির্ভাব ঘটে। এর আগে মার্কিনিদের নিজস্ব কোনো দার্শনিক মত আবিষ্কৃত হয়নি। মূলত বিজ্ঞানের নানান আবিস্কার নিয়েই তাদের বেশি বাস্তব থাকতে দেখা যায়। তবুও সি.এস পার্স (১৮৩৯-১৯১৪) ও উইলিয়াম জেমস (১৮৪২-১৯১০) এর নেতৃত্বে Pragmatism (প্রয়োগবাদ) নামক একটি বাস্তববাদী জীবনমুখী দার্শনিক চিন্তার রূপায়ন

ঘটে। পার্স ১৮৭৮ সালে Popular science monthly (January, 1878) তে How to make our Ideas clear শীর্ষক রচনায় প্রথম প্রয়োগবাদ সম্পর্কে ধারণা দেন। আমাদের ধারণাগুলোকে স্পষ্ট করার জন্য এই মতের উদ্ভব। তিনি শুরুতেই বলেন, A clear idea is defined as one which is so apprehended that it will be recognized wherever it is met with, and so that no other will be mistaken for it. If it fails of this cleanner, it is said to be obscure.[13] প্রয়োগবাদের নীতিমালা ও পদ্ধতি পার্সই ব্যাখ্যা করেন। তাঁরই বন্ধু ও সহকর্মী উইলিয়াম জেমস পরবর্তীতে এর বিকাশ সাধন করেন। জেমস তাঁর pragmatism: A new name for an old way of thinking, (১৯০৭), বক্তৃতা মালায় এবং Essays in Radical Empiricism রচনায়- প্রয়োগবাদকে ব্যাপক আকারে উপস্থাপন করেন। জেমস Pragmatism বক্তৃতামালা জন স্টুয়ার্ট মিলকে উৎসর্গ করেন। জেমস মনে করেন, মানুষ অভিজ্ঞতাবাদের সমর্থক হয়েও ধর্মীয় বিশ্বাসের সন্ধান করেন দর্শনে। কিন্তু অভিজ্ঞতাবাদী দর্শন ধর্মীয় ভাবাপন্ন নয় এবং ধর্মীয় দর্শনও উদ্দেশ্য অর্জনে যথেষ্ট অভিজ্ঞতামূলক নয়। আর প্রয়োগবাদ এ দুটির সমন্বয় করতে চায়।[১৪]

তাঁর ৩য় ভাষণে Some metaphysical problems pragmatically considered- এ তিনি অধিবিদ্যার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করেন। এবং ৮ম ভাষণে Pragmatism and Religion- এ তিনি ধর্মের অবদানের কথাও স্বীকার করেন। তবে প্রয়োগবাদ অনুযায়ী যা কিছু মানুষের জীবনে কাজে লাগবে তাই প্রয়োজনীয়। জেমসের মতে, ধর্ম বিশ্বাস একটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস যদি বাস্তব ক্ষেত্রে উপকারী হয় তাহলে, এ বিশ্বাস সত্য, এর সমর্থনে কোনো রকম যুক্তি প্রমাণের প্রয়োজন নেই। ধর্ম বিশ্বাসের স্বপক্ষে কোনো যুক্তি থাকুক বা নাই থাকুক ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যাক বা না যাক, ধর্মীয় বিশ্বাসের বাস্তব উপযোগিতা অনস্বীকার্য। যেমন, ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করলে, আত্মার অমরত্বে আস্থা হারালে মানবজীবন নানারকম দ্বন্দ্ব ও অনৈক্যর ঘাত প্রতিঘাতে জর্জরিত হয়ে উঠত। আর এজন্যই প্রয়োগবাদ ধর্মীয় বিশ্বাস বা ধর্মীয় মূল্যবোধকে অগ্রাহ্য করেনা।[১৫]

মূলত প্রয়োগবাদের জন্ম হয়েছিল হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি কেন্দ্রিক "Metaphysical club" এর আলোচনার মাধ্যমে। পার্স ও জেমস এসব আলোচনায় নিয়মিত বসতেন। ১৮৭০ এর দশক

থেকেই এই আলোচনা চলতে থাকে।[১৬] উইলিয়াম জেমস প্রয়োগবাদী অভিজ্ঞতাবাদকে নাম দেন radical empiricism বা মৌলিক অভিজ্ঞতাবাদের মূল কথা হলো ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই জ্ঞানের উৎপত্তি। জেমস ভাববাদীদের মন সংক্রান্ত ধারণার সমালোচনা করেন এবং অভিজ্ঞবাদকেও সম্পূর্ণ অনুসরণ করেন নি।

তাঁর মতের বিশেষত্ব হলো তথ্য বিষয়ক যে কোনো সিদ্ধান্তকে তিনি চূড়ান্ত মনে করেন না বরং ভবিষ্যতের নতুন অভিজ্ঞতার বিচারে তা পরিবর্তন বা সংশোধন হতে পারে বিধায় সব অভিজ্ঞতাকে তিনি সম্ভাব্য বলেন। তার মতে, To be radical, an empiricism must neither admit into its constructions any element that is not directly experienced, nor exclude from them any element that is directly experienced.[১৭] জেমস, জ্ঞানের উৎস হিসেবে দুটি বিষয়কে উল্লেখ করেন তাঁর The meaning of truth গ্রন্থে। এই গ্রন্থের ২য় অধ্যায়ে The Tigers in India শিরোনামে তিনি বলেন, There are two ways of knowing thingks, knowing themimmediately or intutively, and knowing them conceptually or representatively. অর্থাৎ আমরা সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা ও ধারণামূলক পদ্ধতিতে একটি বিষয় জানতে পারি। যেমন, ভারতের বাস সম্পর্কে আমাদের ধারণামূলক জ্ঞান চাক্ষুষভাবে না দেখেও আমরা অর্জন করতে পারি।[১৮]

প্রয়োগবাদের সাথে আরেকটি নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি হলেন আমেরিকান শিক্ষা দার্শনিক জন ডিউই (১৮৫৯-১৯৫২)। জন ডিউই প্রয়োগবাদী মত তার শিক্ষাদর্শনে প্রয়োগ করেন। তিনি ডারউইন দ্বারা প্রভাবিত হন। তিনি ধর্মকে ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন। তবে ধর্মীয় বিশ্বাসকে তিনি ব্যক্তিগত বিষয় বলেন। প্রয়োগবাদের একমাত্র ব্রিটিশ সমর্থক এফ.সি.এস শিলার (১৮৬৪-১৯৩৭) জেমসের অনুসরণ করেন। তবে সত্য বিষয়ক প্রয়োগবাদী মত গ্রহণ করেন। তাঁর মতে সত্য সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগধর্মী। আমার পক্ষে তা ততক্ষনই সত্য, যতক্ষণ তা আমার পক্ষে উপযোগী। যখনই তা আমার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে ব্যর্থ হয়, তখনই তা আমার জন্য মিথ্যা হয়ে যায়। তবে তা যদি সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে তা প্রয়োজনীয়। তিনি প্রয়োগবাদকে বরং মানবতাবাদ (humanism) বলতে বেশি পছন্দ করতেন।[১৯]

প্রয়োগবাদ মানুষের বাস্তব প্রয়োজনের কথা বলে। কোনো ধারণার অর্থ নিহিত থাকে এর প্রয়োগের উপর, এভাবে যা আমাদের জীবনে প্রয়োগ করা যায় তারই কেবল অর্থ আছে। প্রয়োগবাদ কোনো কিছুকে তখনই অস্বীকার করে যখন তা জীবনের জন্য অপ্রাসঙ্গিক বা অপ্রয়োজনীয়।

প্রয়োগবাদ অধিবিদ্যাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেনি। এই মতের বিভিন্ন সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও এটা আসলে সব কিছুকে সমন্বয় করে চলার পক্ষে। এখানে আমরা উপযোগবাদ, দৃষ্টবাদ, অভিজ্ঞতাবাদ, বুদ্ধিবাদ, ভাষাতাত্ত্বিকসহ সব মতবাদের একটি সমন্বয় দেখতে পাই।

অস্তিত্ববাদ

সমকালীন দর্শনে অস্তিত্ববাদ নামটি খুব পরিচিত। অস্তিত্ববাদের দুটি ধারা, একটি আস্তিক্যবাদী অন্যটি নাস্তিক্যবাদী। তবে উভয় চিন্তার মূল কথা হলো ব্যক্তির স্বাধীনতা। Existence precedus ensence "অস্তিত্ব সারসত্তার অগ্রবর্তী" এটাই অস্তিত্ববাদের মূল স্লোগান। বিশিষ্ট দার্শনিক সোরেন কিয়ের্কেগার্ড (১৮১৩-৫৫), ফ্রেডরিক নাটশে (১৮৪৪-১৯০০), মার্টিন হাইদেগার (১৮৮৯-১৯৭৬), জ্যাঁপল সাত্রে (১৯০৫-৮০), সিমন দ্য বুভয়ার (১৯০৮-৮৬) প্রমুখের বিস্তর রচনা ও সাহিত্যে অস্তিত্ববাদ একটি নব্য মতবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।১৯৪০ ও ৫০ এর দশকে ইউরোপ জুড়ে অস্তিত্ববাদ একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলনে রূপ নেয়।[২০] তবে অস্তিত্ববাদের সূচনা ডেনিশ দার্শনিক কিয়েরকিগার্ডের মাধ্যমেই। তাঁকে আধুনিক অস্তিত্ববাদের জনক বলা হয়। ভাববাদী দর্শনের বিরুদ্ধে এ আন্দোলন ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের কথা বলে। মানুষের জীবনটা সংগ্রাম ও কষ্টে ভরপুর। কিন্তু মানুষকে এসব প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে জয়ী হতে হবে। এর জন্য প্রথম প্রয়োজন বিশুদ্ধ চিন্তা বর্জন। ভাববাদীদের কথা ছিল অস্তিত্ব ও সারসত্তা একই অর্থ বিশিষ্ট। কিন্তু অস্তিত্ববাদের যুক্তি অস্তিত্ব সারসত্তার পূর্বেই অবস্থান করে। এই অস্তিত্ব ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্ব। মানুষ নিজের অস্তিত্বের ব্যাপারে যখন সচেতন হবে তখন তার মধ্যে স্বাধীনতা, সাম্য সৃষ্টি হবে। ব্যক্তি যখন আদর্শ ব্যক্তিতে পরিণত হবে তখনই তা আদর্শ সমাজের দিক নির্দেশ করবে। এক্ষেত্রে মার্ক্সবাদী ধারণা ছিল বিপরীত। তবে কিয়োর্কেগাড খ্রিষ্টধর্মে পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন বিধায় তাঁর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে খ্রিষ্টীয় ধর্মের সাথে সমন্বয়ের চেষ্টা করেন। তাঁর মতে স্রষ্টা ও সৃষ্ট ব্যক্তির মধ্যে মিলন সম্ভব, এ মিলন মানে ঐশী সত্তায় বিলীন হয়ে যাওয়া নয় বরং এতে ব্যক্তির

ব্যক্তিত্ব অটুট থাকবে।[২১] অস্তিত্ববাদের আস্তিক্যবাদী ধারায় জেসপার্স ও মার্সেলের নাম উল্লেখযোগ্য।জেসপার্স তিন প্রকার সত্তার কথা বলেন- তথাস্থ সত্তা (being there), আত্মস্থসত্তা (being in-oneself) এবং স্বকীয় সত্তা (being-in-it self). মানুষ যখন স্বকীয় সত্তায় উপনীত হবে তখনই তার পূর্ণতা আসবে। আবার মার্সেলের মতে, একজন অস্তিত্ববাদীর পক্ষে সবচেয়ে বড় বিশ্বতাত্ত্বিক রহস্য হচ্ছে আত্মসত্তার সাথে ঈশ্বর নামে এক অতিবর্তী সত্তার সংযোগ। অস্তিত্ববাদী এই ধারার সাথে অধিবিদ্যার মৌলিক বিরোধ নেই। কারণ অধিবিদ্যার উদ্দেশ্য পরমসত্তার সন্ধান আর অস্তিত্ববাদের উদ্দেশ্য ব্যক্তির পূর্ণতার মাধ্যমে ঈশ্বরের নৈকট্য অর্জন।

কিন্তু অস্তিত্ববাদের আরেকটি ধারা সম্পূর্ণরূপে অধিবিদ্যা রিরোধী। এই মতের প্রধান প্রবক্তা নীটশে। তিনি শোপেন হাওয়রের বিপরীতে 'ইচ্ছা' কথাটিকে তাঁর দর্শনের মূলে নিয়ে আসেন। শোপেন হাওয়ারের কথা ছিল বেঁচে থাকার ইচ্ছাই জগতের সারধর্ম, আর নীটশে বলেন, ক্ষমতা লাভের ইচ্ছার মাধ্যমেই মানুষ বেঁচে থাকে। মানুষ মাত্রই অধিক ক্ষমতা লাভে ইচ্ছুক। আর যে সর্বোচ্চ ক্ষমতা লাভ করতে পারে তাকে তিনি বলেন অতি মানব। প্রতিটি মানুষকে অতি মানব হওয়ার জন্য সাধনা করতে হবে। এভাবে ব্যক্তি মানুষকে তিনি সব কিছুর উর্ধ্বে তুলে ধরেন। ধর্মের সমালোচনার মাধ্যমে তিনি মানুষের স্বাধীনতা অর্জনের পথ দেখান। তাঁর মতে খ্রিষ্টীয় নৈতিকতা দাসসুলভ এবং মানবতাকে তা পঙ্গু করে দিয়েছে।

তাঁর "The Gay science" গ্রন্থে The madman নামক অধ্যায়ে একটি গল্প অবতারণ করেন। একজন পাগল ব্যক্তি ভোর বেলায় একটি বাজারে গিয়ে বলতে থাকে I seek God! I seek God!" একপর্যায়ে উৎসুক জনতার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে বলে, æWhither is God? he cried: I will tell you. We have killed him- you and I. All of us are his murderers. কিন্তু কী করে তার ভাষায়- God is dead, God remains dead.[২২] নীটশে এভাবে সব বন্ধনমুক্ত হয়ে মুক্তমানুষের জয়গান গান। নীটশেকে অনুসরণ করেন-মার্টিন হাইদেগার (১৮৮৯-১৯৭৬)। তিনি Being and Time (১৯২৭) গ্রন্থে অস্তিত্ববাদের বিবরণ দেন। কিয়ের্কেগাডকে অনুসরণ করে তিনিও বলেন মানুষের জীবন সংগ্রামমুখর। তাকে অস্তিত্বের জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হচ্ছে। মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতার জোর সমর্থক তিনি। উল্লেখ্য নীটশে ও হাইদেগার এদুজনই হিটলারের নাজিবাদের সমর্থক ছিলেন। নাস্তিক্যবাদী অস্তিত্ববাদের আরেকজন

বিশিষ্ট সমর্থক জ্যাঁপল সাঁত্রে। তিনি জার্মানীর বিরুদ্ধে ফ্রান্সের পক্ষ নেন ২য় মহাযুদ্ধে। নীটশের মত তিনিও বলেন, ঈশ্বরের ধারণা অযৌক্তিক ও অলীক। সাত্রের মতে মানুষ শব্দটির সাথে অপরিহার্যভাবে যে জিনিসটি বিদ্যমান তা হলো তার অস্তিত্ব।[২৩]

অস্তিত্ববাদ মানুষকে স্বাধীনতা দিতে গিয়ে স্বেচ্ছাচারী বানিয়ে ফেলেছে বলে সমালোচকগণ অভিযোগ করেন। আর এদের দুজন প্রবক্তা নাৎসী পার্টির সমর্থক হওয়ায় সেটাও প্রশ্ন সৃষ্টি করেছে।

উপযোগবাদ

উপযোগবাদ একটি নৈতিক মত। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক এপিকিউরাসের মত ছিল যা সুখ দেয় তাই ভালো। সেখান থেকেই সুখবাদের (Hedonism) সূচনা। আধুনিক যুগে নৈতিক আদর্শ হিসেবে সুখবাদের নব্য সংস্করণ উপযোগবাদ উপস্থাপিত হয়। সর্বাধিক সংখ্যক লোকের জন্য সর্বাধিক সুখ এটাই হচ্ছে উপযোগবাদের মূল কথা। বৃটিশ নীতিবিদ জেরোমী বেনথাম (১৭৪৮-১৮৩২) সর্বপ্রথম এই ধারণাটির ব্যাখ্যা দেন। পরবর্তীকালে জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-৭৩) এই মতবাদটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন। তাঁর æUtilitarianism" গ্রন্থের মাধ্যমে ১৮৬৩ সালে তা প্রকাশিত হয়। নৈতিকতার মানদণ্ড হিসেবে বুদ্ধিবাদ, পূর্ণতাবাদ, বিচারবাদ এর মত এটাও একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মতবাদ। প্রয়োগবাদের আলোচনায় আমরা বলেছি, সেখানে উপযোগবাদের একটা প্রভাব রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আমেরিকানদের কাছে প্রয়োগবাদ যেমনটি, তেমনি বৃটিশদের কাছে উপযোগবাদ আদর্শ নৈতিক মত। উপযোগবাদ অধিবিদ্যাকে স্বীকার করেনা। মিল একজন অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক। এজন্যই তাঁর কাছে আধিবিদ্যক প্রশ্নের ব্যাপারে বিশেষ কোনো আগ্রহ ছিলনা। আধ্যাত্মিক সত্তার ব্যাপারে আমাদের কোনো অভিজ্ঞতা নেই এবং কোনো কল্পনাও আমরা এক্ষেত্রে করতে পারিনা। তবে ঈশ্বরের অস্তিত্বের ব্যাপারে তিনি বলেন এর পক্ষে এবং বিপক্ষেও যুক্তি দেওয়া যায়। তবে সম্পূর্ণ শুভ ও পরম ক্ষমতাধর ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ নেই। জগতে যে দুঃখ কষ্ট ও অন্যায়-অপূর্ণতা লক্ষ্য করা যায়, তাতে প্রমাণিত হয় যে, ঈশ্বর যদি সর্বশক্তিমান হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি দয়ালু নন। আবার তিনি যদি দয়ালু ও নীতিপরায়ন হন তাহলে তাঁর ক্ষমতা অবশ্যই সীমিত।[২৪] তবে উপযোগবাদের ব্যাপারে অভিযোগ উঠলে তিনি বলেন, ঈশ্বর সব কিছুর উপরে তাঁর সৃষ্ট জীবের আনন্দকেই যদি কামনা করেন তাহলে

উপযোগবাদ অধিকতর সুস্পষ্টরূপে একটি ধর্মীয় নীতি।[২৫] উপযোগবাদ সুখকেই একমাত্র কাম্য বস্তু বলে মনে করে। তবে সুখের গুণগত পার্থক্য রয়েছে।

বার্ট্রান্ড রাসেল

বার্ট্রান্ড রাসেল (১৮৭২-১৯৭০) বিগত শতকের সবচে বিখ্যাত দার্শনিক। যুক্তিবিদ্যা, জ্ঞানতত্ত্ব এবং গণিতের দর্শনের উপর তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। একজন সমাজ সংস্কারক ও যুদ্ধের বিপক্ষে শান্তির আন্দোলনের তিনি অগ্রপথিক ছিলেন। তাঁর দীর্ঘ বর্ণাঢ্য জীবন দর্শনের এক অমূল্য গৌরব। ৭০ এর অধিক গ্রন্থ ও প্রায় ২ হাজার প্রবন্ধ রচনা করেন তিনি। ১৯৫০ সালে সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ অর্জন করেন। অবশ্য ১৯২৮ সালে হেনরি বাগসোঁও সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পান। তাঁর পূর্ণ নাম- বার্ট্রান্ড আর্থার উইলিয়াম রাসেল, জন্মগ্রহণ করেন ওয়েলসে ১৮ মে, ১৮৭২। তাঁর পিতামহ লর্ড জন রাসেল রানী ভিক্টোরিয়ার সময় বৃটেনে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। পিতা লর্ড রাসেল ও মাতা লেডি আম্বারলির ২য় সন্তান রাসেল। ৬ বছর বয়সে তিনি বোন, পিতামাতা ও পিতামহকে হারান। তাঁর ভাই ফ্রাংক (যিনি ১৯৩১ এর মারা যান) সহ মাতামহের আশ্রয়ে তিনি বড় হন। নিসঙ্গতা, দুঃখ নিয়ে বড় হন তিনি এবং গৃহ শিক্ষকের কাছে ছাত্র জীবন শুরু হয়। ১১ বছর বয়সেই ইউক্লিডীয় জ্যামিতির উপর তার প্রবল ভালোবাসা তৈরি হয়। ১৮৯০ সালে ক্যাম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে গণিত পড়ার জন্য ভর্তি হলে তাঁর নি:সঙ্গ জীবনের অবসান ঘটে। প্রথম জীবনে হেগেলীয় ভাববাদের প্রতি আকৃষ্ট হলেও অচিরেই তা বর্জন করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ৪ বার বিবাহ করেন। প্রথম স্ত্রী অরাং কে রেখেই মোয়েলের প্রেমে পড়েন ১৯১১ সালে। ১৯২১ এ অষাং কে তিনি ২য় বিবাহ করেন ডোরা ব্লেককে। ১৯৩২ সালে তাকে ত্যাগ করে প্যাট্রিকা স্পেনসকে বিবাহ করেন। ১৯৪৯ সালে ৩য় স্ত্রীকে ত্যাগ করেন এবং ৮০ বছর বয়সে ১৯৫২ সালে এডিথ ফিঞ্চকে বিয়ে করেন। মৃত্যুবরণ করেন ২ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ সালে। রাসেলের উল্লেখযোগ্য রচনা Principa mathematica, problems of philosophy, 1921, Human knowledge, 1st scope and limits, 1948, My Philosophical Developmment ইত্যাদি।[২৬]

বার্ট্রান্ড রাসেল ব্রিটিশ বিশ্লেষণী ও বাস্তববাদী দর্শনের মূল ব্যক্তি। দর্শনে তাঁর বর্ণনাতত্ত্ব (Theory of description), নিরপেক্ষ একত্ববাদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তবে তাঁর বিশেষত্ব ছিল তিনি নিজেই তাঁর রচনার সংশোধন করতেন। এভাবে তাঁর মতের বিবর্তন দেখা যায়, তবে তাঁর মূল চিন্তাধারা ভাববাদ বিরোধীতায় কোনো বিবর্তন হয়নি। তার বর্ণনাতত্ত্বসহ প্রথম ১৯০৫ সালে æOn denoting" প্রবন্ধে প্রকাশিত হয় পরে Principia Mathematica তে আসেন।

রাসেলের আধিবিদ্যক মত হলো neutral monism বা নিরপেক্ষ একত্ববাদ। এই মতবাদ অনুযায়ী, জগত কেবল এক ধরনের উপাদান দিয়ে গঠিত, যা মানসিক নয় এবং জড়ীয়ও নয়। ভাববাদ যেমন মন ছাড়া কোনো কিছুর অস্তিত্ব স্বীকর করেন এবং জড়বাদ জড় ছাড়া নছাড়া সব কিছুকে অস্বীকার করে এই দুই পন্থার মধ্যবর্তী মত হলো নিরপেক্ষ একত্ববাদ যা মনও নয় জড়ও নয়।

তাঁর ভাষায়- Neutral mousism-as opposed to idealistic manism and materialistic monism- is the theory that the things commonly regarded as mental and the things commonly regarded as physical do not differ in respect of any intrinsic property possessed by the one set and not by the other, but differ only in respect to arrangement and context.[27]এর ব্যাখ্যার জন্য রাসেল একটি ডাক নির্দেশিকার (Postal directory) তুলনা দেন ,একই জিনিসের যার দুই পদ্ধতিতে নাম দেওয়া হয় বর্ণানুক্রমিক এবং অবস্থানগত। রাসেল বর্ণানুক্রমিক কে বলেন মানসিক এবং অবস্থানগত নামকে বলেন জড়ীয়। উভয়ই মূলত একই জিনিসের নির্দেশক। এভাবে তিনি প্রমাণ করেন দৈহিক ও মানসিক জিনিস পৃথক নয় বরং এক।

রাসেল সমকালীন দর্শনকে ৩টি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করেন, প্রাচীন ধারা যা অধিবিদ্যার সাথে সম্পৃক্ত, বিবর্তনবাদী ধারা এবং যৌক্তিক পরমাণুবাদ (logical atomism) যা গণিতের বিচারমূলক সূক্ষ্ম পরীক্ষার মাধ্যমে দর্শনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।[২৮] এই আলোচনায় তিনি অধিবিদ্যার কঠোর সমালোচনা করেন।তাঁর মতে, যুক্তিবিদ্যার অভ্যন্তরীন বিপ্লবের মাধ্যমে Traditional metaphysics এর উচ্চাভিলাষী সংগঠনগুলো ভেসে গেছে। ঈশ্বরের অস্তিত্বের ব্যাপারে তিনি বলেন, একজন দার্শনিক হিসেবে আমাকে অজ্ঞেয়বাদী বলা উচিত কারণ আমি মনে করিনা I do not think that there is

a conclusive argument by which one prove that there is a God.[৩০] কিন্তু একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে আমি একজন নাস্তিক, because What I say that I can not prove that there is a God[31], ১৮৯৮ সালে তিনি হেগেলিয় ভাববাদ ত্যাগ করে জি.ই. মূরের প্রেরণায় বাস্তববাদী মত গ্রহণ করেন, ১৮৯৭ সালের একটি প্রবন্ধে তিনি লেখেন, We may use metaphynics, like poetry and music as a means of producing a mood, of giving us a certain view of the universe, a certain attitude towards life the resulting state ofmind being valued on account of, and in proportion to, the degree of poetic emotion aroused, not in propotion to the truth of the beliefs entertained.[32] Has religion made useful contributions to civilization? রচনায় তিনি সভ্যতার অগ্রগতিতে ধর্মের ভূমিকা অস্বীকার করেন নি। তবে এখানে খ্রিষ্টীয় নৈতিকতার সমালোচনা করেন। ব্যভিচারের চেয়ে ঘুষ গ্রহণকে তিনি বড় পাপ মনে করেন।

দুই কারণে তিনি ধর্মের ব্যাপারে আপত্তি তোলেন, একটি বুদ্ধিগত ও অন্যটি নৈতিক। বৌদ্ধিক আপত্তি হচ্ছে যে কোনো ধর্মকে সত্য বলার পেছনে আসলে যুক্তি নেই। নৈতিকতার ব্যাপারে তিনি বলেন, I donot believe there is a single saint in the whole calendar whose saintship is due to work of public utility.[34] ঈশ্বরের অস্তিত্বের ব্যাপারে design argument তুলে ধরে তিনি বলেন, এটা যথাযথ যুক্তি নয়। হিউমের মত তিনিও বলেন- জগৎ নানা অপূর্ণতায় ভরপুর, সুতরাং জগতের সৌন্দর্য ঈশ্বরকে প্রমাণ করেনা। ব্যক্তিগত অমরতায় যে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি, তাকে তিনি নৈতিকতার উপর বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বলে আখ্যায়িত করেন। একই কারণে তিনি দেহ ও মনের দ্বৈতবাদী নীতিকেও দর্শনের জন্য বিপর্যয়কর মনে করেন।

বাট্রান্ড রাসেলের দর্শনে সব বিষয় এসেছে। কোনো কিছুই তিনি বাদ রাখেননি। বর্তমান শতকে এবং আরো বহুকাল ধরে তাঁর দর্শন মানুষ গভীরভাবে অধ্যায়ন করবে। কিন্তু আধিবিদ্যা, ধর্ম, অমরতা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর মত কোনো আধিবিদ বা ধর্মতত্ত্ববিদ কখনো মেনে নিবেন না। দর্শনের রূপরেখা (An out line of philosophy) গ্রন্থে তিনি স্বীকার করেছেন চূড়ান্ত সত্য এজগতে নেই, আছে স্বর্গে। সুতরাং

তাঁর মতবাদগুলো চূড়ান্ত সত্য বলে গ্রহণ করার কোনো যুক্তি থাকতে পারেনা। যা কল্যাণকর তাই আমাদের গ্রহণ করতে হবে।

সমকালীন আধিবিদ্যক ধারা

আমরা এতক্ষণ আধিবিদ্যা বিরোধী ধারাগুলোর আলোচনা করেছি। এর বিপরীতে একটি শক্তিশালী আধিবিদ্যক ধারা ইউরোপ ও আমেরিকায় সৃষ্টি হয়েছে। বৃটিশদের মধ্যে গ্রীন, ব্রাডলি, বোসাংকে, ম্যাকটেগার্ট, প্রিঙ্গল প্যাটিসন; ফরাসীদের মধ্যে বাগসোঁ, রিনোভিয়ার, রোটরক্স, ইতালিয়দের মধ্যে ক্রোচে, জেন্টিলে; আমেরিকান জনাথন এডওয়ার্ডস, এমায়সন, রয়েস, জার্মানীর ফেখনার, লজ, উইলহেম উন্ড প্রমুখ সমকালীন খ্যাতিমান অধিবিদ। বর্তমান সময়কার এইচ ডি লিউইস, সি,ই, এম কোয়াড, আইটি রামজে, ম্যাক ইন্টায়ার, পিটার ভ্যান ইনওয়ারগান প্রমুখ উল্লেখযোগ্য আধিবিদ। তাঁদের আলোচনায় আধিবিদ্যা বিরোধী প্রতিটি ধারার পুংখানুপুঙ্খ সমালোচনা ও জবাব রয়েছে। আমরা এখানে তাদের মধ্যে কয়েকজন সম্পর্কে আলোচনা করব। বর্তমান সময়ের বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং এরিস্টটল, অগাস্টিন কান্টের সমালোচনা করে দেশ কাল সম্পর্কে আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তুলে ধরেন। যদিও বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্বই চূড়ান্ত নয়। মহা বিশ্বের বিস্ময়কর সৃষ্টির পেছনে আমাদের কল্পিত ঈশ্বরকে তিনি তুচ্ছ করেন। হকিং এর ভাষা, "..... এর জন্য কি একজন স্রষ্টা দরকার? তাই যদি হয় তাহলে মহাবিশ্বের উপর তাঁর আর কি অভিক্রিয়া থাকতে পারে? তাছাড়া তাঁকে কে সৃষ্টি করেছিল?"[৩৫]আইনস্টাইনও একবার প্রশ্ন করছিলেন- "মহাবিশ্ব গঠনে ঈশ্বরের কতটুকু স্বাধীনতা ছিল?" অন্যদিকে এপিজে আবদুল কালামসহ অনেক বিজ্ঞানী ঈশ্বরের অস্তিত্বের পেছনে বিজ্ঞানের অস্বীকৃতি জ্ঞাপক কোনো যুক্তি খুজে পান না। কালাম বলেন, "আমি শিক্ষিত হয়ে ভাবি, অনেকে এ কথা কেন মনে করেন যে, বিজ্ঞান মানুষকে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়? আমার যা মনে হয়, বিজ্ঞান সর্বদাই হৃদয়ের মধ্য দিয়ে পথ করে যেতে পারে। আমার দৃষ্টিতে বিজ্ঞান চিরকালই আধ্যাত্মিক সম্পদ এনে দেয় আর আত্মোপলব্ধি দান করে।"[৩৭] হকিং ভিটগেনস্টাইনকে গত শতাব্দীর সবচেয়ে বিখ্যাত দার্শনিক হিসেবে উল্লেখ করে বলেছিলেন- "ভিটগেস্টাইনের মত ছিল, দর্শনের কর্মক্ষেত্রের ভিতর একমাত্র অবশিষ্ট ক্ষেত্র ভাষা বিশ্লেষণ।" এরিস্টটল ও কান্টের বিরাট ঐতিহ্যের কি অধপতন!"[৩৮] কিন্তু হকিং হয়ত বর্তমান সময়কার

অধিবিদদের সম্পর্কে জানতে পারেন নি। কারণ ভিটগেস্টাইনের দর্শনের আবার মাথা উচু করে দাড়ানোর সুযোগ এখন আর নেই। নিচে কয়েকজন আধিবিদের আলোচনা করা হলো।

হিল গ্রিন

টমাস হিল গ্রিন (১৮৩৬-৮২) উনিশ শতকের বিখ্যাত অধিবিদ, হেগেলের ভাববাদ প্রভাবিত ব্রিটিশ দার্শনিক। তিনি হিউমের অভিজ্ঞতাবাদ, মিলের উপযোগবাদ, স্পেনসারের বিবর্তনবাদের সমালোচনা করেন। তিনি হেগেলের objective idealism এর অনুসারী ছিলেন। তিনি বিবর্তনবাদের পক্ষে এবং জীব দেহ থেকে মানবদেহের বিবর্তন হতে পারে বলে স্বীকার করেন, কিন্তু এসবের পেছনে আধ্যাত্মিক নীতির অনিবার্যতাও স্বীকার করেন। বৃটিশ ভাববাদী বেঞ্জামিন জোয়েটের প্রভাবে পড়ে তিনি হেগেলের ভাববাদ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। তিনি খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারী এবং সেন্ট পলের মতবাদের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। তিনি নৈতকিতার ক্ষেত্রে বিবর্তনবাদী মত গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। গ্রিনের প্রভাবে পড়ে জন কেয়ার্ড, ব্রাডলি, বোসাংকে সহ পরবর্তী বৃটিশ ভাববাদীদের উপর।

বোসাংকে

বার্নাড বোসাংকে (১৮৪২-১৯২৩) ইংল্যান্ডে হেগেলিয় ভাববাদের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। তাঁর নিকট কান্ট ও হেগেল ছিলেন অনুকরণীয় দার্শনিক এবং প্লেটোর দর্শন দ্বারাও তিনি প্রভাবিত হন। তিনি তাঁর A phychology of the moral self (১৮৯৭) গ্রন্থে দেহ ও মনের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেন। এখানে দ্বৈতবাদের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করেন। তিনি মনকে দেহের পূর্ণতা রূপে ব্যাখ্যা করেন। (Mind as a perfection and cooperation of the adaptations and acqusitions stored in the body (psychology of the moral self) বোসাংকে তাঁর ভাববাদের নাম দেন অনুধ্যানমূলক দর্শন (speculative philosophy)।[৩৯] কাল সম্পর্কে গতানুগতিক দুটি মতের উল্লেখ করেন তিনি। যার একটি পরম সত্তা কালে অবস্থিত এমতের অনুসারীদের তিনি বলেন, প্রগতিবাদী,

তারা পরম সত্তার বিবর্তন ও প্রগতিতে বিশ্বাসী। দ্বিতীয় প্রকার- যাঁরা মনে করেন কাল পরম সত্তায় অবস্থিত- এই চিন্তার অনুসারীদের তিনি নাম দেন পূর্ণতাবাদী। এই মত অনুসারে পরম সত্তায় কোনো পরিবর্তন নেই, থাকতে পারেনা। তিনি নিজে ছিলেন এই মতের অনুসারী। ব্রাডলির মত তিনিও বলেন সব কিছুই অবভাস, একমাত্র পরমসত্তাই বাস্তব।

ম্যাকটেগার্ট

জন এলিস ম্যাকটেগার্ট (১৮৬৬-১৯২৫) বিংশ শতকের গোড়ার দিকের একজন গুরুত্বপূর্ণ বৃটিশ দার্শনিক ও অধিবিদ। তিনি বিখ্যাত ছিলেন তাঁর The Nature of Existence (NE), The Unreality of time (1908) সহ বিভিন্ন গ্রন্থের কারণে। প্রথম জীবনে তিনি হেগেলকে পূর্ণ অনুসরণ করেন, কিন্তু পরবর্তীতে লাইবনিজ ও লজের মতের দিকে আকৃষ্ট হন, তবে সবচে বেশি প্রভাবিত হন ব্রাডলির রচনার মাধ্যমে। তাঁর মতে Bradely was the greatest of living philosophers, জি.ই.মূর তাঁর শিক্ষক ম্যাকটেগার্ট সম্পর্কে এপ্রসঙ্গে বলেন, 'যখন ব্রাডলি তাঁর কাছে আসতেন তখন ম্যাকটেগার্ট অনুভব করতেন, এক প্লেটোনিক প্রত্যয় যেন তার কক্ষে প্রবেশ করছে।' বার্ট্রান্ড রাসেল প্রথম জীবনে ম্যাকটেগার্ট কর্তৃক প্রভাবিত হন। তাঁর some dogmas of religion গ্রন্থের শুরুতেই তিনি বলেন, অধিবিদ্যা হচ্ছে সত্ত্বার পরম স্বরূপের পদ্ধতিগত বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা কখনো অধিবিদ্যার স্থান দখল করতে পারে না। এক্ষেত্রে দ্বৈতবাদী, বার্কলিয়ান, হেগেলিয়ান সহ সব আধিবিদ একই পদ্ধতির অনুসরণ করেন। এই গ্রন্থের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে তিনি এড়ফ কে সংজ্ঞায়িত করেন একজন ব্যক্তি হিসেবে যিনি সর্বোচ্চ ও শুভ। তিনি ঈশ্বরকে সবচেয়ে দয়াময় বা সর্বশক্তিমান বলে স্বীকার করেননি। তাঁর মতে যে কোনো সৃষ্ট জিনিস থেকে God অধিকতর শক্তিশালী এবং মন্দের চেয়ে তিনি অধিকতর শুভ।[৪০]

ম্যাকটেগার্ট তার আধিবিদ্যক মতকে নাম দেন Ontological Idialism।তাঁর NE গ্রন্থে তিনি এর বিবরণ দেন। গ্রন্থের শুরুতেই তিনি অস্তিত্বের স্বরূপ বর্ণনা করেন: All that exists must, it is universally admitted, be real while the position has been maintained that there is areality which does not exist.[41]তাঁর কথা ছিল অস্তিত্ব মাত্রই বাস্তব। একই গ্রন্থের

৬৬ পৃষ্ঠায় তিনি দ্রব্যের ধারণা দেন। তাঁর ভাষায় Whatever exist, then, has qualities, These qualities will themselves be existent, and will have qualities, and so on without end. But at the head of series, there will be something existent which has qualities without being itself a quality. The ordinary name for this, and I think the best name is substance. [42] তাঁর এই দ্রব্যের ধারণাই ব্রাডলির Reality. এখানে লক্ষ্য করা যায় তিনি ব্রাডলির সমন্বন্ধে নাতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তিনি সময়ের বাস্তবতাকে অস্বীকার করেন কিন্তু আত্মার অমরতার কথা অস্বীকার করেন নি। আধিবিদ্যার জ্ঞানের জন্য তিনি আরোহ প্রক্রিয়াকে অনুপযুক্ত মনে করেন। কারণ আরোহে সব সময় সময় বিদ্যমান থাকে।[৪৭]

প্রিঙ্গল প্যাটিসন

এন্ড্রুসেথ প্রিঙ্গল প্যাটিসন (১৮৫৬-১৯৩১) বৃটিশ ভাববাদের আরেকজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি। তিনি ছিলেন স্কটল্যান্ডের অধিবাসী এবং এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের যুক্তি বিদ্যা ও অধিবিদ্যার প্রফেসর। তাঁর The edia of God in the light of recent philosophy (১৯২০) এবং The Edia of Immortality নামক দুটি গ্রন্থে আধিবিদ্যা সংক্রান্ত আলোচনা পাওয়া যায়। The Idea of God ছিল Gifford এ প্রদত্ত ২০টি ভাষণের সমন্বয়। এখানে শুরুতেই তিনি তাঁর পূর্বসুরী ঐঁসব এর Dialogues এর সমালোচনা করেন। হিউম ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে প্রচলিত যুক্তি খন্ডন করেন। কিন্তু প্যাটিসন বলেন- তাঁর এই সিদ্ধান্ত তাৎপর্যহীন। এই গ্রন্থে মিল, ব্রাডলি, জেমস, বাগসোঁ, বোসাংকে, ম্যাকটেগার্টের আলোচনার সমালোচনামূলক ব্যাখ্যা দেন। তাঁর মতে, Truth Beauty, Goodness, love- these constitute the being of God. [44]

The Idea of Immortality গ্রন্থে তিনি সময়তার ধারণা ব্যাখ্যা করেন। প্লেটো এরিস্টটল থেকে শুরু খ্রিস্টীয়, ইহুদী, হিন্দু, বৌদ্ধ প্রভৃতি মতের আলোকে আত্মার ব্যাখ্যা করেন। হিউমের এই সংক্রান্ত মতকেহ তিনি আবেগ নির্ভর বলে প্রত্যাখান করেন। তাঁর মতে হিউমের যুক্তি মানুষকে খেকশিয়াল ও খরগোশের সাথে তুলনা করেন।[৪৫]

সি,ই,এম জোয়াড

তিনি (১৮৯১-১৯৫৩) জীবদ্দশায় একজন বিখ্যাত বৃটিশ চিন্তাবিদ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। বিখ্যাত ইইঈ অনুষ্ঠান The Brains trust উপস্থাপনে তিনি বেশি পরিচিত পান। প্রথম জীবনে পুঁজিবাদী পদ্ধতির অবসানের পক্ষে কাজ করেন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে শান্তিবাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি ধর্মের দিকে ফিরে আসেন। ১৯৫২ সালে প্রকাশিত তাঁর The recovery of Belief গ্রন্থে এবং A critique of logical positivism গ্রন্থে আধিবিদ্যার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। বিশেষ করে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের উগ্র মতের তিনি সূক্ষ্ম সমালোচনা করেন।[৪৬]

আই.টি. রামজে (১৯১৫-৭২)

তনি অক্সফোর্ডের ধর্ম দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। প্রত্যক্ষবাদী ও ভাষাতাত্ত্বিক আক্রমন থেকে অধিবিদ্যা ও ধর্মকে রক্ষার চেষ্টা করেন তিনি। ধর্মীয় ভাষার বিকাশ সাধনে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিগত প্রকাশকে তিনি ভিত্তি হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এওতো সম্ভব যে, আমাদের অত্যাবাশ্যক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলীর জন্য অদ্ভূততম ভাষাই অপরিহার্য। আর অদ্ভুত হওয়া সত্বেও যদি এ ভাষা তার আলোচ্য বিষয় বা লক্ষ্য বস্তুর সার্থক বর্ণনা ও ভাষ্য হয়ে থাকে তাহলে এর ব্যবহারের যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে লাভ কি?[৪৭]

৭। বাগসোঁ (১৮৫৯-১৯৪১)ঃ

হেনরি লুই বাগসোঁ ছিলেন একজন বিশিষ্ট ফরাসী দার্শনিক। ১৯২৭ সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। তাঁর সময় কালটা ছিল ডারউইনের বির্তনবাদ দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু তিনি তার যান্ত্রিক বা জৈবিক বিবর্তনের পরিবর্তে creative evolution এর ধারণা দেন। অধিবিদ্যার উপর তাঁর মৌলিক ধারণা Intuition। ধর্মের দিক থেকে ইহুদী হলেও তিনি খ্রিষ্টীয় মর্মীবাদের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। ডারউইনের সমালোচনা করে তিনি বলেন, মানুষ ইতর প্রাণীর অংশ বিশেষ হতে পারে না। তাঁর

Introduction to metaphysics গ্রন্থে স্বজ্ঞার পরিচয় ও গুরুত্ব বর্ণনা করেন এবং ঈশ্বরকে পেতে স্বকীয় প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করেন। তাঁর ভাষায়- There is one reality, at least, which we all size from withing, by intuition and not by simple analysis [48]এই গ্রন্থে তিনি অধিবিদ্যাকে বিজ্ঞানের সমর্থক মনে করেন এবং Reality সম্পর্কে ৯টি গুরুত্বপূর্ণ মত প্রকাশ করেন।[৪৯]

তাঁর দর্শনের আরেকটি স্বতন্দ্র পরিভাষা elan vital / the vital impetus (জীবনী শক্তি)। Creative Evolution গ্রন্থের ১ম অধ্যায়ের শেষ পরিচ্ছেদে এই সংক্রান্ত আলোচনা করেন। তবে কেন্দ্রীয় ধারা হিসেবে বিভিন্ন স্থানেই তিনি একে ব্যবহার করেন। তাঁর মতে এখান থেকেই সব কিছুর সূচনা, æSo we come back, by a somewhat round about way. to the idea we started from, that of an original impetus os life, passing from one generation of germs to the following generation of germs through the developed orgainsm which bridge the interval between the generations.[৫০]

বিবর্তন প্রক্রিয়ায় এই জীবনী শক্তি প্রবহমান। কখনো কখনো এই প্রাণশক্তিকে তিনি বিবর্তনশীল ঈশ্বর বলে উল্লেখ করেন। যান্ত্রিক বিবর্তনের সমালোচনা করে তিনি বলেন, একটি চক্ষুর মধ্যে যে জটিল ক্রিয়াপরতা (Machanism) তা একটি অসীম সমস্যার সৃষ্টি করে। এর অর্থ নিশ্চয় এটা একটা সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের দিকে ধাবমান।

তাঁর The Two sources of Morality and Religion গ্রন্থে তিনি ধর্মের উপকারিতার কথা বর্ণণা করেন সমাজকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে এর ভূমিকা অনেক । তিনি নিশ্চল ধর্ম বিশ্বাস Static religion Dynamic religion এবং সচল ধর্ম বিশ্বাস নামে ধর্মের মধ্যে দুটি ভাগ করেন। তার মতে সাধারন মানুষ নিশ্চল ধর্মে বিশ্বাসী, কিন্তু মর্মীবাদীগন সচল ধর্মে বিশ্বাসী।[৫৩] তিনি Mysticism কে Vital impetus রে সথে সর্ম্পক যুক্ত করেন। এরিষ্টটলের ইশ্বরের ধারনা তিনি সমালোচনা করেন এবং বলেন আধুনিক যুগে তার ধারনার অনুসারে কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না।[৫৪] তিনি স্বজ্ঞার মাধ্যমের ইশ্বরকে খুজে পাওয়ার পরামর্শ দেন।

Dhaka University Institutional Repository

যোসিয়া রয়েস

আমেরিকার বিখ্যাত অধিবিদ ও ভাববাদী দার্শনিক যোসিয়া রয়েস (১৮৫৫-১৯১৬) হেগেলের অনুসরেনেণযে ভাবাবেদ প্রচার করেন তা ছিল প্রয়োগবাদ প্রভাবিত ভাবাবেদ। তার অধিবিদ্যা মত প্রকাশিত হয়েছে। **The world and individual** নামক **Fifford lecture** সমগ্রে ১৯০১ সালে । ১৯০১ ও ১৯০২ সালে উইলিয়াম জেমস গিফার্ড বক্তৃতায় রয়েসের মতবাদের সমালোচনা করেন। আর রয়েস ১৯১২ সালে প্রকাশিত তার **The sources of Religion Insight** গ্রন্থে এর জবাব দেন । **World and individual** মত গ্রন্থের ১ম সিরিজে ১০ টি ভাষন দেন। **Being** সংক্রান্ত ৪ টি ঐতিহাসিক মত বাস্তববাদের সমালোচনা, সর্মীবাদের ব্যাখা এর সবশেষে ব্রাডলির মতের পর্যালোচনা নিরপেক্ষ দৃষ্টি ভঙ্গির তিনি সমর্থন করেন নি। তবে তিনি মর্মী বাদের উপরই বেশি আগ্রহী ছিলেন। তার মতে এর সুচনা হয়েছিল উপনিষদে এরপর প্লোটো, এরিষ্টল এবং পরে বিভিন্ন ধর্মীয় চিন্তায় প্রকাশ পায়।

এতক্ষণের আলোচনার আমরা বর্তমান সময়ে অধিবিদ্যার পক্ষ ও বিপক্ষ দুটি ধারার আলোচনা করছি। বর্তমান সময়ে অধিবিদ্যার প্রাসঙ্গিকতা কতটুকু তার একটা উত্তর হয়ত এসেছে। এ প্রসঙ্গে আরো দুএকটি কথা যোগ করে এই অধ্যায় শেষ করতে চাই।

গিলবার্ট রাইল বলেন[৫৬] " আমি এযাবত হাজারের উপর দার্শনিক সভায় যোগ দিয়েছি এবং হাজারের উপর প্রবন্ধ পড়েছি। কিন্তু আমার সন্দেহ হয় ২০ টি আলোচনাও আমি এমনকি ধর্মতত্ত্বের উপর পেয়েছি কিনা। প্রকৃত পক্ষে বর্তমান যুগে অধিবিদ্যা ও ধর্মতত্ত্বের আলোচনা অনেক সীমিত এতে সন্দেহ নেই। রাইল হয়ত সে কারনেই বলেন "ধর্মতাত্ত্বিক কয়লা যখন উত্তপ্ত ছিল তখন ধর্মতাত্ত্বিক দর্শন টগবগিয়ে ফুটছিল" যদি এখন ধর্মব্যক্তিত্বের কেতলি থেকে এমনকি থেকে এমনকি বাস্প ও বের না হয় তাহলে বুঝতে হবে আগুন নিভে গেছে। তিনি আরো বলেন আমি চরম পন্থ অবলম্ভন করতে চাই না। হয়ত আগুন নিভে গেছে কিন্তু এখনো সম্পূর্ণ বরফ হয়ে যায় নি।[৫৭] রাইলের এই বক্তব্য অধিবিদ্যার প্রতি তাচ্ছিল্য এতে সন্দেহ নেই। তিনি নিজেও পরে ভালো জিনিস গ্রহন করতে এবং সমস্ত খারাপ জিনিস বর্জনের আহ্বান জানান। অধিবিদ্যার বিপক্ষে যারা যুক্তি দেন এবং যারা আবেগ তাড়িত হয়ে বক্তব্য দেন তারা উভয়েই বর্তমান সময়ের বিখ্যাত দার্শনিক। কিন্তু এই বিরোধিতা কেন? একটা জিনিস সর্ম্পকে সবাই যদি খারাপ বলে তাহলে হয়ত উপযোগবাদী দৃষ্টি কোন থেকে সেটাকে খারাপ বলা যাবে এভাবে, ১০ জন লোকের মধ্যে ৯ জন লোক যখন বলবে অমুক ব্যক্তিকে হত্যা করতে হবে তাহলে

হয়ত এটাই সঠিক। এর পিছনে আদৌ সঙ্গত কোন যুক্তি আছে কিনা তা খুজে দেখার প্রয়োজন ও সময় বর্তমান বস্তুবাদি ও বিজ্ঞানের যুগে হয়ত নেই।

ভিটগেনস্টাইন ও উইজডমের (১৯০৪-১৯৯৩)[৫৮] মতে "আধিবিদ্যক তত্ত্ব ও যুক্তিগুলো এক ধরনের বৌদ্ধিক বৈকল্য কিংবা মানসিক খিচুনী রোগের লক্ষণ বিশেষ। অধিবিদ্যা এমন একজন মানুষ যিনি উচ্চাবিলাসী ও বিকৃত তত্ত্ব দিয়ে বিশ্ব জগতকে ব্যাখা করেন। সুতরাং মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে ভালো যুক্তি দেওয়া যেতে পারে না। একজন অধিবিদের সাথে ভালো বিতর্কও করা যায় না। এজন্য প্রথমেই প্রয়োজন তাদের চিকিৎসা। দার্শনিকদের উচিত মনোবিশেষজ্ঞদের ভূমিকায় তত্ত্বে বিভোর অধিবিদদের চিকিৎসা করা। বি এ ও উইলিয়াম [৫৯] এর জবাবে বলেন এটা এক চরম পন্থার দৃষ্টান্ত। অধিবিদদের যদি চিকিৎসা দিতে হয় তাদেরকে স্নায়ুবৈকল্যের অনুরুপ না বলে এক ধরনের স্নায়ু বৈকল্য বলা উচিত। আর যদি তাই হয় তাহলে দর্শন বা দার্শনিক বিশ্লেষনের কাজ হবে মনোরোগের চিকিৎসা।কিন্তু প্রকৃত মনোরোগ চিকিৎসক যা করেন তা যদি দার্শনিক করতে যান তাহলে তা হব খুব তুচ্ছ একটি কাজ। কেউই বিশ্বাস করবেন না অধিবিদ্যা একটা অযৌক্তিক বিষয়, কিংবা দার্শনিকদের চিকিৎসকদের হাতে তুলে দেওয়া উচিত। প্রকৃত পক্ষে অধিবিদ্যার বিষয়টি দার্শনিক বিষয়, মনস্তাত্ত্বিক বিষয় নয়।

অধিবিদ্যার ব্যাপারে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের পর বিশেষত ২য় মহা যুদ্ধের পর কেমব্রিজে, উইজডম, ভাইসম্যান প্রমূখ ছিলেন এই চিন্তা ধারার অনুসারি। এই চিন্তাধারা অধিবিদ্যার বিরুদ্ধে অত্যন্ত চরমপন্থা অবলম্বন করে যা আমরা উপরের বক্তব্যে লক্ষ করেছি। ভিটগেনস্টাইনের মতে দর্শন থেকে অধিবিদ্যাকে বিসর্জন দেওয়াই দার্শনিকের অন্যতম প্রধান কাজ। সতর্কতার সাথে লক্ষ করলে দেখা যায় তাদের এই বিরোধীতার ভিত্তি ভাষা বিশ্লেষন ছাড়া আর কিছু নয়। প্রত্যেক্ষবাদী গন যেমন পরায়নীতি নামক একটি সামদস্ত তৈরি করেছিলেন এদেরকে এমন কোনে বিকল্প মানদন্ড ও উপস্থাপন করতে দেখা যায় না। তারা দর্শনের আলোচ্য বিষয় হিসাবে একমাত্র ভাষার বিশ্লেষনই নির্ধারন করেন। ট্রাকটেটাসে ভিটগেনস্টাইন এমন একটি আদর্শ ভাষার প্রস্তাব করেন যাতে কোনো সংশয় দুবোধ্যতা থাকে না। কিন্তু পরবর্তীতে ইনভেষ্টিগেশন গ্রন্থে এই পথ ছেড়ে দিয়ে তিনি বলেন বিচিত্র তার এই মতের বিবর্তণ প্রশংসনীয়। আরো কিছু দিন বেচে থাকলে তার মতের আরো পরিবর্তণ হত সন্দেহ নেই ।[৬০] যদি দর্শনের একমাত্র কাজ হয় ভাষা বিশ্লেষন তাহলে আমার মতো হয় তিনি ও দর্শনকে অত্যান্ত সংকোচিত অর্থে দেখেছেন । থেলিস থেকে যে মুক্ত দর্শনের সুচনা তাকে তিনি একটি বোতলে প্রবেশ করিয়ে মুখ বন্ধ করে দিতে চেয়েছেন। প্রচন্ড মেধাশক্তির অধিকারী হওয়া স্বত্বেও নিজের এই ভূলটুকু তিনি ধরে রাখতে

পারলেন না। তিনি যে ভাষা বিশ্লেষনের প্রস্তাব করেন তা কোন ধরনের ভাষার বিশ্লেষন তা স্পষ্ট করেন নি দর্শনের, বিজ্ঞানের না দৈনন্দিন ভাষার। অধিবিদ্যার ভাষাকে বাদ দিতে পারলেই হয়তো তিনি অন্যসব আপত্তি থেকে সরে আসবেন। তার অনুসারী উইজডম ও ভাইসম্যান অধিবিদ্যা অর্জনের জন্য কিছু যুক্তি দেওয়ার চেষ্ঠা করেন। উইজডম মনে করতেন যেকোনে দার্শনিক মতবাদই অর্ধসত্যের বেশি কিছু নয়।[৬১] এর মাধ্যমে তিনি ভিটস্টেটাইনের কঠোরতা লাঘবের একটা চেষ্ঠা করেন।

রাসেলের সেই উদ্ধৃতি আবার দিচ্ছি " কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে যুক্তি অনুসন্ধানে যদি সিদ্ধান্তটি পূর্বেই প্রদান করা হয় তবে তা দর্শন হয় না। বরং সেই বিষয়ের পক্ষে সনির্বন্ধ আবেদন জানানো হয় । ভিটগেনস্টাইন এমনকি রাসেল নিজেও অধিবিদ্যা বর্জনের একটা সিদ্ধান্ত পূর্বেই নিয়েছেন। পরর্বীতে যা বললেন তা আসলে একটি আবেদন ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই আমরা কি বলব ভিটগেন্টস্টাইন কিংবা রাসেলের দর্শন কি আদৌ দর্শন নয়? এমন চরমপন্থা অবলম্বন হয়ত কোনো অধিবিদ সমর্থন করবেন না। আমারা দর্শনকে জীবন ও জগতের জন্য প্রাসঙ্গিক মনে করি। একজন ক্রিকেটারের কাছে হয়ত ফুটবল খেলা অত্যন্ত বিরক্তিকর মনে হবে। তাই বলে তিনি যদি কখনো দেশের শাসক হয়ে সমস্ত ফুটবল খেলা বন্ধ করে দেওয়ার প্রস্তাব করেন তা কেমন হবে? আমরা এটাকে জীবন দর্শন বলতে পারি না।

২য় মহা যুদ্ধের পর বিশ্লেষনী দর্শনের হাত ধরে অক্সফোর্ড ভাষাতাত্ত্বিক দর্শনের নেতৃত্ব দেন গিলবার্ট রাইল (১৯০০-১৯৭৭) অস্টিন (১৯১১-১৯৬০) স্ট্রসন (১৯১৯-২০০৬) প্রমূখ। প্রকৃতপক্ষে সত্তাকে প্রকাশ করার জন্যই ভাষার ব্যবহার। ভাষার বিশ্লেষন দ্বারা সত্তাকে পাওয়া যাবে না। তাছাড়া আমরা যে বিজ্ঞানের ভাষার কথা প্রায় শুনি তা জীবনে কতটুকু কাজে লাগে। গনিতের এমন অনেক প্রত্যয় আছে যা আমাদের জীবনে আদৌ কোন কাজে লাগেনা ।একই ভাবে পদার্থ , রসায়ন জীব বিদ্যায় অনেক পরিভাষা আছে যা অন্যদের কাছে একেবারেই অর্থহীন। তাছাড়া অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা মহাজাগতিক বিষয় কতটুকু জানতে পারছি? আমাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার " কথা বললে আবার এটাকে আধিবিদ্যক শব্দ বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়। কিন্তু এই বাস্তবতা আমরা কেমন করে অস্বীকার করব। রাসেল স্বীকার করেন বিজ্ঞান ও রহস্যবাদে সমন্বয়ই উৎকৃষ্ট দর্শন হতে পারে। তাহলে যে রহস্যের সমাধান আমাদের কাছে নেই তা অস্বীকার করা কিছুতেই যুক্তিসংগত হবে বলে মনে হয় না। স্ট্রসনের আলোচনায় **Descriptive metaphymics** নামে অধিবিদ্যার একটি ব্যাখ্যা আসে যার মাধ্যমে তিনি ব্যাখ্যা করেন এরিষ্টটল হেগেলের অধিবিদ্যা অযৌক্তিক নয়। এভাবে ভাষা দর্শনের মধ্যে ও আত্মসমালোচনা লক্ষ্য করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. http:// www.britannica.com/Herbert-spencer.

২. http:// www.iep.utm.edu/spencer

৩. আমিনুল ইসলাম, *সমকালীন পাশ্চাৎ দর্শন*, ঢাকা, ১৯৮২, পৃঃ- ১৪৫।

৪. Morgan. C.L., *Emergent Evolution*, London, Williams and Norgaie, 1927, P-1

৫. Ibid, PP. 9-11

৬. Ibid. P-11

৭. Ibid, P-36

৮. *সমকালীন পশ্চাৎ দর্শন*, পৃ: ২৭০

৯. মার্কস- এঙ্গেলস, *কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার*, কলকাতা ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ২০০২

১০. হারুন রশীদ, *মার্কসীয় দর্শন*, ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭, পৃ: ৩২

১১. প্রাগুক্ত, পৃ- ১৬০

১২. *কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার*, পৃ-৯

১৩. www.peirce.org

১৪. www.plato.Stanford.edu/Pragmatism

১৫. *সমকালীন পশ্চাত্য দর্শন*, পৃ: ২৩৯

১৬. www. iep.utm.edu

১৭. James, *Essays in Radical Empiricsm*, NewYork, Longmans, Green, and Co, 1912, P-42

১৮. আমিনুল ইসলাম, *সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শন*, পৃ: ২৪২

১৯. www.plato.stamford.edu/Existentialism

২০. *সমকালীন পশ্চাত্য দর্শন*, পৃ: ৩২৯-৩৫

২১. Roth, J.K & Sontag, F.(Ed.), *The Questions of Philosophy*, California, Wodsworth Publishing Company, 1988, PP. 409-10

২২. *সমকালীন পশ্চাত্য দর্শন*, পৃ: ৩৪৭-৪৮

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ: ১১৬-২৮

২৪. জন স্টুয়ার্ট মিল, উপযাগবাদ (অনু. হাসনা বেগম), ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ: ২৯

২৫. www.britinica

২৬. works by Rusell form online

২৭. বার্ট্রান্ড রাসেল, *বহির্জগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান* (অনু আব্দুল বারী), ঢাকা, পৃ: ২

২৮. www. Plato.Stanford.edu

২৯. works by Russell.online

৩০. Ibid

৩১. Stephen Mumford (ed.), *Russell on Metaphysics*, London, Routledge

৩২. কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, কলকাতা, পৃ: ১৮০

৩৩. এ.পি.জে আব্দুল কালাম, *(অগ্নিপক্ষ) উইংস অব ফায়ার*, ঢাকা, পৃ: ৩১

৩৪. *কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, কলকাতা, পৃ: ১৮০

৩৫. McTaggart, John, The Nature of Existence, Vol-1, Coamridge, 1921, P-1

৩৬. Ibid, P-66

৩৭. D.F. Pears, *The Nature of Metaphyincs*, London-1957,

৩৮. Ibid, P-145

৫ম অধ্যায়

উপসংহার

এতক্ষণের আলোচানায় আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি অধিবিদ্যা একবিংশ শতকেও সগৌরবে দীপ্তমান এবং ব্রাডলির ভাষায় আবারও বলব, যতদিন আকাশের তারকা মিটিমিটি করে হাসবে ততদিন অধিবিদ্যা অনিবার্যভাবে টিকে থাকবে। আমরা এ গবেষণায় বর্তমান সময়ে অধিবিদ্যার প্রাসঙ্গিকতা, প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আশা করি এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, সমকালীন যুগে অসংখ্য শক্তিশালী বিপরীত স্রোত থাকা সত্ত্বেও অধিবিদ্যা নিজস্ব হাল ধরে আপন শক্তিতে বলীয়ান হয়ে সামনের দিকে অগ্রসরমান। আমরা শুরুতেই অধিবিদ্যার একটি পরিচয় তুলে ধরেছি। প্রকৃতপক্ষে অধিবিদ্যা দর্শনের অবিচ্ছেদ্য ও মৌলিক শাখা। এন্থনী ওয়ারনাক দর্শনের সংজ্ঞায় বলেছেন, দর্শন আমাদেরকে পরম সত্তার জ্ঞান, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা এবং বাস্তব জীবন পদ্ধতির দিকে নির্দেশন করে।[১] এই কথাটি দর্শনের সূচনা থেকেই আমরা দেখতে পাই। প্রাচীন গ্রীক আইওনিয়-মাইলেশিয়া দার্শনিকগণ দর্শনের যে পরিচয় উপস্থাপন করেন তা বর্তমান সময়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এরিস্টটলের অধিবিদ্যা গ্রন্থে দেখা যায়, তখন দর্শন বলতে একটি বিজ্ঞানকে বোঝানো হত এবং এই বিজ্ঞানের মধ্যে সর্বোচ্চ বিজ্ঞান হিসেবে তিনি স্থান দিয়েছেন অধিবিদ্যাকে। অধিবিদ্যার প্রধান আলোচ্য বিষয় হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন মৌল সত্তাকে । এই সত্তার সন্ধানেই তিনি কালোত্তীর্ন ও অমূল্য গ্রন্থখানী (metaphysics) রচনা করেন। অবশ্য তাঁর এই সত্তানুসন্ধানের কাজ দর্শনে প্রথম নয়। তিনি নিজেও তা স্বীকার করেছেন। পারমোনাইডিস ছিলেন এক অপরিবর্তনশীল সত্তার ধারণার প্রবর্তক। অপরিবর্তনশীল পরম সত্তা হিসেবে ঈশ্বরকে খুঁজে পেয়েছেন পিথাগোরাস, হিরাক্লিটাস, এনাক্সগারাসসহ আরো অনেকে যাঁরা বিভিন্ন নামে পরম সত্তার সন্ধান করেন। এরিস্টটলের গুরু প্লেটোর দর্শনে আধিবিদ্যক ধারণা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, প্রকৃতপক্ষে তার অধিবিদ্যা এরিস্টটলের তত্ত্বের চাইতে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। সক্রেটিস যদিও নৈতিকতা ও জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনাকে অধিকতর গুরুত্ব দেন তথাপি ঈশ্বরকে তিনি অস্বীকার করেন নাই। তবে এরিস্টটলই একটি সুসংবন্ধ, সুশৃঙ্খল, পৃথক বিদ্যা হিসেবে অধিবিদ্যার উপস্থাপন করতে সক্ষম হন।

অধিবিদ্যার ভিত্তিকে শক্তিশালী করার জন্য তিনি যুক্তিবিদ্যার বিরোধ নীতি ও মধ্যপদ বর্জন নীতির আশ্রয় নেন। তাঁর আলোচনায় কিছু স্ববিরোধ ও পুনরুকৃতি থাকা সত্তেও তিনি যুক্তি প্রমাণ ও তথ্য দিয়ে প্রমাণ করেন আদি কারণ হিসেবে এমন একটি কারণ থাকবে যার আর কোনো কারণ থাকবে না। এই আদি কারণের পরিচয় হিসেবে তিনি অচালিত চালক বা ঈশ্বরের ধারণা দেন। চার প্রকার কারণের মধ্যে ঈশ্বরকে তিনি আকারগত কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন। ঈশ্বররের গুণ হিসেবে পরম শুভকে নিয়ে আসেন। তাঁর রচিত Nicomechean

Ethics, on the soul প্রভৃতি গ্রন্থে আত্মা প্রসঙ্গে আলোচনা আসে। তাঁর মতে, একমাত্র প্রজ্ঞাবান আত্মাই অমর জীবাত্মা ও কামনার আত্মা মরণশীল।

অধিবিদ্যার সাথে খ্রিস্টীয় ধারণার সমন্বয়ের প্রচেষ্টা আমরা লক্ষ্য করি সেন্ট অগাস্টিন, আনসেল্ম, একুইনাস প্রমুখের রচনায়। ধর্মের সাথে অধিবিদ্যার মিলনের এই প্রয়াস পাশ্চাত্যের ইহুদি ও মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যেও ছিল। আমরা এখানে কেবল একুইনাসের অধিবিদ্যাকেই উপস্থাপন করেছি। একুইনাস অত্যন্ত মেধাবী ও অসাধারণ চিন্তা শক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর দুটি == গ্রন্থসহ অন্যান্য গ্রন্থে দর্শন ও ধর্মকে এক সাথে উপস্থাপন করা হয়। Summa theologica গ্রন্থে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে পাঁচটি যুক্তি দেন। গতির যুক্তি, কার্যকারণ, বিশ্বতাত্ত্বিক, নৈতিক ও উদ্দেশ্য বিষয়ক যুক্তি। Contragentiles গ্রন্থে সুচিন্তিত ও সুশৃঙ্খল আলোচনার মাধ্যমে তিনি অখ্রিস্টানদের খ্রিষ্ট ধর্মের দিকে আহ্বান করেন। তাঁর এই আলোচনা ধর্মের উদ্দেশ্য হলেও পদ্ধতি ছিল দার্শনিক। এজন্যই দর্শন ও অধিবিদ্যার ইতিহাসে তাঁর অবদান বিরাট। জ্ঞানীর পরিচয়, মর্যাদা, ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ, ঈশ্বরর গুণাবলীসহ ধর্মীয় অনেক বিষয়ে তিনি আলোচনা করেন। তাঁর মতে ঈশ্বর কেমন আমরা তা জানতে পারি না। তাই ঈশ্বর কী নয় তা জানার মাধ্যমে ঈশ্বর সম্পর্কে আমরা ধারণা নিতে পারি। এরিস্টটলের অধিবিদ্যায় ঈশ্বর কেবল সাঠিক সম্পর্কে জানেন, বিশেষ জানেননা। কিন্তু একুইনাসের মত হলো, তিনি সার্বিক ও বিশেষ সব জানেন, যা এখানো সৃষ্টি হয়নি তাও তিনি জানেন। ঈশ্বরের ইচ্ছা শক্তি সবচেয়ে বড় শক্তি। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করতে পারেন। তাঁর ইচ্ছার জন্য যুক্তি প্রয়োগ করা যায় কিন্তু কারণ দর্শানো যায় না। তবে তিনি অসম্ভব জিনিসের ইচ্ছা করেন না, যেমন আত্মা বিহীন মানুষ ইত্যাদি। contragenitiles গ্রন্থের শেষ অংশে ঈশ্বরের সৃষ্টি, ঐশ্বরিক আদেশ আত্মার মুক্তি, নৈতিকতা খ্রিস্টীয় তত্ত্ব প্রভৃতি আলোচনা করেন। অধিবিদ্যা ও ধর্ম দর্শনের ইতিহাসে এজন্যই তিনি স্মরণীয়।

এর পর আমরা ব্রাডলির অধিবিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। ব্রাডলি বিংশ শতকের গোড়ার দিকে তাঁর মতাবাদের পূর্ণ স্বীকৃতি পান, যদিও উনিশ শতকের শেষ দিক থেকেই তাঁর অধিবিদ্যা আলোচনার বিস্তার ঘটে। তিনি হেগেলপন্থী ভাববাদী দার্শনিক। হেগেলের দর্শন উনিশ শতকের ভাববাদী দার্শনিকদের প্রবলভাবে আলোড়িত করে। হেগেলের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির আদি thesis ছিল পরম ধারণা বা পরম সত্তা। এই পরম সত্তা সব কিছুর মূল ভিত্তি। তাঁর মাধ্যমেই জগতের সৃষ্টি ও তিনি জগতেই মিশে আছেন। হেগেলের এসব আদিবিধ্যক আলোচনা বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মান তথা ইউরোপ ও আমেরিকা ভাববাদী দার্শনিকদের এখনো প্রেরণা যুগিয়ে আসছে। হেগেলের মতকে ব্রিটেনে নিজের মতের আলোকে উপস্থাপন করেন ব্রাডলি।

ব্রাডলি সব কিছুকে অবভাস বলে ব্যাখ্যা করেন। এর পেছনে একটি বাস্তবসত্তা রয়েছে। সব কিছুর মূলে যে বাস্তবসত্তা তাকে তিনি Absolute Reality বলেছেন। তাঁর দর্শন মূলত সম্বন্ধের দর্শন। তাঁর মতে, মুখ্য ও গৌনগুণ, দেশ-কাল, আত্মা, কার্যকারণ ইত্যাদি সবই সম্বন্ধযুক্ত। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির ব্যাখ্যা করা যায় না তাই এগুলোর স্বাধীন অস্তিত্ব নেই। আর একারনেই এগুলো বাস্তব নয়। বরং বাস্তবের প্রতিচ্ছবি। তবে সব কিছুকে অবাস্তব বললেও আমরা এগুলোকে অস্বীকার করতে পারি না। বরং বাস্তব সত্তার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্যই এগুলো স্বীকার করতে হবে। কারণ কোনো অবভাস মানেই এর পেছনে অনিবার্য বাস্তব সত্তা বিদ্যমান। তাঁর Absolute Reality সব সম্বন্ধের উর্ধ্বে এমনকি ঈশ্বরকেও তিনি বাস্তবসত্তার অবভাস বলেন। তবে তিনি অন্যসব অবভাসের মত নয়। ব্রাডলির সাথে হেগেলের পার্থক্য হলো বাস্তব সত্তাকে হেগেল আধ্যাত্মিক বলেছেন আর তিনি বলেছেন অভিজ্ঞতালব্ধ।

অধিবিদ্যার পক্ষে বর্তমান সময়কার আরেকজন বিশিষ্ট ব্যাক্তি এইচ ডি লিউইস। ব্রিটিশ দর্শনের ইতিহাসে তাঁর অবদান বিরাট। তিনি জড়বাদ ও বাস্তববাদীদের পক্ষে জোরালো যুক্তি দেন। সমকালীন অধিবিদ্যা বিরাট ধারা বিশ্লেষণী দর্শন, ভাষাতাত্ত্বিক দর্শন, যৌক্তিক দৃষ্টিবাদ, অস্তিত্ববাদ প্রভৃতির সূক্ষ্ম পর্যালোচনা করে তিনি প্রমাণ করেন এসব চিন্তা এক ধরনের ভাবাবেগের উপর নির্মিত এমনকি বার্ট্রান্ড রাসেলও সেই ধরনের আবেগ থেকে মুক্ত হতে পারেননি। রাসেল ভাববাদ বিসর্জন দিয়ে বাস্তববাদ গ্রহণ করেন ধর্ম ও অধিবিদ্যার সমালোচনার মাধ্যমে, অন্যদিকে লিউইস দর্শনের মাধ্যমে ভাববাদে আগমন করেন। ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে প্রচলিত তত্ত্ববিষয়ক বিশ্বতাত্ত্বিক নৈতিক যুক্তিসমূহ তিনি গুরুত্বের সাথে পর্যালোচনা করে বলেন এগুলোর ত্রুটি থাকলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অভিজ্ঞতাপূর্ব ও সহজাত ধারণায় যুক্তি দেন তিনি পক্ষীকুলের বাসা নির্মাণ, বিদেশ ভ্রমন ইত্যাদির মাধ্যমে। তাঁর অধিবিদ্যা মূলত আধুনিক অধিবিদ্যার নতুন রূপ। তিনি মর্মীবাদের পক্ষে যুক্তি দেন এবং স্বজ্ঞাকে ঈশ্বর অনুসন্ধানের পক্ষে বড় হাতিয়ার হিসেবে উল্লেখ করেন।

চারজন বিশিষ্ট অধিবিদের অবদান আলেচনার পর আমরা যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের সমালোচনাসহ একটি বিবরণ তুলে ধরেছি। আমাদের এ গবেষনার মূল উদ্দেশ্য ছিল যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের অবস্থান বিচার। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ অধিবিদ্যার বিরুদ্ধে এক চরমপন্থা। এক ধরনের গোঁড়া সামরিক অফিসারের আদেশের মতই দেখা যায় তাদের মতবাদকে। তারা প্রতিপাদননীতির মাধ্যমে অধিবিদ্যাকে বর্জনের ঘোষণা দেন। অভিজ্ঞতার যা প্রমাণ করা যায় না তা তারা মানতে নারাজ। যেহেতু ঈশ্বর নৈতিকতা ও ধর্ম সম্পর্কিত বচনগুলো তাদের পরখনীতির মানদন্ডে উত্তীর্ণ হতে পারে না তাই এগুলো অর্থহীন। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের এই উগ্রমতের আত্মসমালোচনা তাঁরা

নিজেরাও করেছেন। কিন্তু ঈশ্বর বিরোধিতায় তারা পিছপা হননি। এই মতের আবির্ভাবের পর থেকেই এর বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি শুরু হয়। এসব আপত্তির কিছু আবেগনির্ভও, কিছু যুক্তিনির্ভর। আমরা যুক্তিনির্ভর কিছু সমালোচনা এখানে উপস্থাপন করেছি। প্রত্যক্ষবাদ দর্শনে যে বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল সেই চেতনা আর ধরে রাখতে পারেনি। তবে জড়বাদী, অভিজ্ঞতাবাদী এবং অধিবিদ্যা-বিরোধীদের জন্য তা প্রেরণা সৃষ্টি করে আসছে। ঈশ্বরকে যারা অস্বীকার করেন কিংবা যারা বিশ্বজগতের আদিকারণ রূপে কোনো কিছু মানতে নারাজ তারা প্রত্যক্ষবাদের ত্রুটি সংশোধান করে জড়বাদকে বিকশিত করার চেষ্টা অব্যাহত রাখেন।

৪র্থ অধ্যায়ে আমরা সমকালীন অধিবিদ্যা-বিরোধী ধারাগুলোর আলোচনার সাথে সাথে অধিবিদ্যার পক্ষাবলম্বনকারীদের মন্তব্য উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। বিবর্তনবাদ থেকে শুরু করে অস্তিত্ববাদ পর্যন্ত বিভিন্ন ধারা অধিবিদ্যার কঠোর সমালোচনা করে। হাবার্ট স্পেনসার বিবর্তনবাদকে দর্শনে নিয়ে আসেন এবং এর জড়বাদী ব্যাখ্যা দেন। তাঁর এই চিন্তা প্রয়োগবাদী, বাস্তববাদী এমনকি রাসেলের মত দার্শনিককেও প্রভাবিত করে। রাসেলেরর মতে, বানর থেকে মানুষের জন্ম বলায় মানুসের অহমিকায় হয়ত আঘাত লেগেছে, কিন্তু মানুষকে ক্রমবিবর্তনের ফল তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই।[২] বিবর্তনবাদের আধিবিদ্যক ব্যাখ্যা এসেছে লয়েড মার্গনি ও আলেকজান্ডারের উন্মষমূলক ও হেনরি বাগর সৃজনমূলক বিবর্তনবাদে। তাঁরা বিবর্তন প্রক্রিয়ার পেছনে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও একজন কর্তার অনিবার্যতা ব্যাখ্যা করেন। অস্তিত্ববাদেরও আমরা দুটি ধারা দেখেছি, একটি আধিবিদ্যক আরেকটি আধিবিদ্যক বিরোধী। সাঁত্রে নীটশে হাইদেগার ছিলেন জড়বাদী আর কিয়েরকেগার্ড, জেসপার্স, মার্সেল ছিলেন ভাববাদী এবং অধিবিদ্যার সমর্থক। প্রয়োগবাদেও দুটি ধারা একটি ঈশ্বরকে নিয়ে আরেকটি ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে। তবে ঈশ্বরকে তারা আধিবিদ্যক দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে বরং বাস্তব প্রয়োজনে স্বীকার করেন। এজন্য ঈশ্বরকে তারা অসীম না ভেবে সসীম রূপে কল্পনা করেন। তবে সমকালীন ভাবধারায় অধিবিদ্যা বিরোধী সবচেয়ে শক্তিশালী ধারাটিকে আমি বলব মার্ক্সবাদ। মার্ক্সবাদ যদিও একটি রাজনৈতিক ও সমাজ দর্শন, তথাপি মার্কসের দার্শনিক চিন্তা ধারায় অধিবিদ্যাকে প্রতিপক্ষরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। দর্শনকে তাঁরা বলেন এক ধরনের মোহাচ্ছন্নতা, যা আফিম জাতীয় নেশাদ্রব্য সেবনে ব্যবহারকারীর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এই ধরনের বক্তব্য অধিবিদগণ সহজে মেনে নিতে পারেননি।

নৈতিক দর্শনের ক্ষেত্রেও দেখা যায় আধিবিদ্যক নৈতিকতার বিপরীতে এক ধরনের প্রায়োগিক নীতিবিদ্যার সূচনা ঘটে। এর প্রকাশ ঘটেছে মার্ক্সীয় নীতিবিদ্যা, প্রয়োগবাদী, উপযোগবাদী, ব্যবহাররিক নীতিবিদ্যা প্রভৃতিতে। এখানে বলা হয়েছে নৈতিকতার সুনির্দিষ্ট কোনো আদর্শ থাকতে পারেনা। মানুষের সুখের

জন্য, আনন্দের জন্য যা প্রয়োজন তাই শুভ আর যা মানুষে কষ্ট দেয় তাই অশুভ। এই জন্য মিথ্যা বলা বা সত্য বর্জনে সমস্যা নেই, যৌন জীবনের জন্য সুনিদিষ্ট কোন নিয়ম প্রয়োজন নেই ইত্যাদি।

সমকালীন দর্শনের ইতিহাসে বার্ট্রান্ত রাসেল নামটি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি নিজেই একটা দর্শন। ৯৮ বছরের দীর্ঘ জীবনে তিনি প্রথম দিকে হেগেল, ম্যাকটেগার্টকে অনুসরণ করেলেও পরবর্তীতে হিউমের আদর্শ গ্রহণ করেন। তিনি বিজ্ঞান ও গণিত কে এবং যৌক্তিক পরমাণুবাদকে তাঁর আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন। বিজ্ঞানের মানদন্ডে তিনি ধর্ম, অধিবিদ্যা, ঈশ্বর ও নৈতিকতার যাচাই করনে এবং অভিজ্ঞতাবাদীদের অনুসরণ করে তিনি সিদ্ধান্ত নেন, যেহেতু অভিজ্ঞতায় এগুলো প্রমাণিত নয়, তাই এগুলো অসংশয়মূলক। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদকে তিনি অন্ধভাবে সমর্থন করেননি, কিন্তু প্রত্যক্ষবাদীগণ তাঁর রচনাতেই বেশি অনুপ্রাণিত হয়েছেন। নব্য বাস্তববাদের প্রধান সমর্থক মূরের দ্বারা তিনি বেশি প্রভাবিত হন।

এতদসত্বেও অধিবিদ্যার পক্ষে সমকালীন ধারাটি কম শক্তিশালী নয়। হেগেলকে অনুসরণ করে বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানি আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশে ভাববাদের যে বিস্তৃতি লক্ষ্য করা যায় তা অধিবিদ্যার পক্ষে অত্যন্ত জোরালো ভূমিকা রাখে। উনিশ শতকের শেষের দিকে এবং বিংশ শতকের শুরু থেকেই বৃটিশ ভাববদী হিল গ্রিন, ব্রাডলি, বোসাংকে, ম্যাকটেগার্ট, প্রিঙ্গল প্যাটিসন, ফ্রান্সের বাগসোঁ, ইতালির ক্রোচে, আমিরিকার রয়েস, বাউন প্রমুখ অধিবিদ্যার পক্ষে যে ভূমিকা রাখেন তা জড়বাদীদের জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ ছিল। এছাড়া পরবর্তী ২য় মহাযুদ্ধোত্তর এইচ.ডি. লিউইস, সি.ই.এম কোয়াড, ভ্যান ইনওয়াগান, ম্যাক ইন্টায়ার প্রমুখ বর্তমান সময় পর্যন্ত অধিবিদ্যার পক্ষে লিখে যান। এই ছিল পূর্ববর্তী অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত সার। আমরা এখন বিষয়টির আরো একটু পর্যালোচনা করতে চাই।

অধিবিদ্যার অন্যতম প্রধান একটি বৈশিষ্ট্য এর জ্ঞান অভিজ্ঞতাপূর্ব। আর এটাই সমালোচকদের প্রধান আপত্তির বস্তু। অধিবিদ্যা পরম সত্তা আত্মার অমরতা, ইচ্ছার স্বাধীনতা, দেশ-কালের রহস্য, নৈতিকতা প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করে। এসব বিষয়ের জ্ঞান পেতে অভিজ্ঞতার আশ্রয় সম্ভব নয়। আত্মা কি অমর না মরনশীল তা অভিজ্ঞতায় যাচাই করা আদৌ সম্ভব নয়। এই ধরনের বিষয়গুলো আমরা বই-খাতা-কলমের মত উপলব্ধি করতে পারিনা বলেই যত আপত্তি। কিন্তু আমরা কি অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞানসহ সময় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পাই? এর উত্তর অবশ্যই "না"। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য আমরা অভিজ্ঞতার জগতের বাইরে প্রায়শ আসা যাওয়া করি। এ ক্ষেত্রে আমাদের ভিত্তি থাকে বিশ্বাস ও আশা। একটি লোক বিপদে পড়ে আমার কাছে কিছু পয়সা ঋণ চাইল। আমি তাকে আগে কখনো ঋণ দেয়নি, কিন্তু আজকে

দিলাম। এই বিশ্বাসে যে, হয়ত সে তা ফেরত দিবে। যদি আমি বিপদে তাকে সাহায্য না করতাম তাহলে আমার কিছুই হতো না। তবে একটা ভয় থাকে। আমি বিপদে পড়ে তার স্বচ্ছল অবস্থায় যদি চেয়ে না পাই তাহলে কেমন হবে? হয়ত সে কারণেই আমি তাকে দেব। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অধিকাংশ ঘটনা এমনই। রাসেল কারণ তত্ত্বের ব্যাখ্যায় বলেছন, আগামী কাল সূর্য উঠবে কী কারণে আমি বিশ্বাস করব? অতীতের মত আগামী কালও ঘটবে তার নিশ্চিত কোন জ্ঞান আমাদের কাছে নেই। অত্যন্ত জটিল ব্যাখ্যার পর অবশেষে তিনি কার্যাকরণ নীতি স্বীকার করলেন এবং এভাবে একটি অভিজ্ঞতা পূর্ব সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন।[৩] প্রকৃতপক্ষে আমাদের স্বাভাবিক জীবন পরিচালনার জন্য অভিজ্ঞতাপূর্ব বিষয়কে স্বাভাবিক ভাবেই গ্রহণ করে থাকি। কিন্তু সব সমস্যা ঈশ্বর কেন্দ্রিক। সেখানে অবশ্যই আমাদের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন।

অভিজ্ঞতাবাদী এবং অধিবিদ্যা বিরোধীদের নিকট সর্বকালের শ্রেষ্ঠ পূজনীয় ব্যক্তি ডেভিড হিউম তাঁর Dialogues comcerning Natural Religion(DNR) গ্রন্থে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রচলিত যুক্তিগুলোকে তিনি খন্ডন করেন। তাঁর মতে ঈশ্বর সম্পর্কে আমরা যত কথা বলি, তা সব জগৎ কেন্দ্রিক। জগৎ যেহেতু সীমিত সুতরাং ঈশ্বরও সসীম। আবার যেহেতু অসংখ্য অপূর্ণতায় ভরপুর তাই ঈশ্বরও অপূর্ণ। এভাবে সর্বশক্তিমান, পূর্ণতম ঈশ্বরের ধারণা তিনি নাকচ করেন। কিন্তু হিউম বিশ্বজগতের শৃংখলার পেছনে একজন বুদ্ধিমান সত্তাকে (intellegent eing) অস্বীকার করতে পারেননি। এই সংলাপে ফিলো ছিলেন হিউমের মুখপাত্র, ক্লিনথিস Design argument উপস্থাপন করেন আর ডেমিয়া ও পামফিলাস ছিলেন ধর্মভীরু। হিউম পামফিলাসের কথার মাধ্যমে সংলাপ শেষে বলেন, can not but think taht philos principles are more probable than demeas but that those of cleanthes approach still nearer to the thruth.[4] এটাই হিউমের শেষ কথা। একথার মাধ্যমে তিনি মূলত যে কারণেই হোক Design argument সত্যের অধিকতর নিকটবর্তী বলে উল্লেখ করেন। এর কারণ নিয়ে দার্শনিকদের মধ্য এখনো বিতর্ক চলছে। হিউমের এই বক্তব্য অধিবিদ্যার পক্ষে চলে আসলেও অধিবিদ্যা বিরোধীগণ হিউমকেই তাদের মানদন্ড রূপে উলেখ করেন। এটাও নি:সন্দেহে একটা স্ববিরোধী কাজ।

অধিবিদ্যার ইতিহাসে কান্টের নামটিও গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বররের অস্তিত্বের ব্যাপারে তত্ত্ববিষয়ক, বিশ্বতাত্ত্বিক ও উদ্দেশ্য বিষয়ক যুক্তি খন্ডন করে তিনি বলেন, মানুষের প্রজ্ঞা বা বুদ্ধির মাধ্যমে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। তাঁর মতে ঈশ্বরের ধারণা থেকে ঈশ্বরকে প্রমাণ করা যায়না, যুক্তিবিদ্যার কার্যকারণ নীতি আমাদের অভিজ্ঞতার জগতের জন্য। অতীন্দ্রিয় জগতে কার্যকারণ আছে কিনা আমরা জানিনা সুতরাং আদিকারণের যুক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে

অযৌক্তিক।উদ্দেশ্য বিষয়ক যুক্তিতে বুদ্ধিমান সত্তার কথা বলা হলেও এই বিষয়ে আদিকারণের দ্বারস্থ হতে হয়। সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ সম্ভব নয়। তাই এই যুক্তি অধিবিদ্যা বিরোধীদের উৎসাহিত করে। কালের এই ধারণা যদি সত্য হবেও ধরে নেওয়া হয় তাহলে আমাদের জীবনের আলোচ্য বিষয়ের ব্যাখ্যা করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। মানুসের বুদ্ধির কাজ কী? কিভাবে আমরা সুন্দরভাবে বেঁচে থাকব। অন্ন, বস্ত্র, সুবিধা পাব তার সমাধান করা। যদি তাই হয় তাহলে একটি শিয়ালের বুদ্ধির চেয়ে মানুষের বুদ্ধি কম এবং মানুষের বুদ্ধির কাজও শিয়ালের মতই সীমিত। কারণ শিয়াল তার বুদ্ধিকে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্যই কাজে লাগায়। প্রকৃতপক্ষে মানুষ তার বুদ্ধির মাধমে অতি জাগতিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। ঈশ্বর আছেন হয়ত এটা বুদ্ধির মাধ্যমে প্রমাণ করা যায় না, কিন্তু তিনি যে নেই একই বুদ্ধির মাধ্যমে তা প্রমাণ করার চেষ্টাও আত্যন্ত হাস্যকর। এই জন্য কান্ট এক সময় অজ্ঞেয়বাদকেই প্রধান্য দিতে শুরু করেন। কিন্তু পরে তিনি দেখলেন, মানুষের জীবনই অচল হায় পড়ে যদি ঈশ্বরের ধারণাকে বাতিল করা হয়। মানুষ তখন আর মানুষ থাকেনা, পশুর মত আচরণ করতে শেখে। এভাবে নৈতিকতার ধারণা শূণ্য হয়ে পড়ে, যদি ঈশ্বরের ক্ষমতার ধারণাকে ব্যবহারিক জীবন থেকে বাদ দেওয়া হয়। তাই তিনি নৈতিকতার প্রয়োজনে ঈশ্বরকে আবার মেনে নিলেন।

বর্তমান সময়ের নব্য বাস্তববাদ, যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ, ভাষাদর্শন প্রভৃতি বিশেষণী দর্শনের শাখা প্রশাখা। এই ধারণাগুলো অধিবিদ্যাকে দর্শন থেকে বের করে দিতে চেয়েছে। এডওয়ার্ড মূর, রাসেল, ফ্রেগে প্রমুখের মাধ্যমে বিশেষণী দর্শনের বিকাশ ঘটে। তাঁরা মূলত ভাষা বিশেষণকেই দর্শনের প্রধান কাজ হিসেবে নির্ধারণ করেন। আর বিজ্ঞানকে তাদের পরম আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন। তাদের অধিবিদ্যা বিরোধী বক্তব্যে মূলত তাদের নিজেদের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলোই উন্মোচিত হয়। ঈশ্বর আছেন কি নেই, অধিবিদ্যার প্রয়োজন আছে কি নেই সে সব ব্যবহারিক প্রশ্ন পওে, তার আগে বলব এরা এতই স্বাবিরোধী বক্তব্য রাখেন যাতে নিজেরাই জালে আটকা পড়েন। কিন্তু তাঁদের যুক্তির অনুপপত্তি জানা সত্ত্বেও তাদের আদর্শ থেকে তাঁরাসরে দাড়াননা। রাসেলের ভাষায়, একজন ক্যাথলিক একুইনাসের যুক্তিকে বৈধ মনে না করলেও ঈশ্বরে বিশ্বাস ত্যাগ করবে না। এমন কি কোন যুক্তি না থাকলেও তিনি প্রত্যাদেশের উপর নির্ভর করবেন।[৬]কিন্তু তিনি সহ অন্যান্য বাস্তববাদীগণ কি তাঁদের ঈশ্বর বিরোধিতার পথ থেকে এমন কি সব যুক্তিতে পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের আদর্শ ছাড়বেন? ধার্মিক প্রত্যাদেশ বাণীর অনুসরণ করেন কিন্তু তাঁরা মনের কামনা-বাসনা ছাড়া আর কিছুর অনুরসণ করেন কি? প্রত্যাদেশ সঠিক কিনা সেটা ভিন্ন আলোচনা, কিন্তু এমন একটা জিনিস আছে যার নাম প্রতাদেশ এবং যার উপর ধার্মিকগণ বিশ্বাস রাখেন। এর বিপরীতে এমন কি আছে যার উপর তারা বিশ্বাস করবেন? 'সর্বশক্তিমান' বিজ্ঞানের কথা তারা বলবেন? কিন্তু বিজ্ঞানের কাজ তো বিশ্বাস নয়, এখানে কাজ তথ্য প্রমাণের এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা ভিত্তিক।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেঈশ্বরের পক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তি প্রদান সংক্রান্ত কোনো অধ্যায় এখন পর্যন্ত যুক্ত হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না, হলে তা অবশ্য দর্শনে পরিণত হবে, বিজ্ঞান থাকবে না। প্রকৃত পক্ষে বিজ্ঞানের সাথে অধিবিদ্যার কোন দ্বন্ধ ছিলনা। এমনকি নিউটন ও রয়েল যখন মধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করলেন তারা তখন তাকে বলে আখ্যা দেন। কোপার্নিকাসের পৃথিবী সংক্রান্ত মতবাদের পর ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে একটি দ্বন্দ সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু এর সমাধান হয়ে গেছে। তবে ডারউইনের বিবর্তনবাদ এবং ফ্রয়েডের মনস্তত্ব ধর্মের উপর চরম আঘাত হানে। এসব মতবাদ প্রমাণিত সত্য হিসেবে এখনো স্বীকৃত হয়নি। যেমনটি মধ্যাকর্ষণ,গতি, পরমাণু সংক্রা সূত্র স্বীকৃত হয়েছে। সুতরাং আনুমানিক প্রকল্পকে চূড়ান্ত সত্য বলাটা নি:সন্দেহে একটা চরমপন্থা বা গোড়ামী ছাড়া আর কিছু নয়।

নীটশে ঈশ্বরকে হত্যা করেন। কিন্তু ১৮৮৯ সাল থেকে ১৯০০ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন।উইল ডুরান্টেরভাষায় [৮],একদিন বন্ধুদের সামনে তিনি পিয়ানো বাজাচ্ছিলেন এবং উম্মত্তার সাথে গান করছেন আর কাঁদছেন। প্রথম দিকে তাকে পাগলা গারদে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু বৃদ্ধা মা এসে পুত্রকে নিজ দায়িত্বে নিয়ে যান। অদ্ভুদ দৃশ্য! এ ধার্মিক রমনীর ঈশ্বর নিজ পুত্রের হাতে নিহত তবুও কি অসীম ধৈর্য আর তীক্ষ্ণ অনুভূতি নিয়ে সহ্য করেছেন, দুই বাহুর মধ্যে ধর্মত্যাগী প্রিয় পুত্রকে আশ্রয় দিলেন। ১৮৯৭ সালে মা মারা গেলেন। বোনকে বলে যান ভাইয়ের যত্ন নিতে। তাকে দেখে বোন একদিন কাঁদছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'লিসবেথ কেন কাঁদছো? আমরা কি সুখে নেই?' একবার কারা যেন বই নিয়ে কথা বলছিল, তখন হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, আহা! আমি ও তো কিছু ভালো বই লিখেছিলাম। ১৯০০ সালে এই কষ্ট যন্ত্রণা নিয়েই তিনি পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। মৃত্যুর কাছে মানুষ কত অসহায়। ঈশ্বরকে হত্যা করে অবশেষে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পন করলেন। যারা অধিবিদদেরকে মানসিক খিচুনি (mental cramp) রোগে আক্রান্ত বলে চিকিৎসা দেওয়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন তাঁদের কোনো পূর্বসূরী যদি নীটশের চিকিৎসার জন্য এগিয়ে আসতেন। নীটশে কীভাবে ঈশ্বরের হত্যা করলেন? কী হাতিয়ার প্রয়োগ করেছেন? এই প্রশ্ন ভিটগেনস্টাইনকে করলে তিনি তখন বলবেন, এগুলো রূপকাশ্রয়ী। কিন্তু যখন হেগেল, ব্রাডলি এ ধরনের শব্দ প্রয়োগ করেন তখনই সব সমস্যার সৃষ্টি হয়।

সাঁত্রে বলেন, ঈশ্বর যখন কোনো কিছু সৃষ্টি করেন, তখন তিনি স্বভাবিক ভাবেই জানেন তিনি কি সৃষ্টি করছেন। একজন কারিগরের কাগজ কাঁটা চাকু তৈরির প্রক্রিয়ার মত।[৯] অর্থাৎ ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা নন, বড়জোর একজন কারিগর। এর মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেতে চেয়েছেন ঈশ্বর নয় বরং মানুষের সৃষ্টিই সবার আগে। ঈশ্বর অস্তিত্ববান না হলে একটি সত্তার অস্তিত্ব সাধারণ সত্তার পূর্বেই বিদ্যমান- সেটা মানুষ বা হাইদেগারের মতো

মানবিক সত্তা।[১০] মূলত ঈশ্বরকে একজন মামুলি কারিগর বা মিস্ত্রীর সাথে তুলনা করে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আদিকারণ বা পরম সত্তার অস্তিত্বকে তারা অস্বীকার করেন। তাঁদের বক্তব্যে বোঝা যায়, মানুষের অস্তিত্বের আগে কিছুই নেই। ঈশ্বর নামক কেউ যদি মানুষ সৃষ্টি করেই থাকেন তা বড় জোর একজন কারিগর বা মিস্ত্রীর মত যারা বাড়িঘর, দালান-কোঠা ইত্যাদি তৈরি করেন। এধরনের সসীম ঈশ্বরের আগেই মানবসত্তার আবির্ভাব, যার অনুরূপ কপিই কেবল তিনি তৈরি করেন। তারা অত্যন্ত জোর দিয়েই নিজেদের নাস্তিক্যবাদী অস্তিত্ববাদের সমর্থক দাবি করেন। আমাদের প্রশ্ন একজন মূর্তি নির্মাণকারী এবং একজন মানুষ নির্মাণকারীর মধ্যে পার্থক্য কি? মানুসের মূর্তিটি কেন কথা বলে না, হাসেনা ইত্যাদি? কিন্তু মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সে জীবন্ত। একজন কারিগর এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের পৃথিবীর সমস্ত মানুষ কারিগররা মিলে কেন মানুষ বা প্রাণী কিংবা ক্ষুদ্র একটি মশাও তৈরি করতে পারছে না? এখন যিনি (ঈশ্বর বা কারিগর) মানুষ তৈরি করলেন চাকু তৈরির মত তিনি নিশ্চয়ই পৃথিবীর সমস্ত মানুষ কারিগরের চেয়ে ভিন্ন এবং যখন তিনি মানুষ সৃষ্টি করলেন তখন আধুনিক বিজ্ঞানের চাইতেও অত্যুন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তাঁর হাতে ছিল যা প্রয়োগ করে তিনি মানুষ তৈরি করেন। সুতরাং আধুনিক বিশ্বের সমস্ত বিজ্ঞানী পন্ডিত দার্শনিক সাঁত্রে হাইদেগারদের উচিত তাকে সম্মান দেখানো যেমন আমরা সক্রেটিস, এরিস্টটলকে সম্মান করি। মহাবিশ্বের ও মহাকালের মধ্যে মানুষ ক্ষুদ্র এবং অতি ক্ষুদ্র একটি প্রাণী বা সত্তার নাম যারা অত্যন্ত অল্প সময়ের জন্য পৃথিবীতে আসে এবং মহজগতের তুলনায় অত্যন্ত অল্প একটি স্থানে অবস্থনে করছে। আমরা ধরে নিলাম মানুষ তৈরিকারী কারিগর সসীম (ঈশ্বর)। তাহলে মহাবিশ্ব ও মহাকাল যে কারিগর তৈরি করেছেন তিনি আরো শক্তিশালী। এখানে কারিগরের প্রয়োজন আাছ যা তাঁদের যুক্তিতেই স্পষ্ট হয়, যেমন মানুষ তৈরির কারিগরের প্রয়োজনীয়তা। তাঁরা ঈশ্বরকে না মানলেও মহাবিশ্বের এক বা একাধিক মহাশক্তিশালী কারিগরের অস্তিত্ব স্বীকার না করে তাদের কী উপায় আছে? এক ঈশ্বররের চেয়ে একাধিক ঈশ্বর ভালো কিনা সেটা আরেক প্রশ্ন।

দেরিদার (Deconstructions) ছিল অধিবিদ্যার বিপক্ষের মতবাদ। উত্তরাধুনিকতা অধিবিদ্যাকে প্রত্যাখ্যান করে। উত্তর আধুনিকতার অন্যতম প্রধান সমর্থক দেরিদা Postrodesnism এর সংজ্ঞায় বলেন, এটা পাশ্চাত্যের অধিবিদ্যা ধারণার বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ। কারণ অধিবিদ্যা অযৌক্তিক ও কুসংস্কারমূলক।[১১] উত্তরাধুনিকতা সমাজতন্ত্রকে সমর্থন করে এবং পুঁজিবাদের বিরোধিতা করে এজন্যই এখানে তাত্ত্বিক চিন্তার অবকাশ কম। আধুনিকতার হতাশা থেকেই উত্তর আধুনিকতার উদ্ভব বিশ্বকে একটা নতুন কিছু দেওয়ার জন্য। কিন্তু এর অনুসারীগণ এক্ষেত্রে অধিবিদ্যাকে প্রতিপক্ষের কাতারে স্থাপন করেন, যা আমরা দেরিদার বক্তব্যে লক্ষ্য করেছি।

দেরিদা ভাষা দার্শনিকদের মত ভাষা চিহ্নের গুরুত্ব দেন। তাঁর মতে, সত্তার ব্যাখ্যা ভাষার দুবোধ্যতা ছাড়া কিছু নয়।[১২] প্রকৃতপক্ষে তাদের চিন্তাধারা অধিবিদ্যাকে অযৌক্তিক প্রমাণ করতে চায়। কিন্তু অধিবিদ্যার বাস্তব প্রয়োজন আছে। দেরিদারের কাছে তা কুসংস্কারমূলক হলেও অনেক পন্ডিত-দার্শনিকের দৃষ্টিতে তা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রয়োগবাদের প্রধান সমর্থক উইলিয়াম জেমস বলেন, ঈশ্বর যদি থেকেও থাকেন তা হলে তিনি আমাদের মতই সসীম তবে তার ক্ষমতা কিছুটা বেশি। কারণ ঈশ্বর যদি সর্বজান্তা হন তাহলে আমরা তার হাতের পুতুল হয়ে পড়ি।[১৩] আমি আগামী কাল কী করব তা যদি ঈশ্বর সত্যিই জানেন তাহলে আমার চুরি করতে কোন দোষ নেই। এই ঠুনকো যুক্তি একটি শিশুর মুখেও শোনা যায়। মানুষকে ঈশ্বর ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়েছেন। যে চুরি করে সে চাইলে ভালো হয়ে যেতে পারে। তাকে ঈশ্বর ধরে রাখবেন না; যে চুরি তাকে করতেই হবে। ঈশ্বরের জানার অর্থ হলো তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। যে কেউ তার সীমার মধ্যে থেকে ইচ্ছামত কাজ করতে পারে। সীমা অতিক্রম করলে তাকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন।

পিটার সিঙ্গার, যিনি আধুনিক ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার প্রবর্তক, তাঁর মতে ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে নৈতিকভাবে উত্তম জীবন যাপন করা সম্ভব। তিনি বলেন, সামাগ্রিকভাবে জীবনের কোনো অর্থ নেই। সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মতবাদ অনুসারে জীবনের শুরু হয়েছিল হঠাৎ করে নানা প্রকার গ্যাসের সংমিশ্রণে। পরবর্তীতে উদ্দেশ্যহীন পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রকিয়ার মধ্য দিয়ে জীবন বিবর্তিত হয়েছে।[১৪]

তাঁর জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা তাঁকে এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে তাতে সন্দেহ নেই। তিনি আরো বলেন, কেন নৈতিকভাবে আমরা কাজ করব? প্রশ্নটির এমন কোনো উত্তর দেওয়া যায়না যা সকলকে নৈতিকভাবে কাজ করার জন্য প্রেরণাদায়ক যুক্তি প্রদান কবে।[১৫]অর্থাৎ আমরা কেন নৈতিকভাবে কাজ করব তার কোনো সদুত্তর তিনি জানেন না। তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে মানুষের দায়িত্ববোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন এবং পারস্পারিক দায়িত্বের কথা বর্ণনা করেছেন যা প্রশংসনীয়। কিন্তু তাঁর এই প্রচেষ্টা ছিল সম্পূর্ণ অধিবিদ্যা বা ঈশ্বর নিরপেক্ষ। সে জন্যই বিবাহ বহির্ভূত যৌনমিলন তাঁর কাছে কোন আপরাধ নয়। বৈধতা-অবৈধতার মাপকাঠি হিসেবে তিনি উপযোগবাদকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে রায় দেন। অর্থাৎ চিরন্তন সত্য বা মিথ্যা ইত্যাদি থাকবেনা। মানুষের জন্য যা প্রয়োজন, উপযোগী তাই নৈতিক। একটি প্রশিক্ষিত কুকুর এবং একজন মানুষের মধ্যে শুধু ব্যবধান এতটুকু হতে পারে, এই মতবাদ অনুযায়ী, যে কুকুর কথা বলতে পারেনা এবং মানুষ কথা বলতে পারে। এমনকি

যারা বিকলাঙ্গ, বধির, পীড়িত তাদের চাইতে একটি আদর্শ কুকুর অধিকতর উত্তম। কারণ একটি কুকুর মানুষের যত উপকার করতে পারে এই ধরনের মানুষ তাও পারে না।

মানুষের আত্মা যদি অমর না হয় তাহল পেটোর মত পিটার সিঙ্গারও হয়ত বলবেন, এদেরকে এমন স্থানে রেখে আসা উচিত যেখানে থেকে আর ফিরে আসবে না। জীবনের যদি অর্থ-ই না থাকে তাহলে অন্য প্রাণীদের চেয়ে মানুষের বিশেষ পার্থক্য থাকতে পারেনা। সমুদ্রের ডুবন্ত ব্যক্তি খড়কুটো ধরে হলেও বাঁচতে চায়। একটি শুশক বা ডলফিন এসে তখন নিজের পিঠ উৎসর্গ করে তাকে বাঁচাতে চেষ্টা কওে, কষ্ট স্বীকার করে কোনো একটি তীরে নিয়ে তাকে ছেড়ে দেয়। কোনো প্রশিক্ষণ ছাড়া এবং স্বার্থ ছাড়া সে মানুষকে উদ্ধার কাজে সাহায্য করে । সুতরাং আমরা বলতে পারি অনেক মানুষের চেয়ে ডলফিন অধিকতর উত্তম। পাখিরা আকাশে উড়ে বেড়ায়, সকালে খালি পেটে বের হয়ে সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে আসে। রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমায় যৌন মিলন করে। বাচ্চা ফুটায়, স্নেহ দিয়ে বড় করে, প্রাপ্ত বয়স্ক হলে মা-বাবার কাছ থেকেও ওরা চলে যায় । নতুন জুটি বাঁধে। কী সুখের জীবন ওদেও, কোনো যুদ্ধ নেই, মহামারি নেই। পিটার সিঙ্গার মনে মনে ভাবতে পারেন, আহা মানুষ না হয়ে আমরা যদি পাখি হতাম তাহলে খাবার নিয়ে যুদ্ধ, সমতা, অসমতা, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি থাকতনা। আমরা যৌন মিলন করতে পারতাম ইচ্ছা মত, সমকামিতা করতাম। কেউ নৈতিকতার দোহাই দিয়ে প্রতিবাদ করত না। খালি পেটে সকালে বের হয়ে তৃপ্তি সহকারে খেয়ে পরে রাতে ফিরে আসতাম, নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারতাম। কত সুখের জীবন তাদের। বিবর্তন প্রক্রিয়ার আমরা কেন মানুষ হয়ে গেলাম? আমরা কি আবার বিবর্তন প্রক্রিয়ার পরবর্তী ধাপে পাখি হয়ে যেতে পারিনা? বিজ্ঞানের অতি উন্নতির ফলে মানুষ হয়ত বিবর্তিত পাখি হওয়ার আগেই নিজেরা উন্নত সার্জারি মাধ্যমে ডানা লাগিয়ে পাখির জীন মানুষের কোষে স্থাপন করে পাখি হওয়ার পদক্ষেপ নিতেও পারে। যারা মনে করে জীবনের কোনো উদ্দশ্য নেই, অর্থ নেই, সুখই জীবনের কাম্য, তাই সবচেয়ে সুখী জীবন (পাখী) হওয়ার জন্য লক্ষ লক্ষ পয়সা খরচ করে তারা সেই কাজ শুরু করতে পারেন এবং তখন মানবজীবনকে কেবলি অভিশাপ দিতে থাকবেন।

বার্ট্রন্ড রাসেল ব্যক্তিগত অমরতাকে নৈতিকতার জন্য বিপর্যয়কর বলে উলেখ করেন। রাসেল ৯৮ বছর দীর্ঘ জীবনে হয়ত সম্মান, মর্যাদা, খ্যাতি, সুখ সবই পেয়ে গেছেন। কিন্তু এমনও তো আছে যারা ৩৮ বচর বয়সে মানবজাতিকে এমন কিছু দিয়েছেন যার কারণে মানুষ শ্রদ্ধাভরে তাকে স্মরণ করে। কিন্তু ৩৯ বছর বয়সেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[১৬] তাহলে তার এত মহৎ কার্মের পুরস্কার কে ভোগ করেব? ঈশ্বর পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করে মানুষকে এত তুচ্ছ করেননি যে, তার ভালো কাজের কোন মূল্যই তাকে দেবেন না। বা খারপ কাজের পরিনতি

ভোগ করতে হবে না। মহাজগতে তিনি অসংখ্য গ্রন্থপুঞ্জ সৃষ্টি করে রেখেছেন ৩যেখানে সহজেই তাদেরকে পুনর্বাসন করে শাস্তি বা পুরস্কার দিতে পারেন। রাসেল একজন বিশপও খুজে পাননি যারা সামাজিক কাজে অংশ গ্রহণ করেন, সুতরাং বিশপ বা ধার্মিকগণ অসামাজিক হয়, তাই ধর্মে কোনো কল্যাণ নেই। প্রশ্ন হলো রাসেল এই বক্তব্যের পেছনে কোনো জরিপ করেছি কি? হয়ত তার সামনে যাদেরকে পেয়েছেন তারা সমাজ নিয়ে ভাবেননি কিন্তু ২০০০ বছরের খ্রিষ্টীয় ঐতিহ্যের অসংখ্য দাতব্য সংস্থা, অসংখ্য মিশনারি সেন্টার রয়েছে যারা মানবকল্যাণ কাজ করে যাচ্ছে। আর ধর্ম পৃথিবীতে আরো আছে, একটি ধর্মের একটি ত্রুটি (যদিও তা কল্পিত) থাকলে সে ধর্মসহ অন্যসব ধর্মকে তিনি বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করে দিলেন। এই গবেষকের মতে, এটা চরম অতিপ্রাকৃতিক মন্তব্য এবং তাঁর যুক্তিবিদ্যার অবৈধ সার্বিকীকরণ অনপুপত্তির অন্তর্গত।

কার্ল মার্ক্স মানব জাতির দু:খ দূর করার জন্য বছরের পর বছর জ্ঞান সাধনার কঠিন তপস্যায় ডুবে যান। অর্থের অভাবে পারিবারিক চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়। এমনকি তাঁর আদরের শিশুপুত্র একদিন অপুষ্টি অনাহারে ক্লিষ্ট হয়ে তাঁরই চোখোর সামনে মৃত্যুবরণ করে। অনেক কষ্টে সয়েছিলেন পুত্র শোক। কিন্তু তাঁর আত্মা বিদ্রোহ করে উঠে। তিনি ভাবলেন হয়তো মানবজীবনে সবচেয়ে বড় সমস্যা সম্পদ ও অর্থের বণ্টন নিয়ে। আর অচিরেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন, হাঁ অর্থবিত্তের মালিকরাই সমাজকে শোষণ করে বেড়াচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে কুঠারঘাত করতে হবে। কুঠারাঘাত করেছেন; নি:স্ব অসহায় সর্বহারাদের নিয়ে রুশ বিপ্লব হয়েছিল, সাম্য ভ্রাতৃত্বের কল্যাণের আকাক্ষায়। কিন্তু কিছু কাল পর অবস্থা পরিবর্তন ঘটে গেল, দেখা গেল পূর্বের সেই সমস্যা আবার দেখা দিয়েছে। আর ইতোমধ্যে পৃথিবীর মানুষ অঢেল টাকা রোজগার করে ফেলেছে। কিন্তু সমাজে অপরাধ প্রবণতা বেড়ে গেল, খুন, আত্মহত্যা, মাদকাসক্তি, নারীর চরম অবমূল্যায়ন ইত্যাদি। বিরোধী মতের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব সমাজেকে চরম অস্থিতিশীল করে তুলল।

মানুষের উৎপত্তি বানর থেকে হয়েছে এর পক্ষে কোনো সুস্পষ্ট ও অভিজ্ঞতা ভিত্তিক প্রমাণ ডারইউন বা বিবর্তনবাদীগন উপস্থাপন করতে পারেননি। এটা তাদের অনুমান। এমনকি যারা বিবর্তনবাদের অনুসারী দার্শনিক তাঁরাও এমন নিশ্চিত কিছু দাবি করেননি। অন্যদিকে ধর্মতত্ত্ববিদগণ নিশ্চিত ভাবেই দাবি করেন মানুষ জাতির জন্ম আদম ও হাওয়া থেকে। অধিবিদগন উদ্দেশ্যহীন ও পরিবল্পনা বিহীন মানুষের অস্তিত্বকে আদৌ মেনে নেননি।

যেভাবেই হোক, মানুষের জন্ম পৃথিবীতে হয়েছে এং অন্য সব প্রাণী থেকে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব সবাই নি:সন্দেহে স্বীকার করেন। কীভাবে হয়েছে তাতে কারো সন্দেহ থাকলেও মানুষ যে শ্রেষ্ঠ জীব অন্তত (বিবর্ততন রূপে হলেও) এতে কারো সন্দেহ নেই। কিন্তু মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের ধারণা এলো কী করে? বার্ট্রান্ড রাসেল এ

ক্ষেত্রে বলেন, ভয় থেকে।[১৮] রর্বাট স্পেনসার বলেন, মৃত ব্যক্তি স্মরণ থেকে।সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বলছি, ঈশ্বর আছেন কি নেই তাতে বই খাতা কলমের মত চাক্ষুষ কোন প্রমাণ কারো কাছে নেই। কিন্তু ভয়ের সময় আমরা এক অতি প্রাকৃতিক শক্তিকে মনের অজান্তে স্মরণ করতে থাকি। রাসেল ভয়ের কথা স্বীকার করেন। প্রকৃতপক্ষে ভয় নেই কার? একটি শিশু কিংবা পাগল অথবা কোনো বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তি ঐ বিষয় সম্পর্কে নির্ভয় থাকে। প্রাচীন কালে মানুষ প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পন করত কিন্তু বর্তমানে প্রকৃতিকে বশীভূত করার কৌশল শিখেছে মানুষ। কিন্তু তাই বলে কি ভয়ের ধারণা বাতিল হায়ে যাবে। তা ছাড়া মৃত মা বাবা স্বজনদের কে এক অদৃশ্য ভয় বেষ্টন করে রাখে, না জানি তার আত্মা কেমন আছে? সুতরাং এখানেও ভয়ের প্রসঙ্গটাই চলে আসে। বড় ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি, মৃত্যু, ভূমিধস, অনাবৃষ্টি, সমুদ্রে জাহাজ ডুবি ইত্যাদি মুহূর্তে ভয়ে, আতংকে ছুটাছুটি করা একজন সাধারণ মানুষ আর প্রবর জ্ঞানী দার্শনিকের মধ্যে একই রূপ দেখা যায় এই ধ্বংস থেকে যদি দীর্ঘায়িত হয় তাহলে হয়ত সব মানুষই অতি প্রাকৃতিক, ক্ষমতাধর ঈশ্বরের নাম ধরে ডাকতে শুরু কববে। কারণ এসব মুহূর্তে ত্রাণ কর্তা কেউ থাকবেনা।সাধারণ মানুষ যখন ঈশ্বরকে জপতে শুরু করে তখন দার্শনিক ও বিজ্ঞানীগণ ও তাদের অনুসরণ না করে পারবেন না। তবে বিপদ থেকে বাঁচা গেলে তখন সবাই বলতে শুরু করবেন আমরা এক দু:স্বপ্ন অতিক্রম করেছি। ঈশ্বরের ধারণা যেভাবেই মানুষের মনে স্থান করে নেয়, তা পরবর্তীতে স্থায়ী ধারণায় রূপ নেয়। মানুষ তখন বিচার করতে শুরু করে আসলে কি ঈশ্বরের প্রয়োজন আছে? কিংবা একজন অধীশ্বার যদি নাই থাকেন তাহলে কীভাবে সব কিছু সুশৃঙ্খল ভাবে চলছে? সুতরাং ঈশ্বরের ধারণার প্রয়োজন রায়েছে।

ঈশ্বরের ধারণা নৈতিকার ক্ষেত্রে সবচে গুরুত্বপূর্ণ। অধিবিদ্যার গুরুত্ব এখানেই। নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করারজন্যসমস্ত বস্তুতান্ত্রিক উপায় ফলপ্রসু হবে না। একটি বিড়ালের সামনে সুঘ্রান যুক্ত খাবার নিয়ন্ত্রণ রাতে পারবে হয়ত কিছু সময়ের জন্য, কিন্তু যত বিশ্বস্ত বিড়ালই হোক না বেশি সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেনা। বিড়াল যদি জানত তার উপর ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা বসানো আছে তাহলে হয়ত আরো একটু নিয়ন্ত্রণ করতে পারত। কিন্তু নিজের প্রবল ক্ষুধা ও আকর্ষণীয় খাবারের মধ্যে এই ক্যামেরাও যথেষ্ট নয়। কারণ সে জানে পালানোর একটা রাস্তা সে বের করে ফেলতে পারবে। তবুও ধরা খেয়ে গেলে হয়ত একটু পিটুনি খেতে হবে। মানব জাতি হয়ত বিড়ালের মত নয়। হয়ত তার বিবেক বুদ্ধির কারণে, ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা লাগানো সত্ত্বেও নিজেকে কিছুটা নিবৃত্ত রাখতে পারবে।কিন্তু চূড়ান্ত ভাবে সে সফল হতে পারবে না। কারণ তার মনের মধ্যে প্রাণিত্ব ও বুদ্ধিবৃত্তির লড়াইয়ে প্রাণিত্বই অধিকাংশ সময় বিজয়ী হয়েছে। যদি আত্মার অমরতায় বিশ্বাস থাকে তাহলে সে সবচেয়ে বেশি সংযমী হতে পারে। কারণ পার্থিব শাস্তির পরও তার শাস্তি শেষ হবে না। সুতরাং সে অধিকতর দায়িত্বশীল ও সচেতন হতে সক্ষম হবে। বর্তমান পৃথিবীর এখন সবচেয়ে বড় প্রয়োজন নৈতিকতার

অনুভূতি জাগ্রত করা। তা সম্ভব বিভিন্ন প্রক্রিয়ায়, কিন্তু সবচেয়ে উত্তম প্রক্রিয়া হচ্ছে আধিবিদ্যক জ্ঞান ও তার চর্চা। তাহলেই মানুষ সত্যিকার মানুষ হতে পারবে।

সমাপ্ত

তথ্য নির্দেশ

১। http://en.wikipedia.org/Anthony_Quinton

২। বার্ট্রান্ড রাসেল, *বহির্জগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান* (অনু: আব্দুল বারী) ঢাকা, ১৯৭৮, পৃ: ১১

৩।বার্ট্রান্ড রাসেল,*রহস্যবাদ ও যুক্তিবিদ্যা এবং অন্যান্য প্রবন্ধ* (অনু: আবু সাঈদ মিঞা) ঢাকা, ১৯৭৭ পৃ: ২০৩-২০৫

৪। Hume. D. , Dialogues Concerning Natural Religion and the Posthumous Essays, (ed. Pichard H. Popkin), Cambridge, Hackett Publishing Company, I P_ XIV

৫। Ibid.,P_ 89

৬। বার্ট্রান্ড রাসেল, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস* (অনু: প্রদীপ রায়) ঢাকা, (প্রাচীন ক্যাথলিক দর্শন) পৃ: ২২৭

৭। http://en.wikipedia.org :

৮। উইল ডুরান্ট, *দর্শনের ইতিকাহিনী* (অনু: আবুল ফজল) ঢাকা, ১৯৮০ পৃ: ৫৩৪, ৫৩৫

৯। জ্যাঁপল সাত্রে, *অস্তিত্ববাদ ও মানবতাবাদ* (অনু: শরীফ হারুন) ঢাকা, ১৯৯২, পৃ: ৫৪

১০। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৪

১১। Jacob Gabriel Hale,*Derrida, Van Til and the Metaphysics of Postmodernism*, www.reformedperspectives.org.

১২। Gerard Delanty,*Modernity and Postmodernity*, London, SAGE Publication, 2000, P- 140.

১৩। আমিনুল ইসলাম,*সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শন*, *ঢাকা*, ১৯৮২, পৃ: ২৪০।

১৪। পিটার সিঙ্গার, *ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা* (অনু: প্রদীপ রায়) ঢাকা, ১৯৯৬ পৃ: ২০৮।

১৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ২১১

১৬। মার্টিন লুথার কিং ১৯২৯-১৯৮৬ মাত্র ৩৯ বছরে মারা যান।

১৭। Russell. B.,*Am I an Atheist or An Agnostic*? (1947) www.positiveatheism.org

১৮।Russell. B.,*Why I an not a Christian* (1927). www.luminary.us.russell

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

মৌলিক গ্রন্থাবলি

১। এরিস্টটল : অধিবিদ্যা; (অনু. আব্দুল জলিল মিয়া) ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৮।

২। Bradley, F. H : *Appearance and Reality A metaphysical Essay*, London, George Allen & Unwin Ltd. 1961, 6th Impression.

3. St. Thomas Aquinas : *Summa Contra Gentiles*, (tr. Anton C. Pegis), http://dhspriory.org/thomas/contragentiles.

4. : *Summa theologica.*

5. Ayer, A.J. : *Language Truth and Logic*, London, Penguin Books Ltd. 1971

6. Lewis, H.D. : *Our Experience of God*, London, George Allen & Unwin Ltd, 1959.

7. :*The Elusive Mind*, http://www.giffordlectures.org/bruyarp

সহায়ক গ্রন্থাবলী (ইংরেজি)

1. Russell, B. : *History of Western Philosophy*, 2nd Impression, London, 1947.

2. Weber, A. : *History of Philosophy*, (tr. F. Thilly), New York, 1905.

3. Hirschberger, J. : *The History of Philosophy*, Vol. 1. tr. RT. Rev. Anthony N. Furest, Germany, 1958.

4. Mc Taggart, J. : *The Nature of Existence*, Vol.- 1. London, CambridgeUniversity Press, 1921.

5. Pears, D. F. (ed.) : *The Nature of Metaphysics*, London, Macmillan, 1957.

6. Ramsey I. A. N. (ed) : *Prospect for Metaphysic*, London, George Allen & Unwin Ltd. 1961

7. Wittgenstein, L. : *Tractatus Logico- Philosophicus*, trn. D.F. Pears & B.F. McGuinness, London, New York Rout ledge, Classics, 1922.

8. Abdul Jalil Mia : *A Contemporary Philosophy of Religion*, Dhaka, Islamic Foundation Bangladesh, 1982.

9. Taylor, A. E. : *Elements of Metaphysics*, (2nd edition) New York, Macmillan, 1909.

10. Ruhul Amin, M. : *Science, Philosophy and Religion*, Dhaka Islamic Foundation, 1979
11. Ayer, A.J. (ed) : *Logical Positivism*, New York, The Free Press, 1966.
12. Weinberg, J.R. : *An Examination of Logical Positivism*.
13. Bergson, H : *Creative Evolution*, London, Macmillan & co. Ltd. 1922, (tr. Arthur Mitchell).
14. McTaggart, John : *The Nature of Existence*, Vol-1, Cambridge, University Press, 1921.

সহায়ক গ্রন্থাবলিঃ বাংলা

১. আমিনুল ইসলাম : *আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন*, ঢাকা বাংলা একাডেমি, ১৯৮০।
ধ. : *সমকাল পাশ্চাত্য দর্শন*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৮২।
২. বার্ট্রান্ড রাসেল : *বহির্জগতে সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান*, (অনু: মুহম্মদ আব্দুল বারী) ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৭৮।
৩. ---------- : *রহস্যবাদ ও যুক্তিবিদ্যা এবং অন্যান্য প্রবন্ধ*, (অনু: আবু সাঈদ মিঞা) ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৭৭।
৪. ---------- : *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস*, (প্রাচীন ও ক্যাথলিক দর্শন) (অনু: ড. প্রদীপ রায়), ঢাকা, নিউ এজ পাবলিকেশন, ১৯৯৮।
৫. জর্জ বার্কলি : *মানুষের জ্ঞানসূত্র*, (অনু: ড. আব্দুল মতীন) ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৭৪।
৬. পিটার সিঙ্গার : *ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা* (অনু: ড. প্রদীপ কুমার রায়) ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৬।
৭. হাসনা বেগম : *মূওরের নীতিতত্ত্ব*, (অনু: কালী প্রসন্ন দাস) ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯।
৮. স্টিফেন ডব্লু হকিং : *কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, (অনু: শক্রজিৎদাস গুপ্ত) কলিকাতা, বাউলমন প্রকাশন, ১৯৯৩।
৯. আব্দুর রহীম : *ইসলামের ইতিহাস দর্শন*, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩।
১০. এপি জে আব্দুল কালাম : *উইংস অব ফায়ার* (অনু: শেখ সেলিম) ঢাকা, তাজিন বাইঘর, ২০০৩।
১১. জেরোম এ. শেফার : *মনোদর্শন*, (অনু: মুহম্মদ জহুরুল হক) ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৩।
১২. মুহম্মদ ইকবাল : *ইসলামের ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন*, (সম্পাদনায় ইবরাহীম খাঁ) ঢাকা, আল্লামা ইকবাল সংসদ, ২০০৫, (পঞ্চম প্রকাশ)।
১৩. সৈয়দ কমরুদ্দীন হোসেইন : *কান্টের দর্শন*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৬।
১৪. হারুন রশীদ : *মার্কসীয় দর্শন*, ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭।
১৫. জন স্টুয়ার্ট মিল : *উপযোগবাদ*, (অনু: হাসনা বেগম) ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৮।
১৬. জ্যাঁপল সার্তে : *অস্তিত্ববাদ ও মানবতাবাদ* (অনু: শরীফ হারুন) ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯২।
১৭. উইল ডুরান্ট : *দর্শনের ইতিকাহিনী* (অনু: আবুল ফজল) ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৮০।
১৮. গালিব আহসান খান : *বিজ্ঞানের দর্শন*, ঢাকা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০২।
১৯. মার্ক্স-এঙ্গেলস : *কমিউনিস্ট পার্টির ইশতিহার*, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৮৪৮/অনু: ২০০২।